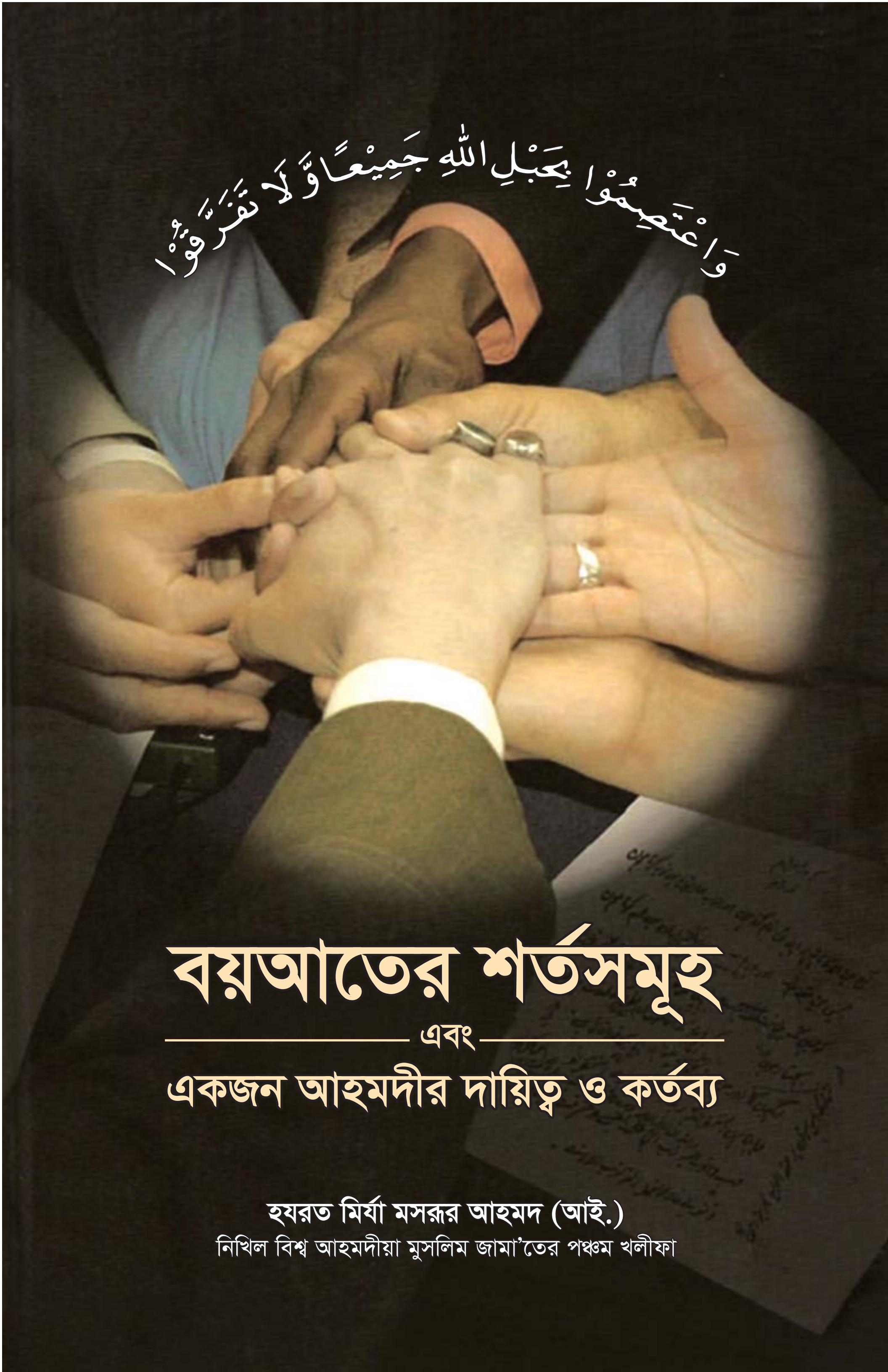

বয়আতের শর্তসমূহ

এবং

একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা

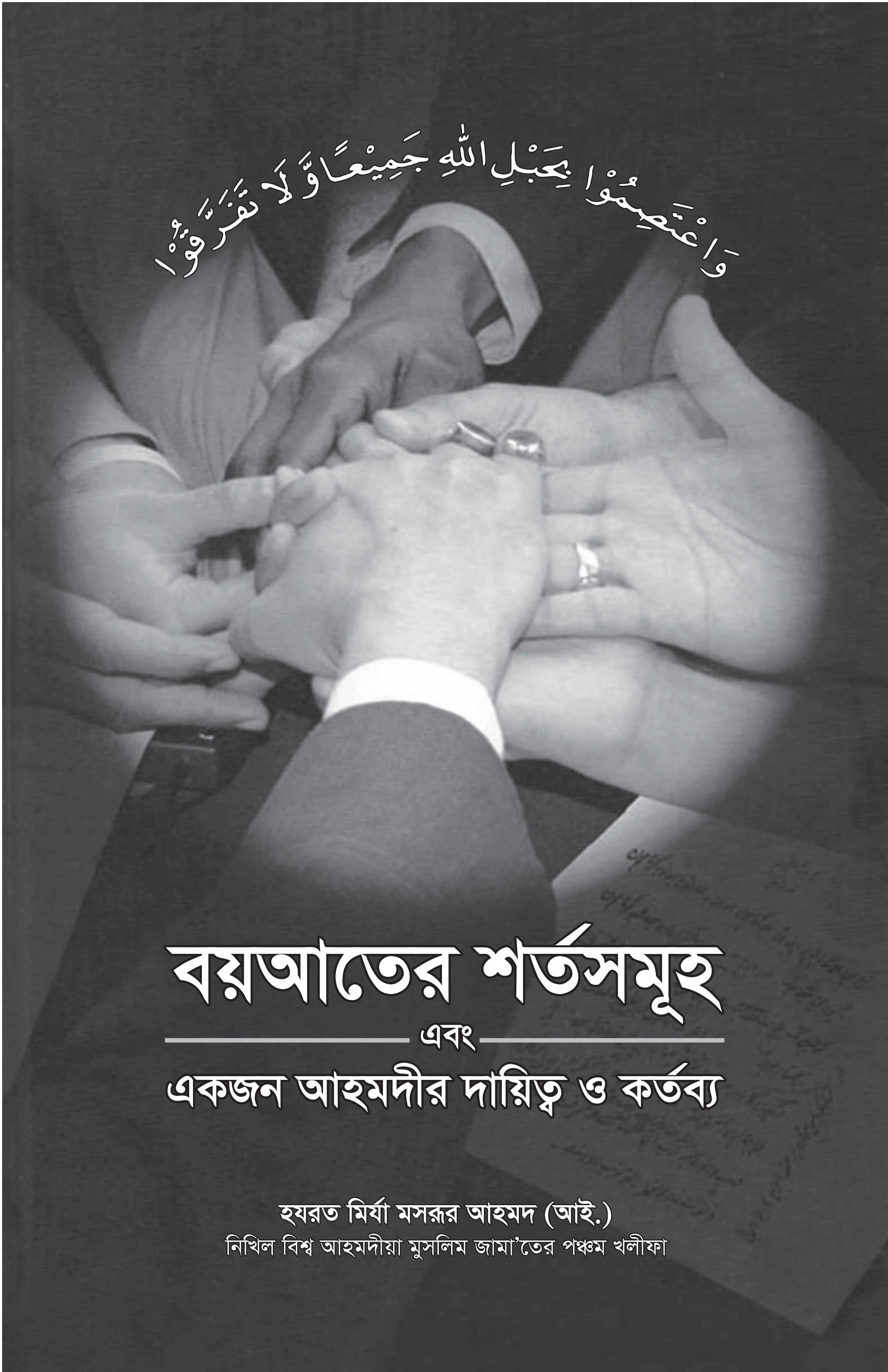

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

বয়আতের শর্তসমূহ

এবং

একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা

বয়আতের শর্তসমূহ

এবং

একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

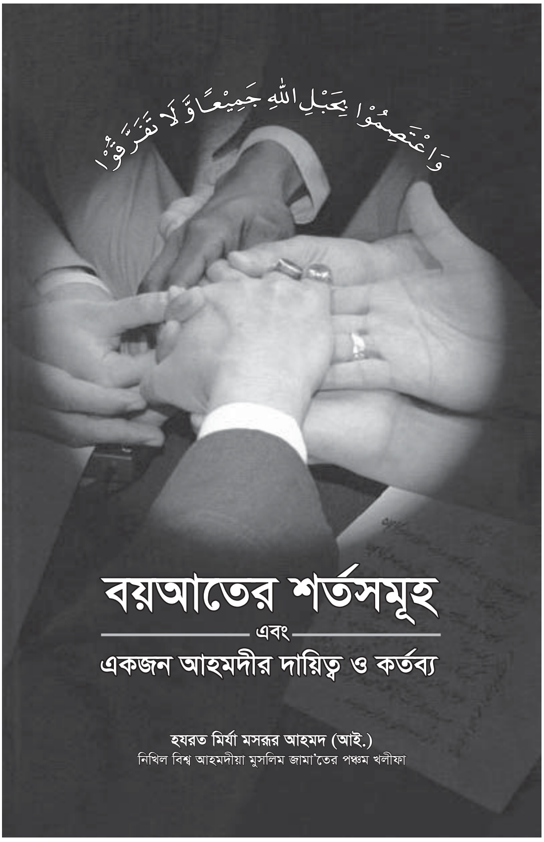

প্রকাশনায়

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

বয়আতের শর্তসমূহ

এবং

একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

গ্রন্থস্বত্ত্ব	ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ. কে.
প্রকাশনায়	আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মূল	হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস
ভাষান্তর	মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ
প্রকাশকাল	প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১৭
সংখ্যা	১০০০ কপি
মুদ্রণে	বাড-ও-লিভস্ বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লি. ভবন, ৮৯-৮৯/১ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

CONDITIONS OF BAI'AT
&
RESPOSSIBLITIES OF AN AHMADI

বয়আতের শর্তসমূহ
এবং
একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

by **Hadhrat Mirza Masroor Ahmad** atba
Khalifatul Masih the 5th
Translated into Bangla by
Mohammad Habibullah
Published by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
printed by : **Bud-O-Leaves,** Motijheel, Dhaka

©Islam International Publications Ltd., U.K.
ISBN 978-984-991-276-7

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

ভূমিকা

আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আবির্ভূত মসীহ্ মওউদ ও ঈমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে শনাক্ত করে মেনে নেবার সৌভাগ্য দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্! হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে বয়আত নেয়ার জন্য আদিষ্ট হলে বয়আত গ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে ১০টি শর্ত নির্ধারণ করে ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'তকমীলে তবলীগ' নামে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। বয়আতে আগ্রহী প্রত্যেককে উক্ত শর্তসমূহ পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েই হুযূর (আ.)-এর বয়আতের ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। বয়আতের সেইসব শর্ত বিশদভাবে জানা এবং তা কার্যকরভাবে পালন করায় আমাদের সকলের সদা-সর্বদা প্রচেষ্টা করতে থাকা অতীব জরুরী। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর নিকট বয়আতের যে শর্ত রেখেছিলেন ইমাম মাহদী (আ.)-এর শর্তগুলোও একই শুধুমাত্র একটু বিস্তৃত করা হয়েছে।

আমীরুল মু'মিনীন, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) আমাদের কল্যাণার্থে বয়আতের শর্তসমূহ পালনে পথনির্দেশনামূলক বিভিন্ন বক্তব্য, ভাষণ আর খুতবা প্রদান করে এগুলোর তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। বয়আতের শর্ত অনুধাবন ও প্রতিপালন যাতে সহজসাধ্য হয় এজন্য তিনি পবিত্র কুরআন, হাদীস, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতিসমূহ অতি সুন্দর, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় আমাদের বুঝিয়েছেন। আমরা যারা ইমাম মাহদী (আ.) বা তাঁর খলীফার নিকট বয়আত গ্রহণ করি তারা এই শর্তগুলো পড়ে থাকি, যা থেকে সাধারণভাবে এর অর্থ বুঝতে পারি ঠিকই কিন্তু এর যে তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য রয়েছে তা অনুভব করতে পারি না। অথচ আমরা যদি এর মাহাত্ম্য অনুভব করতে পারি, তাহলে এই শর্তগুলো প্রতিপালনে আমাদের ঐকান্তিকতা, আগ্রহ এবং ইচ্ছাশক্তি আরো বেশি বেগবান হয়ে যাবে। হুযূর (আই.) ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ জুলাই ইংল্যান্ডের সালানা জলসায় প্রদত্ত সমাপ্তি ভাষণে বয়আতের প্রথম তিনটি শর্ত, ২৪ আগষ্ট জার্মানির সালানা জলসার সমাপ্তি ভাষণে ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্ত আর ২৯ আগষ্ট জার্মানির ফ্রাঙ্কফোর্টে জুমুআর খুতবায় ৭ম ও ৮ম শর্ত এবং লন্ডনস্থ মসজিদ ফজলে ১২

ও ১৯ সেপ্টেম্বর জুমুআর খুতবায় যথাক্রমে ৯ম ও ১০ম শর্তের উপর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। খুতবাগুলো পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করার পর হুযূর (আই.) অনুগ্রহ করে পুনরায় দেখে দেয়ার পর ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে ‘শরায়াতে বয়আত অওর আহমদী কি যিম্মাদারীয়া’ নামে প্রথমবার প্রকাশ করা হয়।

পরবর্তীতে বয়আতের শর্ত প্রতিপালন করায় আহমদীদের জীবনে কী অসাধারণ আধ্যাত্মিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, তার প্রতি আলোকপাত করে হুযূর (আই.) ২৬ সেপ্টেম্বর এবং ১০ ও ১৭ অক্টোবর ২০০৩ পর্যায়ক্রমে আরো তিনটি খুতবা প্রদান করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীগণের আলোকজ্জ্বল দৃষ্টান্তে সমৃদ্ধ ওই সকল খুতবাগুলো ওই একই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে বাড়তি একটি অংশ ‘আধ্যাত্মিক বিপ্লব’ নামে সংযোজিত করে ২০০৬ ঈসাব্দে পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করা হয়।

উক্ত পুস্তকের পরিবর্ধিত সংস্করণটির অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ তা’লার শুকরিয়া আদায় করছি।

পুস্তকটির অনুবাদ করেছেন **জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্**, ওয়াকফে জিন্দেগী, বাংলাডেস্ক ঢাকা। বাংলাডেস্কের আলেমবৃন্দ ছাড়াও জামা’তের অন্য যে সকল আলেম এই অনুবাদকর্মে বিশেষভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ্ তা’লা তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন।

পুস্তকটি প্রত্যেক আহমদীর জন্য একটি ‘গাইড বুক’ বিশেষ। হুযূর (আই.)-এর মমতামাখা এ পুস্তকটি থেকে উপকৃত হতে আমাদের সকলের প্রচেষ্টারত থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা’লা স্বীয় সন্তুষ্টির চাদরে আমাদের আচ্ছাদিত রাখুন। আমীন!

মোবাশশের-উর-রহমান

ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশ

ঢাকা

০৮ জুলাই ২০১৭

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী

জন্ম: ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দ, মৃত্যু: ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ

যুগ সংস্কারকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পারশ্য বংশীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁর জীবনী এমন অগণিত ঘটনায় পরিপূর্ণ যা তাঁর পবিত্র জীবনাচারের সাক্ষ্য বহন করে। তৌহীদ তথা আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদ ও মহানবী (সা.)-এর রেসালতের সপক্ষে তাঁর অকাট্য যুক্তি ছিল ক্ষুরধার আর তাঁর প্রদর্শিত নিদর্শন ছিল ঐশী সমর্থনে সমুজ্জ্বল। তিনি প্রামাণিক দলিলের ভিত্তিতে সাব্যস্ত করে দেখিয়েছেন, ইসলামই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং শুধু এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকুল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে।

মহামহিমান্বিত খোদার নির্দেশেই তিনি ১৮৮৯ সনে নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর জামা'তভুক্ত হওয়ার জন্য তিনি দশটি শর্ত নির্ধারণ করেন এবং এক প্রচারপত্রে সেগুলোর ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। ১৮৮৯ সনের ২৩ মার্চ, চল্লিশজন পূণ্যাত্মা এই দশটি শর্ত শিরোধার্য করে তাঁর হাতে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর দাবি হলো, বিভিন্ন ধর্মে ভিন্ন ভিন্ন নামে যেসব সংস্কারকের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, তা তাঁর একক সত্ত্বায় পূর্ণতা লাভ করেছে আর এ বিষয়টি খোদা তা'লার তাঁর সামনে প্রকাশ করেছেন। তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য হলো, একমাত্র সার্বজনীন ধর্ম ইসলামের ছায়াতলে সমগ্র মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা। তিনি এ বিশ্বাস পোষণ ও প্রচার করেন যে, 'হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমন এবং ইমাম মাহদীর আবির্ভাব' সংক্রান্ত যে ভবিষ্যদ্বাণী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) করেছেন, সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ তাঁরই (সা.) শরীয়তের অধীনে তাঁর অনুসারীদের মধ্য থেকেই আবির্ভূত হবেন। সেই সাথে তিনি দাবি করেন, তাঁর নিজ ব্যক্তিসত্ত্বায় ওই সব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে।

তাঁর দাবির সপক্ষে আল্লাহ্ তা'লা অসংখ্য নিদর্শন দেখিয়েছেন আর সেগুলোর মধ্যে মহান একটি নিদর্শন হলো, মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে একই রমযানের নির্ধারিত দিনে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হওয়া। এ সম্পর্কে

আমাদের প্রিয় নবী, নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'এটি এমন এক নিদর্শন, যা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি আর কারো সত্যতার জন্য দেখানো হয় নি' (দারকুতনী, পৃ. ১৮৮) । সেই নিদর্শন যথাক্রমে আমাদের এ গোলার্ধে ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে এবং অপর গোলার্ধে ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রদর্শিত হয়।

তাঁর দাবির সত্যতা, কেবল জীবিতকালেই উদ্ভাসিত ছিল না বরং ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামা'ত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অবগত হয়ে জানিয়েছেন যে, "এ বীজ বাড়বে, ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে, সর্বত্র এর শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হবে এবং এটি এক মহা-মহিরুহে পরিণত হবে" (আল্-ওসীয়্যত) । আর এরই ধারাবাহিকতায় ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর তিরোধানের পর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী খেলাফত ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে অকাট্যভাবে তাঁর (আ.) সত্যতা প্রমাণ করছে। আর সেই আশিসমণ্ডিত খেলাফতের ছায়াধীনে আজ পৃথিবীর ২০৯টি দেশে তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামা'ত 'মহা-মহিরুহ' রূপে এই সত্যের চাক্ষুষ সাক্ষ্যরূপে বিদ্যমান।

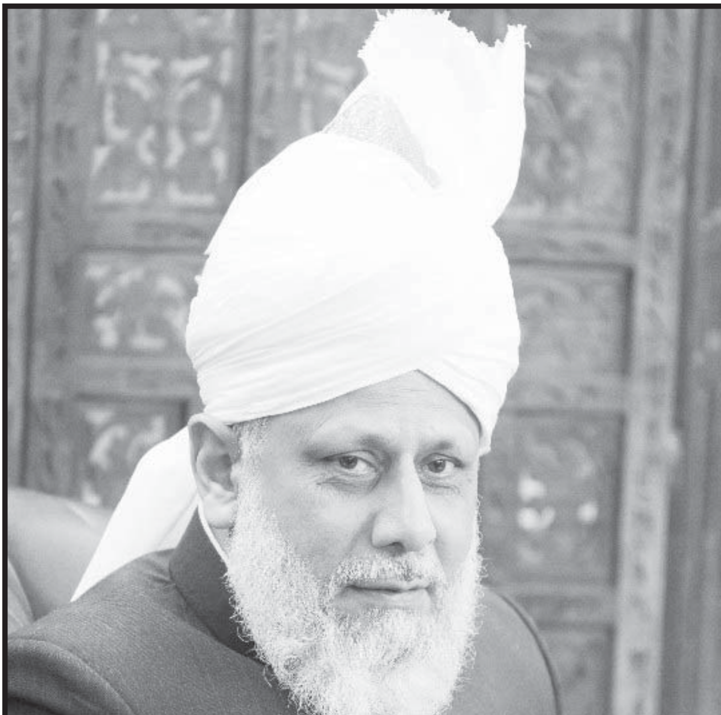

সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

লেখক পরিচিতি

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা তথা বিশ্ববরেণ্য নেতা, সর্বময় প্রধান। তিনি এ যুগের প্রত্যাদিষ্ট সংস্কারক আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর পঞ্চম খলীফা এবং প্রতিশ্রুত প্রপৌত্র। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর পরলোকগমনের পর যুক্তরাজ্যের লন্ডনে নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা ২২ এপ্রিল ২০০৩ তারিখে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার পঞ্চম খলীফা হিসেবে খেলাফতের মসনদে সমাসীন হন।

তিনি রাবওয়ার তালীমুল ইসলাম হাইস্কুল থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে রাবওয়ারই তালীমুল ইসলাম কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর ফয়সালাবাদ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে কৃষি-অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর (M.Sc in Agri-Economics) সম্পন্ন করেন।

আহমদীয়া খেলাফতের আসন অলঙ্কৃত করার পূর্বে আফ্রিকার পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠিকে শিক্ষাদান ও মানবসেবামূলক কার্যক্রমের প্রেরণায় তাঁর আত্মনিবেদন বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তিনি ১৯৭৭ থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত আফ্রিকার দেশ ঘানাতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) কৃষি অর্থনীতিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি রাখেন। তিনি ঘানায় 'গম উৎপাদন'-এর গবেষণা কার্যক্রম চালান এবং সেই দেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলায় 'গম'-কে ঘানার অর্থকরী ফসল হিসেবে প্রদর্শনীর আয়োজনের মাধ্যমে সুপরিচিত করান। ঘানার কৃষি মন্ত্রণালয় সানন্দে তাঁর (আই.) উপস্থাপিত স্কীম নিজ দেশের জন্য গ্রহণ করে নেয়।

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-কে পাকিস্তান সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার প্রধান নির্বাহী পরিচালক তথা নাযেরে আলা পদে নিযুক্তি প্রদান করা হয়।

১৯৯৯ সালে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে 'ব্লাসফেমি'-র সম্পূর্ণ মিথ্যা

ও বানোয়াট অভিযোগ আনা হয় যে, তিনি পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াতের অবমাননা করেছেন। মিথ্যা এই অভিযোগে তাঁকে তাঁর নিজ শহর রাবওয়ায় ১১ দিন পর্যন্ত কারাবন্দি করে রাখা হয়। পরে তদন্তে উদ্‌ঘাটিত হয় তাঁর বিরুদ্ধে আনা এ অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আধ্যাত্মিক নেতা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বর্তমানে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অবস্থান করছেন। বিশ্বের বড় বড় সব রাষ্ট্রপ্রধানকে আর ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথনির্দেশ দান করে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত অনুযায়ী তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে পত্র প্রেরণ করেন। সেই সব পত্রে তিনি কেবল সত্য ও ন্যায়ের কথাই তুলে ধরেন নি বরং এ যুগে ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে যে মহাপুরুষের আগমন ঘটেছে তাঁকে গ্রহণ করে আনুগত্যের জোয়াল কাঁধে নিয়ে নিশ্চিত শান্তি ও নিরাপত্তা বলয়ে বিশ্বের সকল দেশের সকল মানুষকে আশ্রয় নিতে আন্তরিক আহ্বানও জানিয়েছেন। সেই সাথে তিনি তাদেরকে সতর্কও করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের সাবধানবাণীকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করলে তাঁর অমোঘ বিধান অনুযায়ী মারাত্মক পরিণতি তথা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহা ধ্বংসযজ্ঞে পতিত হয়ে বর্তমান সভ্যতা বিলুপ্তির হুমকিতে পড়তে পারে।

তাঁর প্রণীত আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ–

১। বিশ্বশান্তি ও সিরিয়া পরিস্থিতি
২। বিশ্বসঙ্কট ও শান্তির পথ
৩। সহানুভূতিশীলতার আদর্শ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)
৪। জাতিসমূহের মাঝে সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সুসম্পর্কই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথ।

তাঁর এসব মূল্যবান রচনাবলী পাঠে মানবজাতি কল্যাণমণ্ডিত হোক, সর্বদা এই প্রত্যাশাই থাকবে।

সূচিপত্র

বয়আতের শর্তসমূহ এবং একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ০১
বয়আত কী? ০১
বয়আতের অর্থ হলো খোদা তা'লার হাতে নিজজীবন সঁপে দেয়া ০২
আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে বয়আত নেয়ার আদেশ ০৫
বয়আতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ০৬
বয়আতের সূচনা ০৭
বয়আতের প্রথম শর্ত ১১
খোদা তা'লা শির্‌ক ক্ষমা করবেন না ১১
'শির্‌ক' এর প্রকারভেদ ও রকমফের ১২
বয়আতের দ্বিতীয় শর্ত ১৫
সবচেয়ে বড় পাপ– মিথ্যা ১৫
ব্যভিচার থেকে দূরে থাকো ২০
কামলোলুপ দৃষ্টি থেকে দূরে থাকো ২২
প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকো ২৫
জুলুম বা অন্যায় করো না ২৭
খেয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা করো না ৩১
নৈরাজ্য বর্জন করে চল ৩২
বিদ্রোহের পথ পরিহার কর ৩৪
প্রবৃত্তির উত্তেজনার কবল থেকে বাঁচো ৩৬
বয়আতের তৃতীয় শর্ত ৩৯
পাঁচ বেলার নামায সযত্নে আদায় কর ৩৯
তাহাজ্জুদ নামায নিয়মিত পড় ৪৪
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি
দরূদ প্রেরণ করা-কে স্থায়ী অবলম্বন করে নাও ৪৭
প্রতিনিয়ত ইস্তেগফারে রত থাকো ৫০
ইস্তেগফার ও তওবা ৫৪
সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসায় রত থাকো ৫৫
(চতুর্থ শর্তের ভূমিকা) ৬১
বয়আতের চতুর্থ শর্ত ৬৩
ক্ষমা ও মার্জনাপূর্ণ ব্যবহার কর ৬৪

কাউকে কষ্ট দিও না ৬৬
বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন কর ৭২
বয়আতের পঞ্চম শর্ত ৭৫
দুঃখকষ্ট ভোগ করায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় ৭৬
দুঃখ যখন আঘাত হানে ধৈর্য ধারণের সঠিক সময় তখনই ৭৮
তোমরাই খোদা তা'লার শেষ ধর্মমণ্ডলী ৮০
যে আমার হয়ে গিয়েছে, সে আমা থেকে বিচ্ছিন্ন হতেই পারে না ৮২
পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততা ও অবিচলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন কর ৮২
বয়আতের ষষ্ঠ শর্ত ৮৫
নবসংযোজন বা বিদা'ত এবং কুপ্রথা-কদাচার পরিত্যাজ্য ৮৮
ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের পথপ্রদর্শক পবিত্র কুরআন ৯১
পবিত্র কুরআনেই তোমাদের জীবন নিহিত ৯২
বয়আতের সপ্তম শর্ত ১০১
শির্কের পর অহংকারের ন্যায় বড় আর কোন পাপ নেই ১০১
অহংকারীরা কখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে না ১০৬
অহংকার ও শয়তানের মাঝে গভীর এক যোগসূত্র রয়েছে ১০৭
অহংকার খোদা তা'লার দৃষ্টিতে চরম ঘৃণ্য বিষয় ১১০
মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে দীনহীন ও কাঙালদের মর্যাদা ১১৪
বয়আতের অষ্টম শর্ত ১১৭
ইসলামী শিক্ষার সংক্ষিপ্ত-সার ১১৮
ইসলামের জীবন লাভ আমাদের কাছে এক ফিদিয়া (উদ্ধার-মূল্য) দাবি করে ১২১
পাপ থেকে বাঁচার উপায় হলো একীন (অর্থাৎ, দৃঢ়বিশ্বাস) ১২২
৯ম শর্তের ভূমিকা ১২৫
বয়আতের নবম শর্ত ১২৭
সবার সাথে সদাচরণের শিক্ষা ১২৭
হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং মানবজাতির প্রতি সহমর্মিতা ১৩৯
বয়আতের দশম শর্ত ১৪৩
হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং যুগখলীফার সাথে ভ্রাতৃত্বের
নিবিড় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা জরুরী ১৪৩
ন্যায্য ও অন্যায্য-এর সংজ্ঞা ('মা'রুফ ও গয়ের মা'রুফ'-এর সংজ্ঞা) ১৪৬
আনুগত্যের মহান দৃষ্টান্ত ১৫১
হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যা কিছু লাভ করেছেন
তা মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের মাধ্যমেই পেয়েছেন ১৫২

সর্বাবস্থায় আনুগত্য আবশ্যকীয় ১৫৭
কে জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়? ১৫৮
পরস্পর ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসা সৃষ্টি কর
আল্লাহ্ তা'লার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক গড় ১৬০
হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার দুটি সুফল ১৬২
এই যুগের সুরক্ষিত দুর্গ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ১৬৩
দ্বিতীয় অংশ ১৬৫
তোমাদের জন্য শুভ সংবাদ এখন থেকে সর্বদা তোমরা
ন্যায়সংগত নির্দেশনার আওতাধীন থাকবে ১৬৭
মা'রুফ বা 'ন্যায়সংগত কথার আনুগত্য'– এর প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যাখ্যা ১৬৭
হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে সাধিত আধ্যাত্মিক বিপ্লব ১৭৩
শির্ক পরিহার করা ১৭৩
রিপুর তাড়নার শিকার হবে না ১৭৫
নামাযে নিয়মিত আর তাহাজ্জুদেও গভীর একাগ্রতা আবশ্যকীয় ১৭৭
প্রবৃত্তির উত্তেজনা দমন কর ১৮৩
সুখ-দুঃখ বা কাঠিন্য-স্বাচ্ছন্দ্য সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বস্ত থেকো ১৮৫
হযরত মৌলভী বুরহানুদ্দীন সাহেব (রা.)-এর অনুপম এক দৃষ্টান্ত ১৮৭
ধৈর্যের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ১৮৯
কদাচার পরিহার কর ১৯০
আনুগত্যের বিরল দৃষ্টান্ত ধুমপানের ক্ষতিকর পরিণাম ১৯২
লটারী ধরা বৈধ নয় ১৯৩
মদ্যপানে নিষেধাজ্ঞা ১৯৪
পবিত্র কুরআনের প্রতি ভালোবাসা ১৯৪
এই উপদেশ প্রত্যেক আহমদীর সদা-সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত ১৯৬
বিনয় ও নম্রতা ১৯৮
অহংকার পরিহার কর ২০১
ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য দেয়া ত্যাগের সুমহান মান ২০২
ইসলাম প্রচারে হাকীম ফযল দ্বীন সাহেবের প্রেমময় আবেগ ২০৬
মানবসেবা এবং নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার অতুলনীয় আদর্শের অনুপম দৃষ্টান্ত ২১১
আহমদী চিকিৎসকদের জীবন উৎসর্গ করা উচিৎ ২১৩
হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি সুগভীর অনুরাগ ২২৩
নিষ্ঠাবান মান্যকারীদের সন্তানসন্ততির দায়িত্ব ২২৮
অ-আহমদী বিজ্ঞজনদের স্বীকারোক্তি ২২৯

বয়আতের শর্তসমূহ এবং একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

বেশ কয়েকজন বন্ধুর এ মর্মে পত্র এসেছে যে, "আমরা বয়আত নবায়ন তো করেই নিয়েছি, সেই সাথে বয়আতের শর্তগুলো পালন করার অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত করেছি, তবে আমাদের পুরোপুরি ধারণা ও অন্তর্দৃষ্টি নেই যে, বয়আতের নির্ধারিত দশটি শর্তের বিস্তারিত বিষয়গুলো কী-কী, যা আমাদের মেনে চলতে হবে"।

আমি ভাবলাম আর অনুভব করলাম যে, আজ (২৭ জুলাই ২০০৩, স্থান: লন্ডন) জলসা চলাকালে এ বিষয়ে কিছু বলার উত্তম সময়। যেহেতু বিষয়বস্তু যথেষ্ট ব্যাপক, সবগুলো শর্তের ওপর সামগ্রিক আলোকপাত এখানে এই স্বল্প সময়ে বেশ কষ্টসাধ্য তাই কয়েকটি শর্তের ব্যাপারে কিছুটা বিস্তারিতভাবে জানাবো আর পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ্ এই বিষয়ের ওপর জুমুআর খুতবায় বা অন্য কোন সুযোগে আরো বিশদভাবে বর্ণনা করব।

বয়আত কী?

সর্বপ্রথম কথা হলো, বয়আত কী বা কাকে বলে? এর বিস্তারিত আমি হাদীস শরীফ ও হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি থেকে বর্ণনা করছি।

হুযূর আলাইহিস্ সালাম বলেন:
"এই যে বয়আত, এর প্রকৃত অর্থ হলো নিজেকে বিক্রি করে দেয়া। এর কল্যাণ ও প্রভাব বা ফলাফল লাভ করাটা এই শর্তের সাথে সংবদ্ধ, যেমন ভূমিতে একটি বীজ বপিত হয়ে থাকে, এর প্রারম্ভিক অবস্থা হলো, বাহ্যত তা কৃষকের হাতে বপিত, কিন্তু বলা যায় না যে, এখন তা কোন মোড় নেবে। কিন্তু ওই বীজ যদি ভাল হয় ও তাতে অঙ্কুরিত ও প্রবৃদ্ধি লাভের শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে, তাহলে খোদার অনুগ্রহে এবং ওই কৃষকের চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে সেটা অঙ্কুরিত হয়। এভাবে একটি বীজ থেকে হাজার হাজার শস্যদানা উৎপন্ন হয়। অনুরূপভাবে বয়আত গ্রহণকারী ব্যক্তিকে নম্রতা-শিষ্টতা ও অনুনয়বিনয় অবলম্বন করতে হয় এবং নিজের আমিত্ব ও অহংবোধ পরিত্যাগ করতে হয়, তবেই সে ক্রমোন্নতি লাভের যোগ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু যে ব্যক্তি বয়আতও করে আবার নিজের মাঝে অহংবোধও রাখে, আদৌ তার কল্যাণ লাভ হয় না।" (মলফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৩)

বয়আতের অর্থ হলো খোদা তা'লার হাতে নিজজীবন সঁপে দেয়া

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আরও বলেছেনঃ
"বয়আতের উদ্দেশ্য খোদা তা'লার সমীপে নিজজীবন সঁপে দেয়া। এর অর্থ হলো, আমি নিজের জীবন আজ খোদা তা'লার কাছে বিক্রি করে দিয়েছি। খোদা তা'লার রাস্তায় পথ চলছে এমন কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এটা সম্পূর্ণই ভুল। সত্যবাদী কখনও ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। ক্ষতি হয় তারই, যে মিথ্যাবাদী আর যে ব্যক্তি পার্থিব লাভের জন্য বয়আত করে এবং অঙ্গীকার যা সে আল্লাহ্ তা'লার সাথে করে, তা ভঙ্গ করে চলে। বিশেষভাবে দুনিয়ার ভয়ে যে ব্যক্তি এমন কাজে লিপ্ত, তার স্মরণ রাখা উচিত, মৃত্যুকালে-মৃত্যুরক্ষণে কোন বিচারক বা কোন বাদশাহ্ তাকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে না। তাকে **'আহকামুল হাকেমীন'** (সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক খোদা) এর সামনে উপস্থিত হতে হবে, যিনি তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তুই আমাকে দেয়া অঙ্গীকার রক্ষা করিস নি কেন?' সুতরাং প্রত্যেক মু'মিন-এর জন্য আবশ্যকীয়, খোদা, যিনি **'মালিকিস্‌সামাওয়াতে ওয়াল আরদ'**– আকাশমালা ও পৃথিবীর সর্বাধিপতি, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সত্যিকারের তওবা করা।" (মলফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯, ৩০)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এসব বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, বয়আত খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়! আমাদের প্রত্যেকেই যদি একথা বুঝে যায় যে, আমার এখন নিজস্ব সত্তা বলে কিছু রইল না, আমাকে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশগুলো বাধ্যবাধকতার সাথে মেনে চলতেই হবে, তাঁর অনুগত হতে হবে এবং আমার প্রতিটি কাজকর্মই হবে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য। আর এটাই হলো বয়আতের দশটি শর্তের সারসংক্ষেপ।

এবারে আমি হাদীস শরীফের বিভিন্ন উদ্ধৃতি তুলে ধরছি, যাতে বিভিন্ন বাক্যে বয়আতের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে।

"আ'ইযুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেছেনঃ উবাদাহ বিন সা'মেত (রা.) সেসব সাহাবী, যারা বদরের যুদ্ধে অংশ নেয় তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং 'বয়আতে ওকাবা'-তে সম্মিলিতভাবে অঙ্গীকার গ্রহণকালেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। উবাদাহ বিন সা'মেত (রা.) তাকে বলেছিলেন, ওই সময়– যখন রসূল (সা.)-এর চারপাশে সাহাবীদের এক জামা'ত উপস্থিত ছিল, রসূল (সা.) বললেন, এসো আমার এই শর্তে বয়আত করঃ আল্ লা তুশরিকু বিল্লাহে শাইয়্যান।

তোমরা আল্লাহ্’র সৃষ্ট কোন কিছুকে তাঁর শরীক স্থির করবে না, তোমরা চুরি করবে না আর ব্যভিচারও করবে না, নিজ সন্তানদেরকে তোমরা হত্যা করবে না আর মিথ্যা অপবাদও আরোপ করবে না এবং সৎকর্মে আমার প্রদত্ত কোন নির্দেশের তোমরা অবাধ্য হবে না।

অতএব, তোমাদের মধ্যে বয়আতের এই অঙ্গীকার পূর্ণ করে যারা দেখিয়েছো, তাদের প্রতিদান আল্লাহ্ তা’লার কাছে সুরক্ষিত। আর যারাই এই প্রতিশ্রুতি পালনে কিছুটা শিথিলতা করেছো আর এজন্য দুনিয়াতেই শাস্তি পাওয়া হয়ে গিয়েছে, তাহলে সেই সাজাভোগ তার জন্য ‘কাফফারা’-য় বা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে, আবার যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পালনে শিথিলতা প্রদর্শন সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা’লাই তা ঢেকে রেখেছেন, তবে তার পরিণতি আল্লাহ্ তা’লারই হাতে, চাইলে তাকে শাস্তি দিবেন নইলে তিনি যদি অনুগ্রহ করেন তবে মার্জনা করবেন।” (সহীহ্ বুখারী, কিতাব মানাকেবুল আনসার, বাব ওফুদুল আনসার ইলান্ নাবীয়্যে...)

আরেকটি হাদীস রয়েছে:
হযরত উবাদা বিন সা’মেত (রাযি.)-ই বর্ণনা করেছেন, “আমরা রসূল (সা.)-এর বয়আত এই শর্তে করেছি যে, আমরা শুনবো আর মান্য করবো, স্বাচ্ছন্দ্য ও অস্বাচ্ছন্দ্য কালেও আবার আনন্দসুখের কালেও এবং দুঃসময়েও। আর আদেশদাতার সাথে ঝগড়াবিবাদ করবো না আর যেখানেই আমরা থাকি না কেন, ন্যায়ের বা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবো এবং নিন্দুকের কোন নিন্দায় বা তিরস্কারকারীর করা তিরস্কারকে ভয় পাবো না।” (বুখারী, কিতাবুল বায়’আত, বাব আল বায়’আতু আ’লাস সাময়ে’ ওয়াত তাআ’তে)

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত অনুযায়ী মহিলাদের বয়আত নিতেন:

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا
وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ
بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ
اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۳﴾

(সূরা আল মুমতাহানা, ৬০:১৩)

[অর্থাৎ হে নবী! বিশ্বাসী মহিলাগণ যখন তোমার কাছে এ শর্তে বয়আত করার

জন্য আসে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুর শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না এবং নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, কারো প্রতি অপবাদ আরোপ করবে না, যা তারা নিজেদের হাত ও পায়ের দ্বারা মিথ্যারূপে রচনা করে থাকে এবং কোন সঙ্গত বিষয়ে অবাধ্যতা করবে না, তাহলে তুমি তাদের বয়আত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।]

হযরত আয়েশা (রা.) বলেনঃ
বয়আত নেয়া কালে রসূল (সা.)-এর পবিত্র হাতের সাথে কোন মহিলার হাতের স্পর্শ হতো না, তবে ওই মহিলা ব্যতীত যিনি তার আপনজন ছিলেন। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আহকাম, বাব বায়'আতুন নিসায়ে)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আত নেয়ার প্রাক্কালে ইসলাম দরদী পবিত্রচেতা কতিপয় ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ অনুধাবন করেছিলেন যে, এ যুগে ইসলামের দোদুল্যমান এ তরীকে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষাকারী এবং ইসলামের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা পোষণকারী কোন ব্যক্তি যদি থেকে থাকেন, তবে তিনি হলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী (আ.)। তিনিই মসীহ্ আর মাহ্দীও। এমন কী লোকেরা তাকে বয়আত নেয়ার অনুরোধ জানাতো। কিন্তু হুযূর (আ.) সবসময় এ উত্তরই দিতেন, **'লাসতু বি মামুর'** (অর্থাৎ আমি প্রত্যাদিষ্ট হই নি)। তিনি (আ.) একবার মীর আব্বাস আলী সাহেবের মাধ্যমে মৌলবী আব্দুল কাদের সাহেব (রাযি.)-কে সহজ সরলভাবে লিখে দেন যে "এই অধমের প্রকৃতিতে তৌহীদ (আল্লাহ্‌র একত্ব) ও খোদার কাছে সমর্পণের বৈশিষ্ট্য প্রবলভাবে বিরাজমান আর... যেহেতু বয়আতের ব্যাপারে এখন পর্যন্ত করুণাময় খোদার পক্ষ থেকে কোন জ্ঞান বা নির্দেশ লাভ হয় নাই, এজন্য কৃত্রিমতার পথে পা বাড়ানো বৈধ নয়। **'লাআ'ল্লাহা ইউহ্‌দিছু বাআ'দা যালিকা আমরান'** (হয়ত মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ পরবর্তীতে কোন কিছু প্রকাশ করবেন)। মৌলবী সাহেব! ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব প্রসারে সচেষ্ট হোন। নিষ্ঠা ও আন্তরিক ভালোবাসার সঞ্জীবনী প্রস্রবণ ধারায় ওই চারাগাছের পরিচর্যায় লেগে থাকুন, তাহলে এই পদ্ধতি ইনশাআল্লাহ্ খুবই ফলপ্রসূ ও লাভজনক হবে।" (হায়াতে আহমদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২, ১৩)

আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে বয়আত নেয়ার আদেশ

অবশেষে ছয়-সাত বছর পর ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম ছয় মাসে অর্থাৎ বছর শুরুর তিন মাসের মধ্যেই আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তার (আ.) প্রতি বয়আত নেয়ার নির্দেশ হলো। এই স্বর্গীয় আদেশ যে বাক্যে পৌঁছেছে তা ছিল **"ইযা আযাম্‌তা ফাতাওয়াক্ কাল্ আ'লাল্লাহে ওয়াস্ না'ইল ফুলকা বি আ'ইউনিনা ওয়া ওয়াহ্ইনা। আল্লাযিনা ইউ বাইয়েউ'নাকা ইন্নামা ইউবাইয়েউ'নাল্লাহা ইয়াদুল্লাহে ফাওকা আয়দিহিম"**। [ইশতেহার (প্রচারপত্র), পহেলা ডিসেম্বর ১৮৮৮, পৃষ্ঠা ২]

অর্থাৎ- যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হও, আল্লাহ্ তা'লার ওপর নির্ভর কর এবং আমার সামনে এবং আমার ওহীর অধীনে তরী নির্মাণ কর। যেসব লোক তোমার হাতে বয়আত করবে, তাদের হাতের ওপর আল্লাহ্ তা'লার হাত থাকবে।

হুযূর (আ.)-এর স্বভাব-প্রকৃতি এমনই ছিল যে, যদু-মধু সকলেই বয়আতে যোগ দেবে– তিনি তা ঘৃণা করতেন। অথচ তার অন্তর চাইতো যে, এই পবিত্র জামা'তে ওই সব আশিসমণ্ডিত লোকেরা প্রবেশ করুক, যাদের প্রকৃতিতে বিশ্বস্ততার ধাত্ বা মূল রয়েছে আর যারা অপরিপক্ক হতোদ্যম নয়। এজন্য তিনি (আ.) এমন একটি উপলক্ষ্যের অপেক্ষায় ছিলেন, যা একনিষ্ঠ খাঁটি বিশ্বাসী আর কপট লোকদের মধ্যে পার্থক্য করে দেখাবে। তাই আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু নিজের পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা ও করুণায় একই বছর অর্থাৎ নভেম্বর ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে 'বশীর আউয়াল' এর মৃত্যু দ্বারা সেই উপলক্ষ্য সৃষ্টি করে দিলেন [ইনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুত্র ছিলেন]। এতে সারা দেশে তাঁর (আ.) বিরুদ্ধে বিরোধিতার ঝড় উঠলো। আর কুধারণা পোষণকারীরা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কেটে পড়লো, তার (আ.) দৃষ্টিতে এটাই ছিল আশিসমণ্ডিত এই জামা'তের শুভ সূচনার যথোপযুক্ত সময়। তিনি (আ.) পহেলা ডিসেম্বর ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে এক ইশতেহার (প্রচারপত্র)-এর মাধ্যমে বয়আতের সাধারণ ঘোষণা প্রদান করে দিলেন। হযরত আকদাস দিকনির্দেশনা প্রদান করেন যে, মহানবী (সা.)-এর সুন্নত অনুযায়ী ইস্তেখারা সম্পন্ন করার পর ইচ্ছুক ব্যক্তিরা যেন বয়আতের জন্য উপস্থিত হয়। (ইশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দ)

অর্থাৎ, আগে দোয়া করুন, ইস্তেখারা করে নিন, অতঃপর বয়আত করুন।

এই প্রচারপত্র প্রকাশের পর হযরত আকদাস (আ.) কাদিয়ান থেকে লুধিয়ানায় গমন করেন ও 'মহল্লা জাদীদ'-এ হযরত সুফি আহমদ জান সাহেব (রা.)-এর গৃহে অবস্থান করেন। (হায়াতে আহমদ, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃষ্ঠা ১)

বয়আতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

তিনি (আ.) সেখান (লুধিয়ানা) থেকে বয়আতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি আলোকপাত করে ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ৪ মার্চ প্রচারিত এক ইশতেহারে (প্রচারপত্রে) লিখেন :

মুত্তাকীদের জামা'ত গঠন অর্থাৎ, খোদাভীরুতায় অলংকৃত ব্যক্তিদের এক জামা'তে সংঘবদ্ধ করা হলো বয়আতের এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য, যাতে খোদাভীরুদের এমন বড় এক দল গঠিত হয়ে জগতে নিজেদের পবিত্র প্রভাবের বিস্তার ঘটাতে পারে এবং তাদের একতা, ইসলামের জন্য কল্যাণ, মাহাত্ম্য ও শুভ পরিণাম বয়ে আনে। তারা এক ও অভিন্ন বিষয়ে সমবেত হওয়ার কল্যাণে, ইসলামের পূতপবিত্র সেবায় দ্রুত কাজে আসতে পারে। তারা যেন অলস, কৃপণ ও অকর্মণ্য মুসলমান সাব্যস্ত না হয়। আর এমন অর্বাচীন লোকদের মতও যেন না হয়, যারা নিজেদের মতবিরোধ ও অনৈক্যের মাধ্যমে ইসলামের বিরাট ক্ষতি সাধন করেছে, এর (অর্থাৎ, ইসলামের) অনিন্দ্য সুন্দর চেহারায় নিজেদের দুষ্কর্মপরায়ণতার কালিমা লেপন করেছে। আবার এমন উদাসীন দরবেশ ও ঘরকুনোর মতও যেন না হয়, যারা ইসলামের বর্তমান চাহিদাগুলো সম্পর্কে কোন খবরই রাখে না, যাদের নিজ ভাইদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনের কোন মনমানসিকতা নেই আর যাদের মানব-সন্তানের কল্যাণ সাধনের কোন অনুপ্রেরণা বা স্পৃহাও নেই। পক্ষান্তরে এদের অর্থাৎ, বয়আতকারীদের মানবজাতির প্রতি এমন সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত, যারা হবে গরীবের আশ্রয়স্থল, এতীমদের জন্য পিতৃতুল্য এবং ইসলামের কাজে আত্মোৎসর্গে সদা প্রস্তুত একান্ত এক প্রেমিকের মত। আর তাদের সাহায্যসহযোগিতা, সহায়তা এবং যাবতীয় চেষ্টাপ্রচেষ্টা ও সাধ্যসাধনা এ উদ্দেশ্যে নিবেদন করা উচিত, যেন এর সার্বজনীন কল্যাণ বিশ্বময় বিস্তার লাভ করে। ঐশীপ্রেমে ও খোদা তা'লার সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতার পবিত্র প্রস্রবণ ধারা যেন প্রতিটি হৃদয় হতে উৎসারিত হয়ে একস্থানে মিলিত হয়ে বহমান এক সমুদ্র স্রোতের ন্যায় প্রতিভাত হয়। ...খোদা তা'লা এই দলকে নিজ প্রতাপ প্রকাশ করতে ও স্বীয় শক্তি, ক্ষমতা ও মহিমা প্রদর্শনের জন্য সৃষ্টি করতে আর উন্নতি দিতে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যাতে পৃথিবীতে খোদাপ্রেম, সত্যিকার অনুতাপ, পবিত্রতা, প্রকৃত ও সঠিক পুণ্যকর্ম, শান্তি ও কল্যাণ এবং

মানবসন্তানদের পরস্পরের মাঝে মায়ামমতা ও সহমর্মিতা ছড়িয়ে দিতে পারেন। অতএব এই দল, তাঁর বিশেষ এক দলের মর্যাদা পাবে। তিনি তাদেরকে তাঁর নিজস্ব বিশেষ প্রেরণায় শক্তি যোগাবেন। তাদেরকে কলুষিত জীবন থেকে মুক্তি দেবেন। অতঃপর তাদের জীবনে এক পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করবেন। তিনি যেমনটি তাঁর নিজ পবিত্র ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এই দলকে তিনি বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং হাজার হাজার বিশ্বস্ত ও সত্যবাদীদের এতে প্রবিষ্ট করবেন। তিনি স্বয়ং এতে পানি সিঞ্চন করবেন এবং একে এতটা উন্নতি দান করবেন যে, এদের আধিক্য ও কল্যাণসমূহ মানবীয় দৃষ্টিতে আশ্চর্যজনক মনে হবে। তারা উঁচু স্থানে স্থাপিত প্রদীপ্ত মশালের মত দুনিয়ার চতুর্দিকে স্বীয় আলোকময় দ্যুতি ছড়িয়ে দেবে আর ইসলামের কল্যাণরাজির জন্য তারা অনুকরণীয় আদর্শ স্বীকৃত হবেন। তিনি এই জামা'তের পূর্ণ অনুসারীদেরকে সকল প্রকার কল্যাণের ক্ষেত্রে অন্য জামা'তের ওপর পূর্ণ বিজয় দান করবেন। কেয়ামতকাল পর্যন্ত স্থায়ীভাবে তাদের মধ্য থেকে এমন লোক সৃষ্টি হতে থাকবে, যাদেরকে গ্রহণযোগ্যতা ও সহায়তা প্রদান করা হবে। সেই মহাপ্রতাপান্বিত প্রতিপালক এটাই চেয়েছেন, তিনি সর্বশক্তিমান, যা-ই চান, করে থাকেন। প্রত্যেক শক্তি ও মহিমা তাঁরই।"
(তবলীগে রিসালত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫০ থেকে ১৫৫)

এই ইশতেহারে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, বয়আত গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা যেন ২০ মার্চের পর লুধিয়ানা পৌঁছে।

বয়আতের সূচনা

সুতরাং সেই ঘোষণাপত্র অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ২৩ মার্চ ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে 'মহল্লা জাদীদ'-এ অবস্থিত সুফি আহমদ জান সাহেবের বাড়িতে বয়আত নেন। হযরত মুনশী আব্দুল্লাহ সানৌরী সাহেব (রাযি.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী বয়আতের ঐতিহাসিক ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করে রাখতে এক রেজিষ্টার প্রস্তুত করা হয়, যার শিরোনাম দেয়া হয় **'বয়আতে তওবা বারায়ে তাক্ওয়া ও তাহারাত'** [অর্থাৎ খোদাভীতি ও পবিত্রতা অর্জনের জন্য তওবার বয়আত]। সেকালে হুযূর (আ.) বয়আত করানোর জন্য একটি কক্ষে একেকজনকে পৃথক-পৃথক ভাবে ডাকতেন ও বয়আত নিতেন। এভাবে তিনি (আ.) সর্বপ্রথম হযরত মাওলানা নূর উদ্দীন (রাযি.)-এর বয়আত নেন।

বয়আতকারীদের উপদেশ দিতে গিয়ে হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

“এই জামা’তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রথমেই তোমাদের উচিত, জীবনযাপন প্রণালীতে পূর্ণরূপে পবিত্র পরিবর্তন আনা, যেন খোদার সত্তায় ঈমান সত্য প্রমাণিত হয়, সব বিপদআপদে তিনিই যেন কাজে আসেন। তাঁর নির্দেশাবলীকে তোমাদের তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয় বরং একেকটি আদেশকে ভক্তিশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা উচিত আর কার্যত এই সম্মানের প্রমাণও দেয়া উচিত। উপায়-উপকরণের প্রতি সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে যাওয়া এবং এরই ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা এবং খোদার প্রতি নির্ভরশীলতা ছেড়ে দেয়া শির্‌ক। এটি খোদার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করার নামান্তর। উপায়-উপকরণের প্রতি এতটুকু নির্ভর করা যেতে পারে, যা ‘শির্‌ক’এ পর্যবসিত না হয়। আমাদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী আমরা উপায়-উপকরণ কাজে লাগাতে নিষেধ করি না, কিন্তু একমাত্র এরই ওপর সামগ্রিকভাবে নির্ভর করাটা নিষেধ করে থাকি। ‘হস্ত কাজে নিয়োজিত, হৃদয় প্রেমাস্পদের স্মরণে নিমগ্ন’ জীবনাচার এমনই হওয়া চাই।”

তিনি (আ.) বলেন:

“দেখো হে লোকেরা! তোমরা এখন, যে বয়আত করলে আর অঙ্গীকার করলে, মুখে তা বলে দেয়াটা সহজ ছিল বটে, তবে কাজে পরিণত করা কঠিন ও কষ্টসাধ্য। কেননা, শয়তান মানুষকে ধর্মের ব্যাপারে উদাসীন করে তোলার চেষ্টাতে লেগে রয়েছে। দুনিয়া ও পার্থিব স্বার্থকে সে সহজলভ্য ও আকর্ষণীয় করে দেখায় আর ধর্ম যেন সুদূরের কিছু! এভাবে হৃদয় পাষাণ হয়ে যায় আর পরবর্তী অবস্থা পূর্বের চেয়ে মন্দতর হতে থাকে। যদি খোদাকে সন্তুষ্ট করতে হয় তবে পাপ পরিহার করার, গুনাহ থেকে দূরে থাকার এবং কৃত ওই অঙ্গীকার রক্ষার জন্য দৃঢ় মনোবল ও চেষ্টা সহকারে প্রস্তুত হয়ে যাও।”

তিনি (আ.) আরো বলেন:

“নৈরাজ্যকর কোন কিছু করো না। দুষ্কৃতি ছড়িয়ে দিও না। গালি শুনে ধৈর্য ধারণ কর। কারো সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। কেউ বিবাদ করলে তার সাথেও ভাল ও পুণ্যময় আচরণ কর। মিষ্টভাষীর উত্তম নমুনা প্রদর্শন কর। সর্বান্তঃকরণে প্রতিটি আদেশের আজ্ঞানুবর্তীতা কর, যাতে খোদা রাজি হয়ে যান, সন্তুষ্ট হয়ে যান। শত্রুও যেন বুঝে যায় যে, বয়আত করে এখন এ ব্যক্তি

আর তেমনটি নেই, যেমনটি পূর্বে ছিল। বিচারকার্যে সত্য সাক্ষ্য দাও। এই জামা'তে প্রবেশকারীর উচিত, সম্পূর্ণ আন্তরিক নিষ্ঠা ও দৃঢ় সদিচ্ছা নিয়ে সর্বান্তকরণে সততায় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া।" (যিকরে হাবীব, পৃষ্ঠা ৪৩৬ থেকে ৪৩৯)

১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাস। ঈদের দিন ছিল, কতিপয় বন্ধু অপেক্ষারত ছিলেন। তিনি (আ.) বলেন:
"দেখুন! যে ধার্মিকতার সাথে আপনারা এখন বয়আত করবেন এবং যারা পূর্বে বয়আত করা পূর্ণ করেছেন, তাদের উদ্দেশ্যে উপদেশ হিসেবে কিছু কথা বলছি, সেসব কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা ও মেনে চলা উচিত।

আপনাদের এই বয়আত, 'তওবা'র বয়আত। তওবা দু'স্তরে হয়। প্রথমত পূর্বে কৃত পাপ থেকে অর্থাৎ, পূর্বে যা কিছু ভুল করা হয়েছে, সে সব সংশোধন করার মাধ্যমে সেগুলোর প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণ করা এবং যত বেশি সম্ভব বিকৃতি লাঘবের চেষ্ট করা। ভবিষ্যতে পাপকর্ম থেকে দূরে থাকা ও পরিত্যাগ করা এবং নিজ সত্তাকে এ আগুন থেকে বাঁচিয়ে রাখা।

আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তওবার কল্যাণে যাবতীয় পাপ, পূর্বে যা ঘটে গিয়েছে তা ক্ষমা হয়ে যায় এ শর্তে যে, তা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে হতে হবে। কোন গোপন প্রতারণা হৃদয়ের কোন কোনায় যেন ঘাপটি মেরে না থাকে। তিনি অন্তরে লুক্কায়িত গুপ্ত বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত। তিনি কারো ধোঁকায় পড়েন না। অতএব উচিত হবে তাঁকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা না করা, বরং বিশ্বস্ততার সাথে, অকপটভাবে তার সমীপে তওবা করা। তওবা মানুষের জন্য অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় ও অনোপকারী কোন কিছু নয় এবং এর প্রভাব কেবলমাত্র কিয়ামতের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এদ্বারা মানুষের ইহকাল ও পরকাল দুই-ই সুসজ্জিত হয়ে যায়। এপার-ওপার, উভয়পারে আরাম ও সুখ লাভ হয়ে থাকে।" (মলফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৭, ১৮৮)

১
বয়আতের প্রথম শর্ত

বয়আতকারী সর্বান্তঃকরণে একথার অঙ্গীকার করবে যে,
এখন থেকে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত
শির্‌ক থেকে বিরত থাকবে।

খোদা তা'লা শির্‌ক ক্ষমা করবেন না

আল্লাহ্ তা'লা 'সূরা নিসা'-র ৪৯ আয়াতে বলেছেন:

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ
وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى إِثْمًا عَظِيْمًا ﴿٤٩﴾

অনুবাদ: অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে তাঁর কোন শরীক আছে বলে মনে করে, এ ছাড়া সবকিছু তিনি ক্ষমা করে দেবেন যার জন্য তিনি চান। এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র শরীক আছে বলে মনে করে নিশ্চয়ই সে অনেক বড় পাপে লিপ্ত হয়েছে।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে বলেন:
"একই ভাবে আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে বলেছেন **'ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা... (প্রাগুক্ত)'** অর্থাৎ প্রতিটি পাপের ক্ষমা হবে তবে শির্‌ক্‌কে খোদা ক্ষমা করবেন না। অতএব শির্‌ক এর ধারেকাছেও ঘেঁষবে না আর এটাকে নিষিদ্ধ বৃক্ষ জ্ঞান করবে।" (তোহ্‌ফায়ে গোলড়বীয়া হতে সংকলিত, রূহানী খাযায়েন, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৩ ও ৩২৪-এর টীকা)

তিনি (আ.) আরও বলেন:
"এখানে শির্‌ক বলতে কেবল প্রস্তরের (নির্মিত) প্রতিমাসমূহের আরাধনাকে বোঝায় না বরং উপায়-উপকরণের পূজা এবং জাগতিক মিথ্যা উপাস্যদের গুরুত্ব দেয়াও শির্‌ক।" (আল হাকাম, ৭ম খণ্ড, সংখ্যা ২৪, ৩০ জুন ১৯০৩, পৃষ্ঠা ১১)

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে আরও বলেন:

وَاِذۡ قَالَ لُقۡمٰنُ لِابۡنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَا تُشۡرِكۡ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيۡمٌ ﴿۱۴﴾

(সূরা লুকমান, ৩১:১৪)

অনুবাদ: আর যখন লুকমান তার পুত্রদের নসীহত করতে গিয়ে বলল, 'হে আমার প্রিয় পুত্রগণ, আল্লাহ্র সাথে শরীক করবে না; নিশ্চয় শির্ক হলো বিরাট এক অন্যায়।

মহানবী (সা.)-এর নিজ উম্মতের মাঝে শির্কের বিষয়ে আশঙ্কা ছিল। এক হাদীসে যেমন রয়েছে:

উবাদা বিন নসী (রা.) আমাদেরকে শাদ্দাদ বিন আ'উস (রা.) সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি কাঁদছিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আপনি কাঁদছেন কেন?' এতে তিনি বললেন, "আমার এমন এক বিষয় মনে পড়ে গেল যা আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছি, এ কারণেই আমার কান্না পেল। আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'আমি আমার উম্মতের মধ্যে শির্ক ও গোপন অভিলাষ ও কামনাবাসনা সম্পর্কে ভয় করছি'।" বর্ণনাকারী বলছেন, আমি নিবেদন করলাম, "হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনার উম্মত কি আপনার পর শির্কের পরীক্ষায় নিপতিত হবে?" উত্তরে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ, অবশ্য আমার উম্মত, সূর্যের ও চাঁদের বা মূর্তিপ্রতিমা বা প্রস্তরের (নির্মিত) প্রতিমাসমূহের পূজা তো করবে না কিন্তু লোক দেখানো কাজকর্ম করবে এবং গোপন অভিলাষ চরিতার্থে লিপ্ত হবে। এদের মধ্যে কারো রোযা রাখা অবস্থায় যদি প্রভাতকাল এসে যায় আর সেই সাথে কোন কামনাবাসনা জাগ্রত হয়, তবে রোযা ভঙ্গ করে হলেও সে ওই অভিলাষ চরিতার্থে লিপ্ত হয়ে যাবে।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৪, বৈরুতে মূদ্রিত)

'শির্ক' এর প্রকারভেদ ও রকমফের

এ হাদীস থেকে প্রকাশ পায়, মূর্তিপ্রতিমা বা চাঁদসুরুজের আরাধনা করে প্রকাশ্য শির্ক যদি না-ও করা হয় তবুও লোক দেখানো কাজকর্ম এবং কামনাবাসনার পেছনে ছুটতে থাকাটাও শির্ক। যদি কোন অধিনস্ত, তার

উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আনুগত্যের সীমা ছাড়িয়ে তোষামোদ বা তোয়াজ করার মানসে এই ভেবে তার আগে পিছে ছুটা-ছুটি করে যে, তারই হাতে আমার রুটিরুজি ন্যস্ত, তাহলে এটাও এক ধরনের শির্ক। কারও নিজপুত্রদের নিয়ে এই বলে যদি গর্ব থাকে যে, আমার এতগুলো পুত্রসন্তান আছে, এরা বড় হচ্ছে, এরা কাজে লেগে যাবে, আয়রোজগার করবে। আমার দেখাশোনা করবে, বাকি জীবনটা আমার আরামআয়েশে কেটে যাবে। অথবা আমার ওই যুবক ছেলেদের কারণে আমার ভাগীশরীকরা আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতার সাহস করবে না। (উপমহাদেশে, বরং সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ভাগীশরীকদের মধ্যে রেষারেষীমূলক খুবই মন্দ এ প্রথা চালু আছে।) একশতভাগ ভরসা থাকে এসব পুত্রদের ওপর। সেসব পুত্র যদি অথর্ব হয় অথবা কোন দুর্ঘটনায় মারা যায় বা পঙ্গু হয়ে যায়, তাহলে তো তার (সেই পিতার) সকল অবলম্বন হারিয়ে গেলো।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

হৃদয়ে হাজার হাজার প্রতিমা জমা থাকা আর মুখে কেবলই **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'** বলতে থাকার নাম তৌহীদ নয়। বরং যে ব্যক্তি তার নিজের কোন কাজ, ফন্দিফিকির, চালবাজি বা চেষ্টাপ্রচেষ্টাকে খোদার ন্যায় গুরুত্ব দেয় বা কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা রাখে, যা খোদার উপর রাখা উচিত, এমন সব পরিস্থিতিতে সে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে পৌত্তলিকই। প্রতিমা শুধু তা-ই নয়, যা সোনা, রূপা, পিতল বা পাথর প্রভৃতি দ্বারা নির্মাণ করা হয় এবং যার উপর ভরসা করা হয়; বরং প্রতিটি জিনিস বা কথা বা কাজ, যাকে এমন গুরুত্ব দেয়া হয়, যা খোদা তা'লার প্রাপ্য, সে সবই খোদা তা'লার দৃষ্টিতে প্রতিমা। ...মনে রাখতে হবে, প্রকৃত তৌহীদ বা একত্ত্ববাদ, যার স্বীকৃতি খোদা আমাদের কাছে চান এবং যে স্বীকৃতির সাথে মুক্তির সম্পর্ক, তা এটাই যে, খোদা তা'লাকে মূর্তি, মানুষ, সূর্য, চন্দ্র, নিজসত্ত্বা বা প্রবৃত্তি কিংবা নিজস্ব চেষ্টাপ্রচেষ্টা, ফন্দিফিকির ইত্যাদি সব রকমের অংশীবাদিতা থেকে পবিত্র জ্ঞান করা। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীতায় কোন সত্তাকে সর্বশক্তিমান জ্ঞান না করা। কাউকেই **'রায্যাক'**- (প্রকৃত) অন্নদাতা জ্ঞান না করা, কাউকেই **'মুই'য্যু'**- (প্রকৃত) সম্মানদাতা বা **'মুযিল্লু'**- (প্রকৃত) লাঞ্ছনাকারী মনে না করা এবং কাউকেই নিরঙ্কুশ সাহায্যকারী আখ্যা না দেয়া। দ্বিতীয় কথা হলো স্বীয় প্রেম একমাত্র তাঁকেই নিবেদন করা, ইবাদত শুধু তাঁরই জন্য একনিষ্ঠভাবে করা,

একমাত্র তাঁর কাছে বিনয়াবনত হওয়া ও সকল আশা ও ভরসাস্থল একমাত্র তাঁর সত্ত্বাকে মনে করা এবং শুধু তাঁকেই ভয় করা। অতএব, কোন তৌহীদ নিম্নোক্ত তিন প্রকার বিশেষত্ব ছাড়া পূর্ণাঙ্গীন ও পরিপূর্ণ হতে পারে না।

প্রথমত সত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে তৌহীদ। অর্থাৎ, তাঁর অস্তিত্বের সামনে যা কিছু আছে, সবই বিলুপ্তপ্রায় জ্ঞান করা এবং সেসবকে নশ্বর ও অসার মনে করা।

দ্বিতীয়ত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তৌহীদ। অর্থাৎ, প্রতিপালন ও খোদা হওয়ার গুণাবলী স্রষ্টার সত্তা ছাড়া কারও প্রতি আরোপ না করা এবং বাহ্যিকভাবে বিভিন্ন শ্রেণির যে প্রতিপালনকারী ও কল্যাণ সাধনকারী দৃষ্টিগোচর হয়, তাকে তাঁরই হাতে 'সৃষ্ট' (ব্যবস্থাপনা) বলে প্রত্যয় করা।

তৃতীয়ত প্রেম, নিষ্ঠা ও নির্মলতার দিক দিয়ে তৌহীদ। অর্থাৎ, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ইত্যাদি উপাচারমূলক আনুষ্ঠানিকতাতে অন্য কিছুকে খোদা তা'লার শরীক মনে না করা, তদুপরি তাঁর-ই মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়া। (সিরাজ উদ্দীন ঈসায়ীকে চার সঁওয়ালোকা জওয়াব, রূহানী খাযায়েন, ১২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৯, ৩৫০)

ইতঃপূর্বে এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত কিছু ব্যাখ্যা আমি করে দিয়েছি। এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেনঃ
"আল্লাহ্ তা'লাকে বাদ দিয়ে তাঁর কোন নাম, কাজকর্ম বা ইবাদতে অন্য কাউকে অংশীদার মনে করা শির্ক। সকল ভাল কাজকর্ম আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য করার নামই হলো ইবাদত। মানুষ স্বীকার করে যে, খোদা তা'লা ব্যতীত স্রষ্টা কেউই নাই। এটাও স্বীকার করে যে, মৃত্যু ও জীবন খোদা তা'লারই হাতে, তাঁরই নিয়ন্ত্রণে তাঁরই শক্তি ও ক্ষমতায় এবং তাঁরই আয়াত্ত্বাধীনে। এসব মান্য করা সত্ত্বেও অপরকে সেজদা করে, মিথ্যা বলতে থাকে আর সেসবেরই চারদিকে প্রদক্ষিণ করে। পরম উপাস্যের আরাধনা ছেড়ে দিয়ে অন্যের ধ্যানে মগ্ন থাকে। খোদা তা'লার জন্য রোযা রাখা বাদ দিয়ে অপরের জন্য উপোস দেয়। খোদা তা'লার উদ্দেশ্যে নিবেদিত নামাযের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে গায়রুল্লাহ্'র নামায পড়ে আর তাদের জন্যই যাকাত দেয়। এসব মিথ্যা সন্দেহসংশয় বিদূরিত করতে আল্লাহ্ তা'লা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আবির্ভূত করেছেন। (খুতবাতে নূর, পৃষ্ঠা ৭, ৮)

বয়আতের দ্বিতীয় শর্ত

মিথ্যা, ব্যাভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, সকল প্রকার অবাধ্যতা ও পাপাচার, অন্যায়, খিয়ানত এবং নৈরাজ্য ও বিদ্রোহের সকল পথ পরিহার করে চলবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোক না কেন, এর কাছে পরাভূত হবে না।

এই একটি শর্তে নয় প্রকারের পাপকর্ম উল্লেখিত হয়েছে, প্রত্যেক বয়আতকারীকে প্রত্যেক ওই ব্যক্তিকে, যে নিজে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তে অন্তর্ভুক্তির দাবি করে, তাকে ওই পাপসমূহ থেকে আত্মরক্ষা করে চলতে হবে।

সবচেয়ে বড় পাপ– মিথ্যা

সত্যিকার অর্থে সবচেয়ে বড় পাপ হলো মিথ্যা। এ কারণেই কোন ব্যক্তি যখন মহানবী (সা.)-এর সমীপে আবেদন জানালো যে, আমার জন্য মেনে চলা সম্ভব এমন কোন উপদেশ আমাকে দিন। কেননা, আমার মাঝে বহু পাপাচার বিদ্যমান এবং সে সব পাপকর্ম আমি একই সাথে পরিত্যাগ করতে সক্ষম হবো না। তিনি (সা.) বললেন, 'এ প্রতিজ্ঞা কর যে– সর্বদা সর্বাবস্থায় সত্য বলবে, কখনও মিথ্যা বলবে না'। এর কল্যাণে একে একে তার সব দোষত্রুটি ও পাপ দূর হয়ে গেল। কেননা, যখনই কোন পাপকর্ম করার ইচ্ছা তার জাগতো, সাথে সাথে তার মনে পড়তো যে, ধরা যদি পড়ে যাই তবে মহানবী (সা.)-এর কাছে তা উত্থাপিত হবে আর 'মিথ্যা বলবো না' বলে আমি অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি। সত্য কথা বললে হয় লজ্জিত হতে হবে নয়তো শাস্তি পেতে হবে। এভাবে ধীরে ধীরে তার যাবতীয় পাপাচার দূর হয়ে গেল। সত্যিকার অর্থে সকল পাপের মূলই হলো মিথ্যা।

এবারে আমি বিষয়টির কিছুটা বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করছি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন–

ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ﴿۳۱﴾

(আল হাজ্জ, ২২:৩১)

অনুবাদঃ আর যে ব্যক্তিই ওইসবের সম্মান করবে, যাকে আল্লাহ্ সম্মানিত করেছেন, তাহলে সেটা তার জন্য তার প্রভু-প্রতিপালকের দৃষ্টিতে উত্তম। আর তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল (বৈধ) করা হয়েছে, তবে সেটা ব্যতীত যার উল্লেখ তোমাদের কাছে করা হয়েছে। অতএব প্রতিমার অপবিত্রতা থেকে নিবৃত্ত হও আর মিথ্যা বলা এড়িয়ে চল। এখানে অংশীবাদীতা (শির্ক) ও মিথ্যাকে একই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা আরো বলেন :

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ؕ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ﴿۴﴾

(আয্ যুমার, ৩৯:৪)

অনুবাদ : সাবধান! প্রকৃত ইবাদত আল্লাহ্রই প্রাপ্য আর সেই সব লোক, যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের বন্ধু নির্ধারন করে নিয়েছে, (বলে থাকে যে) 'আমরা একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই তাদের ইবাদত করি, যেন তারা আমাদের আল্লাহ্র সান্নিধ্যে এনে নৈকট্যের উন্নত স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়'। সাবধান! যে বিষয়ে তারা মতভেদ করতো সে বিষয়ে নিশ্চয় তাদের মাঝে মীমাংসা আল্লাহ্-ই করবেন। আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে হেদায়াত দেন না, যে মিথ্যাবাদী অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ।

সহীহ্ মুসলিম শরীফে একটি হাদীস রয়েছে:

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর ইবনুল আ'স (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, চারটি বিষয় কোন ব্যক্তির মাঝে যদি বিরাজমান থাকে, তাহলে সে পাক্কা মুনাফেক। আর যার মাঝে এর কোন একটি দেখা যায়, সে ব্যক্তিতে কপটতার এক স্বভাব বিদ্যমান। কতই না ভালো হতো যদি সে তা পরিত্যাগ করতো।

ক) আলাপচারিতাকালে সে মিথ্যা বলে (অর্থাৎ, যখন সে কথাবার্তা বলে তখন তাতে মিথ্যার সংমিশ্রণ থাকে, নিজ থেকে বানিয়ে মিথ্যা বলতে থাকে)।

খ) চুক্তি করলে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

গ) অঙ্গীকারাবদ্ধ হলে কৃত অঙ্গীকার সে ভঙ্গ করে। (এটাও এক প্রকার মিথ্যা) এবং

ঘ) ঝগড়াবিবাদে গালিগালাজ করে।

এ সবধরণের কার্যকলাপ মিথ্যার সাথে সম্পর্কিত।

এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে:
হযরত ইমাম মালেক (রহ.) বর্ণনা করেছেন, "আমি জানতে পেরেছি যে, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ (রা.) বলতেন– 'তোমাদের **সত্য** অবলম্বন করা উচিত। কেননা, **সত্য** সৎকর্মের পথনির্দেশ করে আর সৎকর্ম জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। **মিথ্যা** এড়িয়ে চলো। কেননা, **মিথ্যা** অবাধ্যতার পথে ঠেলে দেয় আর অবাধ্যতা নরকে নিক্ষেপ করে। বলা হয়ে থাকে, সে সত্য বলে বাধ্যগত হয়ে গেলো আর অপর ব্যক্তি মিথ্যা বলে কুকর্মে লিপ্ত হয়ে ধৃত হলো– এটি কি আপনাদের জানা নেই'?" [মুআত্তা' ইমাম মালিক, বাব মাজাআ ফিসসিদক্বে ওয়াল কিযবে']

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল-এ আরও একটি হাদীস আছে:
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেন, 'যদি কোন ব্যক্তি ছোট্ট কোন শিশুকে বলে– এসো, আমি তোমাকে কিছু একটা দিচ্ছি কিন্তু এরপর সে তাকে কিছুই দেয় না, তবে এটি মিথ্যার মাঝে গণ্য হবে'।" [মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৯, বৈরুতে মুদ্রিত]

তরবীয়তের জন্য এটা অত্যাবশ্যক। দেখুন! শিশুদের তরবীয়তের জন্য হাসিঠাট্টার ছলেও এমন কথা বলা অনুচিত। নইলে হাসিঠাট্টার দরুন শিশুদের মধ্যে অসত্য বলার বদ অভ্যাস গড়ে ওঠে, যা ভবিষ্যতে স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে মিথ্যা বলাটাকে তারা আর দোষের কিছু মনে করে না। এক পর্যায়ে মিথ্যা যে বলছে, সে চেতনাবোধটুকুও লোপ পেয়ে যায়।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, "মহানবী (সা.) বলেছেন, 'সত্য' পুণ্যের দিকে ধাবিত করে আর পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। অতএব, যে

ব্যক্তি সদা সত্য কথা বলে, আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে সে 'সিদ্দিক' (সত্যবাদী) গণ্য হয়। 'মিথ্যা', পাপ ও অবাধ্যতার দিকে ঠেলে দেয় আর অবাধ্যতা নরকে নিক্ষেপ করে আর এভাবে সেই ব্যক্তি, যে সর্বদা মিথ্যা বলে আল্লাহ তা'লার কাছে সে 'চরম মিথ্যাবাদী' হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে যায়।" (বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাব কাউলুল্লাহে ইত্তাকুল্লাহা ওয়া কুনু মাআ'স্ সা'দিকীন)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আ'স (রা.) বর্ণনা করেন, "এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হলো আর নিবেদন করলো, 'হে রসূলুল্লাহ (সা.)! জান্নাতে প্রবেশের জন্য কী করা উচিত?' মহানবী (সা.) বললেন, 'সত্য বলা। কোন বান্দা যখন সত্য বলে তখন সে অনুগত বান্দা হয়ে যায়, এভাবে আনুগত্যকারী হওয়ার ফলে সে প্রকৃতই মু'মিন হয়ে যায় আর প্রকৃত মু'মিন হওয়ার সুবাদে সে অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করে।' সেই ব্যক্তি পুনর্বার নিবেদন করল, 'হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)! দোযখে নিয়ে যায় এমন কর্ম কোনটি?' মহানবী (সা.) বললেন, 'মিথ্যা! কোন ব্যক্তি যখন মিথ্যা বলে, সে তখন অবাধ্যতা করে আর এভাবে যখন কেউ অবাধ্যতা করে, তখন সে কুফরী করে, এরূপে যখন সে কুফরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, পরিণামে সে নরকে প্রবিষ্ট হয়'।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৬, বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:
"পবিত্র কুরআন শরীফ মিথ্যাকে নোংরামী ও অপবিত্র বলে আখ্যায়িত করেছে, যেমনটা কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে-

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

(সূরা আল হাজ্জ, ২২:৩১)

অর্থাৎ, 'প্রতিমা পূজা এবং মিথ্যাচার করা থেকে বিরত হও'।

লক্ষ্য কর! এখানে 'প্রতিমা'র সমান্তরালে মিথ্যাকে রাখা হয়েছে আর প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাও এক প্রকার প্রতিমা। নইলে সত্যকে পরিত্যাগ করে ভিন্ন পথে কেনই বা যাবে! যেমনটি প্রতিমা অসার হয়ে থাকে, তেমনিভাবে মিথ্যার মাঝে প্রহসন ছাড়া আর কিছুই থাকে না, মিথ্যাবাদীর প্রতি মানুষের আস্থা এতটাই হ্রাস পায় যে, যদি সে সত্যও বলে, তবুও আশঙ্কা হয়, তাতে কোন মিথ্যার সংমিশ্রণ তো নেই! মিথ্যাবাদীরা তাদের মিথ্যা বলার অভ্যাস হ্রাস করতে চাইলেও রাতারাতি তা পরিত্যাগ করতে পারে না। দীর্ঘকাল পর্যন্ত

সাধ্য-সাধনা ও প্রচেষ্টা চালানোর পর সত্য বলার অভ্যাস তাদের মাঝে গড়ে উঠবে।” (মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫০)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন:

“মানুষের স্বভাবজাত অবস্থাসমূহের মধ্যে একটি হলো সত্যবাদিতা, যা তার প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যতক্ষণ পর্যন্ত স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন বিষয় তাকে প্ররোচনা না যোগায়, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মিথ্যা বলতে চায় না এবং মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার প্রতি হৃদয়ে এক প্রকার ঘৃণা ও সংকোচ বোধ করে। এ কারণেই যে ব্যক্তির মিথ্যাচার স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, মানুষ তার প্রতি স্বভাবতই অসন্তুষ্ট হয় এবং তাকে হীন দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু স্বভাবজ এ অবস্থা নৈতিকতার পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হতে পারে না। কেননা, শিশু এবং পাগলও এই অবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। সুতরাং মূল কথা, যে পর্যন্ত মানুষ হীন বাসনা জলাঞ্জলি না দেয়, যা তার সত্যবাদিতার পথে বাদ সাধে, সে পর্যন্ত সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। কারণ মানুষ যদি কেবল এমন সব বিষয়ে সত্য কথা বলে, যাতে তার কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু মানসম্ভ্রম বিপন্ন হলে বা ধন-সম্পদ বা প্রাণের ক্ষতির আশংকা দেখা দিলে মিথ্যা বলে বসে এবং সত্য বলা থেকে বিরত থাকে, তবে সেক্ষেত্রে পাগল ও শিশু অপেক্ষা তার কীইবা শ্রেষ্ঠত্ব রইলো! পাগল ও নাবালক শিশু কি এই প্রকার সত্য বলে না? পৃথিবীতে সম্ভবত এমন কেউই নেই যে, কোন প্ররোচনা ছাড়া অকারণে মিথ্যা বলে। অতএব, যে সত্যবাদিতা কোন ক্ষতির আশঙ্কার মুখে জলাঞ্জলি দেয়া হয়, তা প্রকৃত নৈতিকতার অন্তর্ভুক্ত বলে কখনও গণ্য হতে পারে না। সত্যবাদিতা প্রমাণের এটাই সর্বাপেক্ষা কঠিন ও সঠিক সময় ও ক্ষেত্র, যখন নিজের প্রাণ, ধনসম্পদ বা সম্মান বিপন্ন হয়। এ সম্পর্কে খোদা তা’লা প্রদত্ত শিক্ষা হলো:

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ
وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ؕ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ؕ
وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ

كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا
وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ

অর্থাৎ, "প্রতিমা পূজা এবং মিথ্যাচার করা থেকে বিরত হও"। (২২:৩১) অর্থাৎ, মিথ্যাও এক প্রতিমা। এর প্রতি ভরসাকারী খোদার উপর নির্ভর করা ছেড়ে দেয়; সুতরাং মিথ্যা বলায় খোদাও হাত থেকে হারিয়ে যান। তিনি আরো বলেছেন, তোমরা সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহুত হলে, যেতে অস্বীকার করবে না (২:২৮৩) এবং সত্য সাক্ষ্য গোপন করবে না। যে সত্য গোপন করে তার হৃদয় পাপী (২:২৮৪)। যখন বল, তখন সে কথাই বলবে যা সত্য কথা এবং ন্যায়সম্মত (৬:১৫৩)। নিকট সম্পর্কের কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার ক্ষেত্রেও সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তোমাদের প্রত্যেক সাক্ষ্য খোদার জন্য হওয়া উচিত। মিথ্যা বলবে না, যদিও সত্য বলায় তোমাদের ক্ষতি হয় বা এর ফলে তোমাদের পিতামাতা কিংবা অন্য নিকট আত্মীয় যেমন পরিবার-পরিজন ক্ষতিগ্রস্থ হয় (৪:১৩৬)। কোন জাতির প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সত্য সাক্ষ্য প্রদান হতে বিরত রাখতে না পারে (৫:৯)। সত্যপরায়ণ পুরুষ ও নারী মহাপুরস্কার লাভ করবে। (৩৩:৩৬) তাদের অভ্যাস হলো তারা অন্যদেরও সত্যপরায়ণতার উপদেশ দেয় (১০৩:৪), এবং মিথ্যাবাদীদের আসরেও তারা বসে না" (২৫:৭৩)। [ইসলামী উসুল কী ফিলোসফী, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬০-৩৬১]

ব্যভিচার থেকে দূরে থাকো

এরপর বয়আতের দ্বিতীয় এই শর্তে ব্যভিচার থেকে দূরে থাকার অঙ্গীকারও রয়েছে। আর এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ۝٣٣

(সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৩৩)

অর্থাৎ, ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হয়ো না, নিশ্চয়ই এটা নির্লজ্জতা এবং অত্যন্ত জঘন্য পথ।

একটি হাদীস রয়েছে:

মুহাম্মদ বিন সিরীন (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলীর উপদেশ দান করেছেন; তিনি এক দীর্ঘ বিবৃতি তুলে ধরেছেন, যার মধ্য থেকে একটি উপদেশ হলো, ব্যভিচার ও মিথ্যাচারের তুলনায় পবিত্রতা বজায় রাখা অর্থাৎ, সতীত্ব রক্ষা করা ও সত্য ধারণ করা সর্বদাই উত্তম আর স্থায়ী।" (সুনানে দারকুতনী, কিতাবুল ওসায়া, বাব মা ইয়াসতা'হিব্বু বিল ওসীয়্যাতে মিনাত্ তাশাহ্হুদে ওয়াল কালামে)

ব্যভিচার ও মিথ্যা উভয়কে একসাথে বর্ণনা করা হয়েছে। যা থেকে এটা বোধগম্য যে, মিথ্যা কত বড় এক পাপ!

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"ব্যভিচারের ধারেকাছেও যাবে না। অর্থাৎ, এমন আচার অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকবে, যা মনে এসবের উদ্রেক ঘটাতে পারে। সেসব পথ ধরবে না যেখানে এ পাপ ঘটার আশঙ্কা থাকে। যে ব্যভিচার করে, পাপকে সে শেষ সীমায় পৌঁছায়। ব্যভিচারের পথ অত্যন্ত মন্দ ও ঘৃণ্য, অর্থাৎ (এটা) গন্তব্যে পৌঁছার পথে বাদ সাধে এবং আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্যের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। যে বিয়ে করার সামর্থ রাখে না, তার কর্তব্য সে তার নিজ পবিত্রতাকে অন্যান্য উপায়ে রক্ষা করবে। যেমন রোযা রাখবে, স্বল্প পরিমাণ আহার করবে, কঠোর দৈহিক পরিশ্রম করবে (২৪:৩৪)।" [ইসলামী উসুল কী ফিলোসফী, রুহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪২]

তিনি (আ.) বলেন, "এমন আচারঅনুষ্ঠান থেকে দূরে থাক, যা থেকে মনে কেবলই এসব কুচিন্তার উদ্রেক হওয়ার আশংকা দেখা দিতে পারে। যুবকদের অনেক সময় এ চেতনা লোপ পায়। সিনেমা দেখার বদঅভ্যাস জন্মায় আর এমন সব ছায়াছবি দেখে, যা দেখারই যোগ্য নয় বরং চারিত্রিক মানদণ্ডের নিরিখে অতি নিম্নস্তরের। এসব থেকেও দূরে থাকতে হবে। কেননা, এটা ব্যভিচারেরই এক প্রকারবিশেষ।"

কামলোলুপ দৃষ্টি থেকে দূরে থাকো

এরপর দ্বিতীয় শর্তে বর্ণিত তৃতীয় প্রকারের পাপ, যা থেকে দূরে থাকার শর্ত রয়েছে তা হলো– কামলোলুপ দৃষ্টি পরিহার সংক্রান্ত। এ অঙ্গীকার কী! এটা হলো **"গায্যে বসর"** (অর্থাৎ, অসঙ্গত ক্ষেত্র থেকে আত্মরক্ষার জন্য দৃষ্টি অবনত রাখা)।

একটি হাদীস রয়েছে:
আবু রায়হানা (রা.) বর্ণনা করেন, "এক যুদ্ধে রসূল করীম (সা.)-এর সাথে তিনিও ছিলেন। এক রাতে তিনি, রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে এটা বলতে শুনেছেন যে, 'ঐ চোখের জন্য আগুন হারাম, যা আল্লাহ তা'লার পথে জাগ্রত থাকে। আর ঐ চোখের জন্যও আগুন হারাম, যা আল্লাহ্ তা'লার ভয়ে অশ্রুপাত করে'।"

আবু শারীহ্ (রা.) বলেন:
আমি এক বর্ণনাকারীকে এটা বলতে শুনেছি যে, "মহানবী (সা.) এটাও বলেছেন, 'আগুন ঐ চোখের জন্য হারাম, আল্লাহ তা'লা কর্তৃক যা নিষিদ্ধরূপে নির্ধারিত, তা দর্শন করার পরিবর্তে নত হয়ে যায় আর সেই চোখের উপরও (আগুন) হারাম, যা মহামহিম আল্লাহ তা'লার পথে (অটল) থাকায় ছিদ্র করে দেয়া হয়েছে'।" (সুনানে দারেমী, কিতাবুল জিহাদ, বাব ফিল্লাযি ইয়াসহারু ফি সাবিলিল্লাহে হারিসান)

আরও একটি হাদীস:
উবাদা বিন সামেত (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ছয়টি বিষয়ে নিশ্চয়তা দাও, আমি তোমাদেরকে জান্নাতের শুভ সংবাদ দিচ্ছি'। তিনি (সা.) বললেন:

* তোমরা কথা বলার সময় সত্য বলবে।
* প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করবে।
* গচ্ছিত সম্পদ চাহিবা মাত্র প্রদান করবে (টাল-বাহানা করা চলবে না)।
* নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে।
* দৃষ্টি অবনত রাখবে।
* নিষ্ঠুরতা থেকে বিরত থাকবে।"

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৩, বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) বলেন, 'রাস্তায় বৈঠক বসানো থেকে বিরত থাক'; তারা (রা.) নিবেদন করলেন, 'হে রসূলুল্লাহ (সা.)! রাস্তায় বৈঠক করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন বিকল্প নেই'। এতে মহানবী (সা.) বললেন, 'তাহলে রাস্তার প্রাপ্য প্রদান করবে'। তারা (রা.) জানতে চাইলেন, 'তাহলে রাস্তার অধিকারগুলো কী কী'? তিনি (সা.) বললেন, 'পথচারীর সালামের জবাব দাও, দৃষ্টি আনত রাখ, পথ অন্বেষণকারীদের পথ দেখিয়ে দাও, ন্যায়সংগত কাজের নির্দেশ দাও, অপছন্দনীয় কাজে বারণ কর'।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬, বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন :

"পবিত্র কুরআন শরীফ, যা মানব প্রকৃতির দাবি ও দুর্বলতাসমূহের প্রতি দৃষ্টি রেখে যথোপযুক্ত শিক্ষাদান করে, তা খুবই সৌন্দর্যময় নীতিমালায় পূর্ণ।"

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۚ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۚ

(সূরা আন নূর, ২৪:৩১)

অর্থাৎ, তুমি মু'মিনদেরকে বলে দাও যে, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে আর নিজেদের ছিদ্রগুলোর সুরক্ষার ব্যবস্থা নেয়। এটা এমনই এক কর্ম, যা দ্বারা তাদের আত্মা পরিশুদ্ধ হবে। **'ফুরুজ'** বলতে কেবল লজ্জাস্থানই নয় বরং প্রতিটি রন্ধ্রপথ যার মধ্যে কর্ণ ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত এবং এখানে **'গায়ের মাহরাম'** নারীদের সঙ্গীত ইত্যাদি শ্রবণ করাকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। স্মরণ রেখো! হাজার হাজার গবেষণামুলক পরীক্ষা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে– যা কিছু থেকে আল্লাহ্ তা'লা বিরত থাকতে বলেছেন তা থেকে মানুষকে শেষ পর্যন্ত বিরত থাকতেই হয়।" (মলফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৫)

তিনি (আ.) এ প্রসঙ্গে আরো বলেন:

"ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য বিধিনিষেধ মেনে চলা সমভাবে বাধ্যতামূলক করেছে। যেভাবে নারীদের প্রতি পর্দা করার নির্দেশ রয়েছে তেমনিভাবে পুরুষদেরও দৃষ্টি অবনত রাখার তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ, হালাল-হারামের বিধিনিষেধ, আল্লাহ্র নির্দেশ পালনার্থে নিজেদের মাঝে বিদ্যমান বদঅভ্যাস ও কুপ্রথা বর্জন ইত্যাদি ইত্যাদি এমন সব বিধিনিষেধ রয়েছে, যে কারণে ইসলামের প্রবেশদ্বার অত্যন্ত সূক্ষ্ম-

সংকীর্ণ। আর এ কারণেই যে কোন ব্যক্তি এ দ্বারে সহসা প্রবেশ করতে পারে না।" (মলফুযাত, নব সংস্করণ, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬১৪)

এ আলোচনা থেকে পুরুষদের কাছে হয়ত বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সর্বদা তাদেরও দৃষ্টি অবনত রাখতে হবে। লাজলজ্জাবোধ কেবল নারীদের জন্যই নয়, পুরুষদেরও তা বজায় রাখতে হবে।

তিনি (আ.) আরো উল্লেখ করেছেন:
"খোদা তা'লা চারিত্রিক পবিত্রতা বা সতীত্ব রক্ষার জন্য নৈতিকতার উচ্চ শিক্ষাই শুধু দেন নি, বরং মানুষকে সতীত্ব বজায় রাখার জন্য পাঁচটি প্রতিকারও বলে দিয়েছেন- অর্থাৎ, 'না মাহরাম' (অর্থাৎ যাদেরকে শরিয়ত সম্মতভাবে বিয়ে করা যায়) দর্শন করা থেকে নিজের চোখকে বাঁচানো, 'না মাহরাম'-দের সুকন্ঠ শোনা থেকে কানকে বাঁচানো, 'না মাহরাম'-দের সম্পর্কে গল্পগাঁথা শ্রবণ না করা। আলোচিত কুকর্মের সূচনা হওয়ার আশংকা থাকে এমন যাবতীয় অনুষ্ঠান ও ক্ষেত্র হতে আত্মরক্ষা করে চলা। বিয়ে না হলে রোযা রাখা ইত্যাদি।"

তিনি (আ.) আরও উল্লেখ করেন: "এখানে আমরা জোর দাবির সাথে বলছি যে, এ সব চেষ্টাতদবীরের যাবতীয় পন্থাসম্বলিত মহান শিক্ষা, যা কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তা একমাত্র ইসলামেরই বিশেষত্ব। এস্থলে একটি গুঢ় কথা স্মরণ রাখার যোগ্য আর তা হলো এই যে, মানুষের স্বভাবজ অবস্থা যা কামপ্রবৃত্তির উৎস, তা হতে মানুষ পুরো পরিবর্তন আনয়ন ছাড়া মুক্ত হতে পারে না। কারণ, তার কামভাব ক্ষেত্র ও সুযোগ পেলে উদ্দীপ্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী বা বলতে পার তা মহাবিপদাপন্ন হয়ে পড়ে। সে জন্যই খোদা তা'লা আমাদের এ শিক্ষা দেন নি যে, 'না-মাহরাম' নারীদের প্রতি নির্বিচারে তাকাতে পারি, তাদের শোভা ও সৌন্দর্য দর্শন এবং তাদের নাচ, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি প্রত্যক্ষও করতে পারি, তবে তা করতে হবে পবিত্র দৃষ্টিতে! আর আমাদের তিনি এ শিক্ষাও দেন নি যে, আমরা এসব বেহায়াপনা নারীদের গানবাজনা ও তাদের সৌন্দর্যের গল্পগাঁথা শুনতে পারি, তবে তা শুনতে হবে পবিত্র মনমানসিকতা নিয়ে! বরং আমাদেরকে তাগিদ করা হয়েছে যে, আমরা যেন না-মাহরাম নারীদের এবং তাদের শোভা ও সৌন্দর্য প্রকাশক অঙ্গগুলিকে পবিত্র বা অপিবত্র কোন দৃষ্টিতেই না দেখি। পবিত্র বা অপিবত্র কোন মনমানসিকতা নিয়ে তাদের সুললিত কণ্ঠ ও তাদের সৌন্দর্যের গল্প যেন আদৌ না শুনি। বরং আমাদের কর্তব্য আমরা যেন

তা শোনা ও দেখাকে মৃত প্রাণীর গলিত দেহাবশেষের ন্যায় ঘৃণা করি, যাতে আমাদের পদস্খলন না ঘটে। কারণ অবাধ দৃষ্টি দেয়ার ফলে যেকোন সময় পদস্খলন ঘটে যেতে পারে। সুতরাং, খোদা তা'লা যেহেতু চান আমাদের চোখ, হৃদয় এবং আমাদের মন সবই যেন পবিত্র থাকে, তাই এই উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা তিনি দান করেছেন। এতে কোন সন্দেহ আছে কি যে, অবাধ মেলামেশায় পদস্খলন ঘটে? (বাছবিচার না থাকলে পদস্খলন তো ঘটবেই) ক্ষুধার্ত কোন কুকুরের সামনে নরম নরম রুটি ফেলে রেখে যদি আশা করি যে, কুকুরের মাঝে এ রুটি খাওয়ার কোন প্রবৃত্তি জাগবে না, তবে আমরা আমাদের এ ধারণায় ভ্রান্তিতে নিপতিত। সুতরাং খোদা তা'লা চেয়েছেন, কুপ্রবৃত্তি যেন গোপনে কিছু করার সুযোগ না পায় এবং এমন কোন লগ্ন বা উপলক্ষ যেন উপস্থিতই না হয়, যাতে কুৎসিত আকাঙ্খা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে।" [ইসলামী উসুলকি ফিলোসফি, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৩-৩৪৪)

প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকো

বয়আতের দ্বিতীয় শর্তে চতুর্থ যে পাপকর্মের উল্লেখ রয়েছে তা হলো, 'প্রত্যেক পাপাচার ও অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা' প্রসঙ্গে।

আল্লাহ তা'লা কুরআন করীমে বলেন:

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۭ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۙ

(সূরা আল হুজুরাত, ৪৯:৮)

অর্থাৎ, 'আর জেনে রাখো যে, তোমাদের মাঝে আল্লাহর রসূল বিদ্যমান সে যদি তোমাদের অধিকাংশ কথা মেনে নেয়, তবে তোমরা অবশ্যই দুঃখ কষ্টে জর্জরিত হবে কিন্তু আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য ঈমানকে প্রিয়তর করে তুলেছেন। আর তা তোমাদের হৃদয়ে সুসজ্জিত করে দিয়েছেন আর তোমাদের জন্য কুফর, মন্দকর্ম এবং অবাধ্যতার প্রতি তীব্র ঘৃণাও সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এরাই ওই সব লোক যারা সুপথপ্রাপ্ত।'

একটি হাদীস রয়েছে:

আসওয়াদ, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, "তিনি [আবু হুরায়রা

(রা.)] বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ রোযা রাখলে অশ্লীল কথাবার্তা যেন না বলে, অবাধ্যতা ও বিদ্রোহমূলক আচরণ যেন পরিহার করে আর অজ্ঞতার যুগের জ্ঞানান্ধ কথাবার্তাও যেন না বলে আর তার সাথে অপর কেউ অজ্ঞতাপূর্ণ ব্যবহার করলে সে যেন তাকে বলে দেয় যে– ক্ষমা করবেন, আমি একজন রোযাদার'।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৬, বৈরুতে মুদ্রিত)

মহানবী (সা.) বলেছেন, "মু'মিনকে গালিগালাজ করা অবাধ্যতার শামিল আর তার সাথে লড়াই করা কুফর বা অবিশ্বাসের নামান্তর।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৭, বৈরুতে মুদ্রিত)

আব্দুর রহমান বিন শিবল্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'ব্যবসায়ীরা পাপাচারী হয়ে থাকে'। বর্ণনাকারী বলেন, 'নিবেদন করা হলো, হে রাসূলুল্লাহ (সা.)! আল্লাহ্ তা'লা ব্যবসাবাণিজ্য কি বৈধ করেন নি'? রসূল (সা.) বললেন, 'কেন নয়? কিন্তু তারা যখন বেচাকেনা করে, তখন মিথ্যা কথা বলে আর কসম খেয়ে মূল্য বাড়ায়'।"

বর্ণনাকারী বলেনঃ
"রাসূল (সা.) আরও বলেন, 'অবাধ্যরা নরকবাসী'। নিবেদন করা হলো, 'হে রাসূলুল্লাহ (সা.)! অবাধ্য কারা?' এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'নারীরাও অবাধ্য হয়ে থাকে'। একজন ব্যক্তি নিবেদন করলো, 'হে রাসূলুল্লাহ (সা.)! ওরা কি আমাদের মাতা, ভগ্নি আর সহধর্মিণী নয়'? মহানবী (সা.) উত্তরে বললেন, 'কেন নয়? তবে তাদের কিছু দেয়া হলে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না আর তাদের উপর যখন কোন পরীক্ষা আপতিত হয়, তখন তারা ধৈর্যও ধারণ করে না'।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২৮, বৈরুতে মুদ্রিত)

তাই ব্যবসায়ীদের জন্য এটা ভাববার বিষয়! ব্যবসাবাণিজ্য খুবই পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন হওয়া উচিৎ। এটাও বয়আতের শর্তসমূহেরই অন্যতম শর্ত।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেনঃ
"কুরআন থেকে এটা সাব্যস্ত হয় যে, অস্বীকারকারীদের পূর্বে পাপাচারীদের শাস্তি দেয়া উচিৎ... এটা খোদা তা'লার নীতি যে, পুরো এক জাতি যখন অবাধ্য পাপাচারী হয়ে যায়, তখন তাদের উপর অন্য এক জাতিকে শাস্তিস্বরূপ চাপানো হয়।" (মলফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৫৩, নব সংস্করণ)

তিনি (আ.) আরও বলেন:

"এরা যখন অবাধ্যতায় ও কুকর্মে সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে আর খোদা তা'লার নির্দেশ সমূহের অবমাননা এবং আল্লাহ তা'লার সত্তার পরিচায়ক চিহ্নের প্রতি তাদের মাঝে ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যায় আর জাগতিক সৌন্দর্য্য ও চাকচিক্যের মোহে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, আল্লাহ তা'লাও তখন তাদেরকে এভাবেই– হালাকু খান, চেঙ্গিস খান ইত্যাদিদের দ্বারা ধ্বংস করিয়েছেন। লিখিত আছে, সে সময় আকাশ থেকে ধ্বনি আসতো– **'আই-ইউহাল কুফ্ফারু উক্তুলুল ফুজ্জার'** (হে অস্বীকারকারীগণ! এ পাপাচারী-দুরাচারীদের হত্যা কর) অর্থাৎ, পাপাচারী-অবাধ্যরা খোদার দৃষ্টিতে অস্বীকারকারীর চেয়েও হীন ও ঘৃণ্য।" (মলফুযাত ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৮, নব সংস্করণ)

তিনি (আ.) আরও বলেছেন:

"অবাধ্য-অত্যাচারীদের দোয়া গৃহীত হয় না, কেননা ওরা খোদা তা'লার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না আর খোদা তা'লাও তাদের ব্যাপারে উদাসীন। এক পুত্র পিতাকে যদি গ্রাহ্য না করে আর অর্বাচীন হয়ে থাকে, পিতারই যেখানে সেই পুত্রের প্রয়োজন থাকে না, তবে খোদার কেন থাকবে?" [তফসীর হযরত মসীহ মওউদ (আ.), ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬১১, নব সংস্করণ]

জুলুম বা অন্যায় করো না

দ্বিতীয় শর্তে আরও আছে, জুলুম করবে না। কুরআন করীমে বর্ণিত আছে:

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٦٦﴾

(সূরা আয্ যুখরুফ, ৪৩:৬৬)

অনুবাদ: তাদেরই বিভিন্ন দল মতভেদ করেছে। অতএব ঐ লোকদের জন্য রয়েছে এক কষ্টদায়ক দিনের আযাবের দূর্ভোগ, যারা জুলুম করেছে।

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেছেন, "মহানবী (সা.) বলেন, 'জুলুম ও নির্যাতন করা থেকে বিরত থাক। কেননা, কিয়ামত দিবসে তোমার কৃত জুলুম ও নির্যাতন ঘোর অন্ধকাররূপে তোমার সামনে ধেয়ে আসবে। তাই লোভলালসা, কৃপণতা ও বিদ্বেষভাবাপন্নতা থেকে দূরে থাক। কেননা, পূর্ববর্তীদের লোভলালসা, কৃপণতা ও বিদ্বেষপরায়ণতা তাদের ধ্বংস করেছে। রক্তপাতে উস্কিয়ে দিয়েছে আর সম্মানজনক জিনিসের সম্মানও পদদলিত করিয়েছে'।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৩)

অনুরূপভাবে অন্যের অধিকার হরণ করাও জুলুম বা অন্যায়। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বর্ণনা করেন যে, "আমি নিবেদন করি, 'হে রাসূলুল্লাহ (সা.)! কোন্ অন্যায় সবচেয়ে বড়?' উত্তরে মহানবী (সা.) বললেন, 'সব থেকে বড় জুলুম বা অন্যায় হলো– কোন ব্যক্তির নিজের ভাইয়ের প্রাপ্য জমির একহাত পরিমাণও জবরদখল করে নেয়া। এমনকি অন্যের প্রাপ্য জমির ছোট্ট এক পাথরখণ্ডও যদি সে অন্যায়ভাবে নিয়ে থাকে, তবে সেই পাথরের তলার ভূমির সকল স্তর বেড়ি হিসেবে কিয়ামত দিবসে তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। সেই ভূমির গভীরতায় কীসব রয়েছে সেই সত্তা ব্যতিরেকে কেউই জানে না, যিনি তা সৃষ্টি করেছেন'।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৬, বৈরুতে মুদ্রিত)

কতিপয় লোক রয়েছে যারা নিজেদের ভাইবোন বা প্রতিবেশীদের হক (প্রাপ্য অংশ) না দিয়ে বিবাদ করে তাদের সহায়সম্পদ অবৈধভাবে করায়ত্ত করে নেয়। জবর দখল করে তাদের জমি ছিনিয়ে নেয়; এমন লোকদের চিন্তাভাবনা করা উচিৎ। 'কারো অধিকার খর্ব করবো না বা কারো অধিকার হরণ করবো না, জুলুম করবো না,' শর্তে আমরা বয়আত করে আহমদী হয়েছি, কিন্তু তারপরও যদি এমনটা হয়– তবে এ অবস্থা সত্যই ভীতিপ্রদ।

এক হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) বলেছেন, 'জানো কি! কাঙাল কারা?' আমরা নিবেদন করলাম, 'যার না আছে টাকাকড়ি আর না আছে কোন সহায়সম্পদ।' মহানবী (সা.) বললেন, 'আমার উম্মতে কাঙাল সে– যে কিয়ামত দিবসে রোযা, যাকাত ইত্যাদি কর্ম নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু কাউকে গালি দিয়ে থাকবে, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ লাগিয়ে থাকবে, কারো টাকাকড়ি খেয়ে থাকবে আর অন্যায়ভাবে কারো রক্ত ঝরিয়ে থাকবে, কাউকে পিটিয়ে থাকবে। অতএব ঐ নিপীড়িতদেরকে তাদের পুণ্যসমুহ দিয়ে দেয়া হবে। এমনকি তাদের প্রাপ্য অধিকার পূরণ করতে করতে ওদের পুণ্য যদি নিঃশেষ হয়ে যায় তাদের কৃত পাপসমূহ ওর ঘাড়ে বর্তানো হবে। আর এভাবে জান্নাতের পরিবর্তে তাকে নরকে নিক্ষেপ করা হবে। এই ব্যক্তিই প্রকৃত 'কাঙাল'।" (মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলা, বাব তাহরীমুয্ যুল্মে)

এখন চিন্তা করুন, গভীরভাবে ভাবুন, আমাদের প্রত্যেকেরই গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা উচিৎ, যারাই এমন অপকর্মে জড়িয়ে পড়েছে, তাদের জন্য

এটি অত্যন্ত ভয়ের বিষয়। আল্লাহ করুন, আমাদের মধ্যে, কেউ যেন এমন কাঙাল অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার সমীপে কখনই উপস্থাপিত না হয়।

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"আমার সমগ্র জামা'ত, যারা এখানে উপস্থিত আছেন বা নিজ নিজ অঞ্চলে অবস্থান করছেন, তাদের এ উপদেশ মনোযোগ সহকারে শুনা উচিত। তারা, যারা এই জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমার সাথে ভালোবাসা ও শিষ্যত্বের সম্পর্ক রাখেন, তারা আচারআচরণে সদাচারী ও সদালাপী হবেন এবং তাকওয়ার উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছাতে সক্ষম হবেন আর কোন বিশৃঙ্খলা ও দুষ্কৃতি বা অসচ্চরিত্রের মন্দ আচরণ তাদের ধারে কাছেও ঘেঁষবে না– এটিই এর উদ্দেশ্য। তাদের রীতিমত পাঁচ বেলার নামায জামা'তের সাথে আদায়ে অভ্যস্ত হতে হবে, তারা যেন মিথ্যা না বলেন আর কথা দ্বারা কাউকে যেন কোন আঘাত না দেন। কোন ধরণের কুকর্মে তারা লিপ্ত হবেন না আর কোন দুষ্ট অভিসন্ধি, নির্যাতন-নিপীড়ন, ঝগড়াবিবাদের কল্পনাও হৃদয়ে ঠাঁই দেবেন না।

মোট কথা, সব ধরনের পাপ, অপরাধকর্ম, নিষিদ্ধ কথা ও কাজ এবং যাবতীয় প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও নিরর্থক কর্ম থেকে তারা বিরত থাকবেন এবং খোদা তা'লার (সন্তুষ্টিভাজন) পবিত্রহৃদয় নিরীহ বান্দায় পরিণত হবেন।

আর বিষাক্ত কোন উপাদানের রেশ মাত্র তাদের সত্ত্বায় যেন না থাকে এবং সমগ্র মানবজাতির প্রতি সহমর্মিতা যেন তাদের নীতি হয় আর খোদা তা'লাকে ভয় করে। নিজ কথা, হাত, অন্তর আর নিজের ধ্যান ধারণাকে প্রত্যেক প্রকার অপবিত্রতা ও নৈরাজ্যকর বিশ্বাসঘাতকতা থেকে যেন দূরে রাখে এবং পাঁচ বেলার নামায অত্যন্ত যত্নের সাথে প্রতিষ্ঠিত রাখে।

জুলুম নির্যাতন, আত্মসাৎ, ঘুষ লেনদেন ও অন্যের অধিকার হরণ এবং অন্যায় পক্ষপাত থেকে বিরত থাকে। (আর যদি পরে প্রমাণিত হয় যে একব্যক্তি যে তাদের মাঝে আনাগোনা রাখে সে খোদা তা'লার নির্দেশাবলীর মান্যকারী নয়.. বা মানুষের অধিকারের প্রতি আদৌ শ্রদ্ধাশীল নয় বরং সেই ব্যক্তি স্বভাবসিদ্ধ এক অত্যাচারী, বদমেজাজি ও দুরাচারী বা এমন ব্যক্তি, যাঁর সাথে তোমাদের বয়আতের ও ভালোবাসার সম্পর্ক, তার সম্পর্কে অন্যায় ও অযথা অপলাপ করে কটুবাক্য প্রয়োগ করে আর বড়বড় কথা বলে অপবাদ ও মিথ্যা আরোপের অভ্যাস জারী রেখে খোদা তা'লার বান্দাদের ধোঁকা দিতে চায়;

তবে তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক হবে, 'ঐ পাপকে তোমাদের মধ্য থেকে দূরীভূত করা আর এমন লোককে বর্জন করা– যে ভয়ঙ্কর মানুষ।

তোমাদের উচিৎ ধর্ম, জাতিবর্ণনির্বিশেষে কোন দলের লোকজনদেরই ক্ষতি সাধনের মনোবৃত্তি থেকে দূরে থাকা বরং তোমরা সত্যিকার অর্থে প্রত্যেকের মঙ্গলাকাঙ্খী হও। তবে তোমাদের অবশ্যই সাবধান হওয়া উচিত যাতে দুষ্কৃতকারী, পাপাচারী, নৈরাজ্যবাদী ও বাটপারদের আনাগোনা যেন তোমাদের বৈঠকে কোনভাবে না থাকে। আর তোমাদের বাড়িঘরেও যেন তাদের ঠাঁই না হয়। কেননা, ওরা যে কোন সময় তোমাদের স্খলন ডেকে আনতে পারে।

অনুরূপভাবে তিনি (আ.) আরও বলেন, "এ হলো ঐ সমস্ত নির্দেশ ও শর্তাবলী, যা আমি শুরু থেকে বলে আসছি। আমার জামা'তের প্রত্যেকের এসব নির্দেশ পালন করা বাধ্যতামূলক। তোমাদের মজলিস যেন অপবিত্র, অশালীন, ঠাট্টামশকরায় মজে না যায়, বরং পবিত্র অন্তঃকরণের অধিকারী সৎস্বভাব ও পুতঃ চিন্তাধারা নিয়ে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করো। আর স্মরণ রেখো! প্রত্যেক দুষ্কৃতি প্রতিরোধের যোগ্য হয় না। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্ষমা আর মার্জনার অভ্যাস গড়ো। ধৈর্য ও বিনম্র গাম্ভীর্যের সাথে কাজ নাও। কারও প্রতি অন্যায়ভাবে আক্রমণ করো না। অন্তরের প্রবল আবেগানুভূতি অবদমিত করে রাখো, কোন বিতর্ক উঠলে, ধর্মীয় কোন কথাবার্তা হলে কোমল ভাষায় আর শিষ্টতার গণ্ডির মাঝে থেকে কর। আবার অজ্ঞতাপ্রসূত কথাবার্তা হতে থাকলে সালাম দিয়ে সেই বৈঠক থেকে দ্রুত উঠে পড়। তোমাদের উত্যক্ত করা হলে আর গালিগালাজ করা হলে কিংবা তোমাদের সম্পর্কে মন্দ থেকে মন্দতর সব কথাবার্তা বলা হলে, সাবধান থেকো যে, অর্বাচীনতার উত্তর একই ভাষায় দেবে না, নইলে তোমরাও তদ্রুপই সাব্যস্ত হবে যেমনটা তারা। খোদা তা'লা তোমাদেরকে এমন এক ঐক্যবদ্ধ জামা'তে পরিণত করতে চান, যাতে সমগ্র বিশ্বের জন্য পুণ্য ও সততার অনুকরণীয় আদর্শ রূপে তোমরা পরিগণিত হও। অতএব, নিজেদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তিকে শীঘ্র বের করে দাও, যে পাপ, দুষ্কৃতি, নৈরাজ্য ও নোংরা মনমানসিকতার প্রতিভু। আমাদের জামা'তে যে ব্যক্তি বিনয়, পুণ্য, তাকওয়া, বিনম্র কোমল কথাবার্তা, পূতস্বভাব ও পাকপবিত্র চালচলনের সাথে দিনযাপন করতে পারে না, সে কালক্ষেপণ না করে আমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাক। কেননা, আমাদের খোদা চান না যে, এমন ব্যক্তি আমাদের সাথে থাকুক। নিশ্চয় সেই ব্যক্তি দুর্ভাগা হিসেবে মৃত্যুবরণ

করবে, কেননা সে সৎপথ অবলম্বন করে নি। সুতরাং তোমরা সাবধান হও! কার্যত পূতহৃদয় ও বিনয়াবনত এবং মুত্তাকী হয়ে যাও। তোমাদের পরিচিতি হবে, পাঁচ বেলার নামায আর উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যার মাঝে পাপের বীজ রয়ে যাবে সে এই সদুপদেশে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না"। [প্রচারপত্র, ২৯ মে ১৮৯৮, তবলীগে রেসালত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২, ৪৩]

খেয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা করো না

খেয়ানত সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেন:

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ﴿۱۰۸﴾

(সূরা আন নিসা, ৪:১০৮)

অর্থাৎ, সেই লোকদের পক্ষ নিয়ে তর্ক করো না যারা নিজ প্রাণের প্রতি অবিচার করে থাকে। নিশ্চয়, আল্লাহ্ তা'লা চরম বিশ্বাসঘাতক ও মহাপাপীদের পছন্দ করেন না।

এক হাদীসে আছে:
আবু হুরায়রাহ (রা.) বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনকিছু গচ্ছিত রেখেছে তার গচ্ছিত জিনিস তাকে ফেরত দাও, বরং তার সাথেও বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ করো না, যে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে'।" [আবু দাউদ, কিতাবুল বাই'উ, বাব ফির রাজুলে ইয়াখুযু হাক্বাহু...]

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:
"পাপ পরিহারের দ্বিতীয় প্রকার হলো সেই খুল্‌ক বা চারিত্রিক গুণ যাকে সততা ও বিশ্বস্ততা বলা হয়, অর্থাৎ অনিষ্ট সাধনের অসদুদ্দেশ্য নিয়ে অপরের সম্পদ করায়ত্ত করে তাকে দুঃখকষ্টে ফেলতে সম্মত না হওয়া। স্মরণ থাকে যে, 'সততা ও বিশ্বস্ততা' মানবের প্রকৃতিগত অবস্থা সমূহের একটি অবস্থা। এ কারণেই দুগ্ধপোষ্য এক শিশুও বয়সের স্বল্পতার কারণে ও নিজের স্বভাব-সিদ্ধ সরলতায় অভ্যস্ত থাকে; বয়স কম হওয়ার কারণে মন্দ অভ্যাসে সে অভ্যস্ত হয় না, অপরের জিনিসের প্রতি সে এত প্রকট ঘৃণা পোষণ করে যে, নিজ জীবন বিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও, অতি বিরলই সে কোন অপরিচিত মহিলার স্তন্যপান করে। [ইসলামী উসূল কী ফিলোসফী, রুহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৪]

নৈরাজ্য বর্জন করে চল

ঝগড়াবিবাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'লা বলেন:

وَابْتَغِ فِيمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۝٧٨

(সূরা কাসাস, ২৮:৭৮)

অর্থাৎ, আর যা কিছু আল্লাহ্ তোমাকে দান করেছেন, সে সবের মাধ্যমে পরলোকের নিবাস নিশ্চিত করার ইচ্ছা পোষণ কর আর নিজের বৈষয়িক অংশকেও অবজ্ঞা করো না। কৃপাপূর্ণ ব্যবহার কর, যেমন করেছেন আল্লাহ তোমার প্রতি আর পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে বেড়াবে না। আল্লাহ্ তা'লা নৈরাজ্যবাদীদের অবশ্যই পছন্দ করেন না।

হযরত মা'আয বিন জবল রাযিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: 'যুদ্ধ দু-রকমের, এক– সেই যুদ্ধ, যা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য ইমামের আজ্ঞানুবর্তীতায় করা হয়। এমন ব্যক্তি নিজের উপার্জিত সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে নিজের সফরসঙ্গীদের জন্য সহজসাধ্য অবস্থা সৃষ্টি করে দেয় ও ঝগড়াবিবাদ করা পরিহার করে। সুতরাং এমন ব্যক্তির শয়ন-জাগরণ পুরোটাই উত্তম পরিণামদায়ী হয়ে থাকে।

অপর ব্যক্তি সে, যে আত্মগরিমা প্রকাশের জন্য আর লোক দেখানোর মানসে এবং নিজের সাহসিকতার কাহিনী শুনানোর জন্য লড়াই করে, এমন ব্যক্তি ইমামের অবমাননা করে থাকে আর ভূপৃষ্ঠে নৈরাজ্য ছড়ায়। সুতরাং এমন ব্যক্তি জিহাদগত অবস্থানে পূর্বোক্ত ব্যক্তির সমকক্ষ নয়'।" (সুনানে আবি দাঊদ, কিতাবুল জিহাদ, বাব ফী মাই ইয়াগুযু ওয়া ইয়াল তামেস)

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গের বিষয়ে অবগত করবো না'? সাহাবীগণ (রা.) নিবেদন করলেন, 'হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কেন নয়! অবশ্যই বলুন'। এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, 'উত্তম তারা– সুন্দর কোন দৃশ্য দেখলে আল্লাহ্ তা'লার স্মরণে যারা বিভোর হয়ে পড়ে'। পুনরায় বললেন, 'আমি তোমাদেরকে সবচেয়ে ভয়াবহ দুষ্কৃতকারী সম্পর্কে অবহিত করবো কী?

সবচেয়ে ভয়াবহ দুষ্কৃতকারী সে– যে পরনিন্দা করে বেড়ায়, পরস্পর ভালোবাসা পোষণকারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে আর আনুগত্যশীল লোকদের ব্যাপারে তাদের মন্দ আকাঙ্ক্ষা জাগে যে, তারাও পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ুক'।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৫৯, বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) বলেনঃ

"যারা কেবল এই কারণে তোমাদের পরিত্যাগ করে ও তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে যায় যে, তোমরা খোদা তা'লা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছ, তোমাদের উচিত, এদের সাথে বিতণ্ডায় লিপ্ত না হওয়া বরং তাদের জন্য অলক্ষ্যে দোয়া করা, যাতে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও সেই অন্তর্দৃষ্টি ও তত্ত্বজ্ঞান দান করেন, যা তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা নিজেদের পবিত্র নমুনা আর উন্নততর চালচলন দ্বারা প্রমাণ করে দেখাও যে, তোমরা উত্তমপথ অবলম্বন করেছো।

স্মরণ রেখো! আমি তোমাদেরকে পুনঃপুন এই হেদায়াত করার উদ্দেশ্যে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি যে, তোমরা সর্বপ্রকার ঝগড়াবিবাদ ও দাঙ্গাহাঙ্গামার স্থান, পাত্র উভয়ই এড়িয়ে চল, গালিগালাজ শুনেও ধৈর্য ধারণ কর, মন্দের প্রত্যুত্তর দাও ভালো দিয়ে আর কেউ ঝগড়াবিবাদ বাধানোর জন্য উদ্যত হলে, তবে ভালো হয় তোমরা এমন জায়গা থেকে যদি সরে পড় এবং কোমলতার সাথে উত্তর দাও। ...আমি যখন একথা শুনি যে, অমুক ব্যক্তি এই জামা'তের সদস্য হয়েও কারও সাথে ঝগড়া করেছে, (তার) এই রীতি আমার আদৌ পছন্দনীয় নয় আর যেই জামা'ত, যা পৃথিবীতে এক আদর্শ স্থানীয় হবে খোদা তা'লাও চান না যে, তারা এমন মন্দ পন্থা অবলম্বন করবে, যা খোদাভীতির পথ নয়। বরং আমি তোমাদের এ কথাও জানিয়ে দিচ্ছি, আল্লাহ তা'লা এই নির্দেশনার এতটা জোর সমর্থন করেন যে, কোন ব্যক্তি এই জামা'তের সদস্য হয়েও ধৈর্য ও সহনশীলতার পন্থা অবলম্বন না করলে তার স্মরণ রাখা উচিত, সে এই জামা'তের অন্তর্ভুক্ত নয়। তার চরম উত্তেজনা ও রাগের কারণ, হতে পারে আমাকে বিশ্রী ভাষায় গালি দেয়া; এক্ষেত্রেও বিষয় খোদার সমীপে সোপর্দ করে দাও, এর মীমাংসা তোমরা করতে পারবে না। আমার বিষয় খোদা তা'লাই মীমাংসা করবেন। অতএব, সেই সব গালিগালাজ শুনেও তোমরা ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দাও"। [মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৭, নব সংস্করণ]

বিদ্রোহের পথ পরিহার কর

বয়আতের দ্বিতীয় শর্তে এই অঙ্গীকারও করা হয় যে, বিদ্রোহের পথ বর্জন করে চলবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন–

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ

(সূরা আল বাকারা, ২:১৯৪)

অর্থাৎ, যতক্ষণ বিদ্রোহ দূরীভূত না হয়, ধর্মের পথের প্রতিবন্ধকতা উঠে না যায় আর আল্লাহ্‌র ধর্মের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাদের সাথে যুদ্ধ কর।

পুনরায় বলেন–

قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ۗ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ۗ

(সূরা আল বাকারা, ২:২১৮)

অর্থাৎ, পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা পাপ, তবে খোদা তা'লার পথে বাধা দেয়া ও কুফর অবলম্বন করা এবং আল্লাহ তা'লার সৎ (নেক) বান্দাদের পবিত্র মসজিদ থেকে বহিষ্কার করা অত্যন্ত বড় পাপ। অধিকন্তু বিদ্রোহ ছড়িয়ে দেয়া অর্থাৎ, শান্তি বিঘ্নিত করা হত্যার চেয়েও জঘন্যতর। (জঙ্গে মুকাদ্দাস, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৫)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেনঃ

"যেহেতু আমি প্রত্যক্ষ করছি, আজকাল কতিপয় অজ্ঞ ও দুষ্ট লোক, যাদের অধিকাংশ হিন্দু আর স্বল্পসংখ্যক মুসলমানও রয়েছে; গভর্ণমেন্টের বিপক্ষে এমন সব কার্যকলাপ প্রকাশ করে, যা থেকে বিদ্রোহের গন্ধ পাওয়া যায়। বরং আমার আশঙ্কা, যেকোন সময়ে তাদের ভেতর বিদ্রোহ মাথাচাড়া দেবে। এজন্য আমি আমার জামা'তের সদস্যদের, যারা পাঞ্জাব ও হিন্দুস্তানের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করছে, সংখ্যা গণনাতে যারা কয়েক লাখে পৌঁছে গিয়েছে, তাদেরকে যথেষ্ট তাকিদপূর্ণ এ উপদেশ দিচ্ছি যে, আমার এ শিক্ষাকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখুন, যা প্রায় ২৬ বছর ধরে আমি বক্তৃতাবিবৃতি ও লেখার মাধ্যমে তাদের অন্তরে গ্রথিত করে আসছি আর তা হলো, (তারা যেন) এই

গভর্ণমেন্ট-এর পুরোপুরি আনুগত্য করে। কেননা, তারা আমাদের হিতসাধনকারী সরকার...। অতএব, স্মরণ রেখো! গভীরভাবে স্মরণ রেখো যে, এমন ব্যক্তি আমার জামা'তভুক্ত থাকতে পারে না, যে এই গভর্ণমেন্ট-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক কোন পরিকল্পনা মনে পোষণ করে।

আমার দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত গর্হিত কর্ম, যেই সরকারের ছত্রছায়ায় আমরা অত্যাচারীদের হিংস্র থাবা থেকে নিরাপদ থাকি আর যাদের ছায়ায় আমাদের জামা'ত উন্নতি করছে, তাদের এই বদান্যতায় আমরা কৃতজ্ঞ হবো না! আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বলেছেন:

هَلْ جَزَآءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦١﴾

(সূরা আর রাহমান, ৫৫:৬১)

অর্থাৎ, কৃপার বিনিময় কৃপাই হয়ে থাকে। আর হাদীস শরীফেও আছে– যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে না সে খোদার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। একথাটা ভেবে দেখো, এই সরকারের আওতার বাইরে যদি বের হও তবে তোমাদের গন্তব্যস্থল কোথায়? এমন এক শুভাকাঙ্খী রাজত্বের নাম তো বল, যারা নিজেদের আশ্রয়ের গণ্ডিতে তোমাদেরকে স্থান দেবে। প্রতিটি মুসলমান রাজত্ব তোমাদের হত্যা করার জন্য দাঁত কটমট করছে। কেননা, তাদের দৃষ্টিতে তোমরা কাফের (অস্বীকারকারী) ও মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) রূপে চিহ্নিত হয়ে আছ। অতএব, তোমরা খোদা তা'লা-প্রদত্ত এই নেয়া'মত (পুরস্কার) এর মূল্যায়ন কর। ...এখন এমন ধর্মবিশ্বাস ছড়ানো সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ও অযথা যে, কোন খুনী মাহদী (রক্তপিপাসু মাহদী) আগমন করবেন আর খ্রিষ্টান বাদশাহদের আটক করবেন।

এ কারণে আমাদের বিরোধী মুসলমানদের হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন ও পাষাণ হয়ে পড়েছে। ধর্মবিশ্বাস যাদের এমন, তারা ভয়ঙ্কর লোক! কোন যুগে অজ্ঞদের জন্য এমন ধর্মবিশ্বাস বিদ্রোহের কার্যকারণে পরিণত হতে পারে– বরং তা হবেই। অতএব, আমাদের প্রচেষ্টা হলো মুসলমানরা এমন ধর্মবিশ্বাসের কবল থেকে রেহাই পাক। সতর্ক থেকো! সেই ধর্ম, খোদার পক্ষ থেকে হতে পারে না যাতে মানুষের প্রতি সহমর্মিতা নেই। আমাদের খোদা-ই এটা শিখিয়েছেন যে, পৃথিবীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করো যাতে আকাশ থেকে তোমাদের প্রতি দয়া করা যায়। (মজমু'আ ইশতাহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৮২ থেকে ৫৮৫)

প্রবৃত্তির উত্তেজনার কবল থেকে বাঁচো

বয়আতের দ্বিতীয় শর্তে এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, রিপুর তাড়নার মুখে এর বশীভূত হবে না। হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

আধ্যাত্মিক সত্তার চতুর্থ স্তর সেইটি, যা খোদা তা'লা এই আয়াতে করীমায় উল্লেখ করেছেন:

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ

(সূরা আল মু'মিনূন, ২৩:৬)

অর্থাৎ, তৃতীয় স্তর থেকে উন্নত মু'মিন সে, যে নিজেকে প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও অবৈধ লালসা থেকে রক্ষা করে চলে। এই স্তর তৃতীয় স্তরের চেয়ে উন্নততর কেননা, তৃতীয় স্তরের মু'মিন তো কেবল ধনসম্পদ, যা তার কাছে অতি প্রিয় ও পছন্দনীয় খোদা তা'লার পথে সে তা বিলিয়ে দেয়, কিন্তু চতুর্থ স্তরের মু'মিন সেই জিনিসও খোদা তা'লার পথে বিলিয়ে দেয়, যা জাগতিক সম্পদের চেয়েও বেশি পছন্দনীয়-লোভনীয় ও প্রিয়তর অর্থাৎ, যৌন কামনাবাসনা। কেননা, মানুষ স্বীয় কামলালসার মোহে এত আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যে, তা চরিতার্থ করার জন্য নিজের প্রিয় সম্পদ পানির মত উড়িয়ে দেয়। আর সেই কামলালসা মেটাতে গিয়ে সহস্র সহস্র টাকা এমনভাবে নষ্ট করে যে, টাকাপয়সার কানাকড়ি কোন মূল্য আছে বলে সে মনেই করে না। যেমন দেখা যায়, এমন নোংরা স্বভাবের অধিকারী কৃপণ এক ব্যক্তি সাহায্য-মুখাপেক্ষী ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন কোন ব্যক্তিকে নিজের অত্যধিক কৃপণতার কারণে এক কানাকড়িও দিতে পারে না, কিন্তু কাম-উদ্দীপ্ত লালসার মধ্যে পড়ে, দেহব্যবসায়ী পতিতা নারীকে হাজার হাজার টাকা দিয়ে নিজের ঘর ধ্বংস করে দেয়।

অতএব জানা গেল যে, কামলালসার বন্যা এত প্রবল যে, কার্পণ্যের মত বদঅভ্যাসকেও করাল গ্রাসে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাই এটি পরিষ্কার কথা যে, এই ঈমানী শক্তির মোকাবেলায়, যার কারণে কৃপণতা দূর হয়, মানুষ তার প্রিয় ধনসম্পদ খোদার পথে ব্যয় করে, সেই ঈমানী শক্তি, যার কল্যাণে মানুষ কামলালসার ঝড় থেকে রেহাই পায়, তা অত্যন্ত সুদৃঢ় আর 'শয়তানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খুবই কার্যকর ও দীর্ঘস্থায়ী'। কেননা, এর কাজ হলো 'নাফসে আম্মারা' বা অবাধ্য প্রবৃত্তিরূপী পুরোনো অজগরকে– পদতলে পিষ্ট করে

ফেলা। কৃপণতা তো আত্মপ্রচারণা, লোক দেখানো এবং কামলালসা চরিতার্থ করার দুর্বার আকর্ষণের মুহূর্তেও ছাড়া যায়, কিন্তু এই তুফান, যা কামপ্রাবল্যে সৃষ্টি হয়, তা খুবই বিপজ্জনক-ভয়ঙ্কর ও দীর্ঘস্থায়ী এক ঝড় বিশেষ, মহান খোদার দয়া ছাড়া কোন ভাবেই তা দূর হতে পারে না। মানবদেহের দৈহিক কাঠামোতে অস্থি যেভাবে মজবুত ও টেকসই আর দীর্ঘস্থায়ী, অনুরূপভাবে এই তুফান দূরীভূতকারী ঈমানী শক্তিও খুবই দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়া চাই যাতে এমন শত্রুকে দীর্ঘকাল মোকাবেলা করে পরাভূত করতে পারে, অবশ্য তা-ও আবার নির্ভর করে, খোদা তা'লারই দয়ার ওপর। কেননা, কামলালসার তুফান এত ভয়ানক ও বিপজ্জনক ঝঞ্ঝা যে, খোদার বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া তা নির্বাপিত হতে পারে না। এজন্যই হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বলতে হয়েছে–

وَمَآ اُبَرِّئُ نَفۡسِیۡ ۚ اِنَّ النَّفۡسَ لَاَمَّارَۃٌۢ بِالسُّوۡٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّیۡ ؕ

(সূরা ইউসুফ, ১২:৫৪)

অর্থাৎ, আমি নিজ প্রবৃত্তিকে নির্দোষ মনে করি না। প্রবৃত্তি খুবই হীনস্তরের মন্দ সাধনের নির্দেশ দিয়ে থাকে আর এর আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব। যদি খোদা তা'লা স্বয়ং দয়া না করেন। এই আয়াতে **ইল্লা মা রাহিমা রাব্বি**-তে তেমনটাই বলা হয়েছে। নূহ (আ.)-এর প্লাবনের উল্লেখস্থলেও এরূপ বাক্য রয়েছে। কেননা, সেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

لَا عَاصِمَ الۡیَوۡمَ مِنۡ اَمۡرِ اللّٰہِ اِلَّا مَنۡ رَّحِمَ ۚ

(সূরা হুদ, ১১:৪৪)

অতএব, এখানে এটি এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যে, কামলালসার এই প্লাবন স্বীয় ভয়াবহতার ক্ষেত্রে নূহের তুফানের সাথে সাদৃশ্য রাখে। [বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, ২১তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৫-২০৬]

এক কথায় বলা হয়েছে যে, কামলালসা সর্বদা তোমাদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালাবে। তবে তোমরা সর্বদা আত্মরক্ষা করে চল, আল্লাহ্ তা'লার সমীপে দয়া ভিক্ষা করে এথেকে বাঁচ। আজকের এ যুগে পূর্বের তুলনায় এর বহুবিধ রাস্তা খুলে গিয়েছে। এজন্য আল্লাহ্র কাছে কাকুতিমিনতি আর তাঁর দয়া যাচনা করবার আবশ্যকতা পূর্বের চেয়ে অধিক রয়েছে।

أَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ۗ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَاۤ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِىْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ۝٤

(সূরা আল-যুমার, ৩৯:৪)

অর্থাৎ, সাবধান! একান্তভাবে নিবেদিত ধর্মই আল্লাহ্ তা'লার মহিমাসম্মত আর ওই সব লোক, যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের বন্ধু গ্রহণ করেছে (বলে থাকে যে) আমরা এতদুদ্দেশ্য ছাড়া এর উপাসনা করি না যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে নৈকট্যের উচ্চ মার্গ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে। অবশ্যই আল্লাহ্ তাদের মাঝে মীমাংসা করবেন, যাতে তারা মতভেদ করতো। আল্লাহ্ নিশ্চয় তাকে হেদায়াত দেন না, যে মিথ্যুক ও চরম অকৃতজ্ঞ।

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) বলেনঃ
"সেই খোদাকেই মান্য কর যার সত্তার প্রতি তওরাত, ইঞ্জিল এবং কুরআন তিনটিই অভিন্ন মত রাখে। কোন এমন খোদা নিজেদের পক্ষ থেকে বানিয়ে প্রস্তাব করো না, যার সত্তা এই তিন ধর্মগ্রন্থের সম্মিলিত সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয় না। সেই কথা মেনে নাও, যার পক্ষে বিবেকবুদ্ধি ও যুক্তির সাক্ষ্য বিদ্যমান আর ঐশী গ্রন্থাবলি যার ওপর ঐকমত্য রাখে। খোদাকে এমনভাবে মেনো না যার ফলে ঐশী গ্রন্থাবলিতে বিপত্তি দেখা দিতে পারে। ব্যভিচার করো না, মিথ্যা বলো না, কুদৃষ্টি দিও না আর প্রত্যেক অনাচার-কদাচার নৈরাজ্য ও বিদ্রোহের পথ এড়িয়ে চল। প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশীভূত হয়ে যেও না আর পাঁচ বেলার নামায আদায় কর। কেননা, মানবীয় প্রকৃতিতে পাঁচভাবে বিপ্লব আসে। তোমাদের আপন, নবী করীম (সা.)-এর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তাঁর প্রতি দরূদ প্রেরণ করো। কেননা, অন্ধকার যুগের পর তিনিই নবভাবে খোদাকে শনাক্ত করার পথ দেখিয়েছেন ও শিখিয়েছেন।"

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আরও বলেনঃ
"এ হলো আমার জামা'তের নীতি, যা এই জামা'তের স্বতন্ত্র পরিচয়চিহ্নের ন্যায়। মানবদরদ, মানবসন্তানকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা আর সরকারের বিরুদ্ধাচরণ পরিহারের যে ভিত্তি এই জামা'ত রচনা করে অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে এর অস্তিত্বই নেই। যাদের নীতি নিজেদের অগণিত ভুলভ্রান্তির কারণে ভিন্ন, যার বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন নেই আর এখানে সেই সুযোগও নেই।"
(যামীমা তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, ১৫তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২৪-৫২৬)

বয়আতের তৃতীয় শর্ত

খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী বিনা ব্যতিক্রমে নিয়মিত পাঁচ বেলার নামায পড়বে। আর যথাসাধ্য তাহাজ্জুদ নামায পড়ার ও প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের এবং প্রত্যহ নিজ পাপসমূহের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা ও ইস্তেগফার করার স্থায়ী অভ্যাস করবে। আন্তরিক ভালোবাসার সাথে খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজি স্মরণ রেখে তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করাকে দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করবে।

পাঁচ বেলার নামায সযত্নে আদায় কর

বয়আতের এই শর্তে যেসব কথা বর্ণনা করা হয়েছে তাতে প্রথম কথা হলো আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ বেলার নামায বিনা ব্যতিক্রমে রীতিমত আদায় করতে হবে। "নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় কর"– আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর এ নির্দেশ নারীপুরুষ উভয়েরই জন্য; সেই সব ছেলেমেয়েদের জন্যও যাদের বয়স দশ বছরে উপনীত হয়েছে। পুরুষদের জন্য এ নির্দেশ হলো জামা'তের (বা-জামা'ত) সাথে নামায আদায়ে যত্নবান হও। মসজিদে যাও আর তা আবাদ কর, এর আশিস অন্বেষণ করো। পাঁচ বেলার নামাযের ব্যাপারে কোন ছাড় নেই। তবে ভ্রমণকালে কিছুটা ছাড় রয়েছে আর রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও ছাড় আছে, সে ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, 'জমা' করে নাও– 'কসর' পড়ো। রোগাক্রান্ত অবস্থায় মসজিদে না যাওয়ার যে ছাড়টি রয়েছে তা থেকে ধারণা হয়ে যাওয়া উচিত যে, বা-জামা'ত নামায আদায় করার তাৎপর্য কতটা গভীর ও ব্যাপক। এর গুরুত্বের বিষয়ে আমি এখন বিস্তারিত কিছু উদ্ধৃতি পাঠ করছি, তবে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, প্রত্যেক বয়আতকারীর আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত, 'আমি নিজ সত্তাকে রক্ষা করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি বটে, তবে আমি কী সেভাবে

কুরআনের এই স্পষ্ট নির্দেশ মেনে চলছি!' প্রত্যেক আহমদী নিজ অবস্থান নিজেই খতিয়ে দেখার জন্য দায়ী। আত্মজিজ্ঞাসা করুন, নিজেই নিজেকে অভিনিবেশ সহকারে দেখুন। যদি আমরা নিজেরাই নিজ সত্তাকে, নিজ অন্তরাত্মাকে বিশ্লেষণ করা আরম্ভ করি, তাহলে এক মহা বিপ্লব সাধিত হতে পারে।

কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন:

وَاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيۡعُوا الرَّسُوۡلَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ ﴿۵۷﴾

(সূরা আন নূর, ২৪:৫৭)

অর্থাৎ, আর নামায প্রতিষ্ঠিত করো ও যাকাত আদায় করো এবং রসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা যায়।

আবার সূরা ত্বাহা-এর ২০:১৫ আয়াতে রয়েছে–

اِنَّنِيۡۤ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدۡنِيۡ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكۡرِيۡ ﴿۱۵﴾

অর্থাৎ, অবশ্যই আমি আল্লাহ্, আমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। তাই আমারই ইবাদত করো, আমাকে স্মরণ করার জন্য নামায প্রতিষ্ঠা কর।

এভাবে, কুরআন মজীদে নামায সম্পর্কে অসংখ্যবার নির্দেশাবলী এসেছে। এ প্রসঙ্গে আমি একটি হাদীস উপস্থাপন করছি। এতে হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেছেন, "আমি মহানবী (সা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, 'নামায পরিত্যাগ করা, মানুষকে শির্ক (অংশীবাদিতা) ও কুফর (অস্বীকার)-এর নিকটবর্তী করে দেয়'।" (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব বায়ানু ইতলাক্ব ইসমিল কুফরি আ'লা মান তারাকাস্ সালাত)

মহানবী (সা.) বলেন, "নামাযে আমার নয়ন জুড়ায়।"

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) বলেছেন, 'কিয়ামত' দিবসে সর্বপ্রথম যে জিনিসের হিসাব বান্দার কাছ থেকে নেয়া হবে তা হলো নামায। এ হিসাব সঠিক থাকলে সে পরিত্রাণ পেয়ে গেলো। আর এ হিসাব সঠিক না হলে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তার ফরয বা অবশ্য করণীয় বিষয়ে কোন ঘাটতি থেকে গেলে আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, 'খুঁজে দেখো! আমার বান্দার কিছু নফল ইবাদতও রয়েছে'। নফল থেকে থাকলে, ফরযের ঘাটতি

সেই নফল দ্বারা পুর্ণ করা হবে। একই ভাবে তার অন্যান্য আ'মল সমূহেরও পর্যালোচনা করা হবে এবং হিসাবনিকাশ নিরূপিত হবে।" (তিরমিযী, কিতাবুস্ সালাত, বাব ইন্না আওয়ালা মা ইউহাসিবু বিহিল আ'বিদ)

হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছেঃ
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, "আমি মহানবী (সা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, 'তোমরা কী ভাবতে পারো যে, কারো দোরগোড়ায় নদী বয়ে চলে আর তাতে সে দিনে পাঁচ বার গোসল করে নিলে, তবুও তার দেহে কি ময়লা থেকে যাবে?' সাহাবাগণ (রা.) নিবেদন করলেন, 'হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)! কোন ময়লাই থাকবে না'। তিনি (সা.) বললেন, 'পাঁচ বেলার নামাযের উপমাও এমনই। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা পাপ মার্জনা করে থাকেন এবং দুর্বলতাসমূহ দূর করে দেন'।" (সহীহ্ বুখারী, কিতাব মাওয়াক্বিয়াতুস সালাত, বাব আস সালাতুল খামসে কাফফারাতু লিল্ খাত্বায়ে)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেনঃ
"নামায পড়! নামায (অবশ্যই) পড়, কারণ এটা হলো সামগ্রিক কল্যাণ ও সৌভাগ্যের চাবিকাঠি।" (ইযালায়ে আওহাম, পৃষ্ঠা ৮২৯, প্রথম সংস্করণ)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরও বলেনঃ
"দোয়াই হলো নামাযের নির্যাস ও প্রাণ।" (আইয়্যামুস্ সুলেহ, রূহানী খাযায়েন, ১৪তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪১)

তিনি (আ.) আরও বলেনঃ
"ওহে লোকসকল! যারা নিজেদেরকে আমার জামা'তভুক্ত বলে গণ্য করে থাকো, আবারো বলছি তোমরা কেবল তখনই আমার জামা'তভুক্ত বলে পরিগণিত হবে যখন তোমরা সত্যিকারভাবে তাক্ওয়ার (খোদাভীতির) পথে অগ্রসর হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের দৈনিক পাঁচ বেলার নামায এরূপ ভীতির সাথে এবং নিবিষ্টচিত্তে আদায় করবে যে, তোমরা যেন আল্লাহ্ তা'লাকে সামনেই দেখতে পাচ্ছো। নিজেদের রোযাও তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিষ্ঠার সাথে পালন করবে। যাকাত আদায়ের সামর্থ যারা রাখে, তারা যাকাত দিবে। যার ওপর হজ্জ অবশ্যিক হয়ে গেছে আর তা পালনে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকলে সে হজ্জ করবে– সমুদয় পুণ্যকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করবে এবং পাপকর্ম ঘৃণার সাথে বর্জন করবে। নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো! তাক্ওয়াশূণ্য কোন কর্ম আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। প্রত্যেক পুণ্য কর্মের

মূল তাক্ওয়া। যেই কর্মে এ মূল অটুট থাকে, সেই কর্ম কখনও ধ্বংস হবে না"। (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫)

তিনি (আ.) আরও উল্লেখ করেছেন:

"নামায কী? এটা হলো দোয়া, যা **তস্বীহ্** (মহিমাগীত), **তাহমীদ** (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন), **তাক্বদিস** (পবিত্রতা ঘোষণা) এবং **ইস্তেগফার** (নিজ দুর্বলতা স্বীকার করে শক্তি প্রার্থনা) ও **দরূদ** (হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি আশিস কামনা করা)-সহ সবিনয় ও সকাতরে নিবেদন করা হয়। অতএব, যখন তোমরা নামায আদায় কর, তখন দোয়া-তে অজ্ঞ লোকদের ন্যায় কেবলমাত্র আরবী শব্দ ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। কারণ তাদের নামায এবং ইস্তেগফার সবই বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপমাত্র, যাতে কোন সারবস্তু নেই। কিন্তু তোমরা যখন নামায পড়, তখন খোদা তা'লার বাণী কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণীতে বর্ণিত কতিপয় প্রচলিত-পরিচিত দোয়া ছাড়াও নিজেদের অন্যান্য যাবতীয় সাধারণ দোয়া নিজ ভাষাতেই কর, এমনভাবে নিবেদন জানাও যাতে সকাতর সেই যাচনার সুপ্রভাব তোমাদের হৃদয়ে পতিত হয়।" (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯)

অন্যত্র তিনি (আ.) আরও বলেন:

"নামায এমন ইবাদত যে, এর কল্যাণে আকাশ মানবের নাগালের মাঝে এসে যায়। সত্যিকার অর্থে 'নামায' আদায়কারী এমনটাই ভাবে যে, 'আমি মৃত' আর তার আত্মা বিগলিত হয়ে খোদার আস্তানায় সেজদাবনত... যে গৃহে এমন নামায আদায় করা হবে, সে গৃহ কখনও ধ্বংস হবে না। হাদীস শরীফে রয়েছে, নূহ (আ.)-এর যুগে 'নামায' থাকলে সেই জাতি কখনও ধ্বংস হতো না। 'হজ্জ' পালন করা মানুষের জন্য শর্তসাপেক্ষ, 'রোযা'ও শর্তসাপেক্ষ আবার 'যাকাত'ও তাই, কিন্তু নামায সর্বাবস্থায় পালনীয়। অন্যান্য সব ইবাদত বছরে একবার করে নির্ধারিত, তবে এর (নামাযের) ক্ষেত্রে প্রতিদিন পাঁচবার করে আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এজন্য যতক্ষণ পুরোপুরিভাবে নামায প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততক্ষণ সেই কল্যাণও লাভ হতে পারে না, যা এ থেকে অর্জিত হতে পারে আর না বয়আতের কোন কল্যাণ লাভ হতে পারে।" (মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠ ৬২৭, নব সংস্করণ)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

"নামায প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যিক (ইবাদত)। হাদীস শরীফে

এসেছে, মহানবী (সা.)-এর কাছে ইসলাম গ্রহণকারী কতিপয় লোক এলো ও নিবেদন করলো, 'হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)! আমাদেরকে নামায আদায়ের বাধ্যবাধকতা থেকে রেহাই দেয়া হোক, কারণ আমরা ব্যবসায়ী মানুষ, 'পশুর পাল' কেনাবেচা করে থাকি। গবাদিপশু ইত্যাদির বর্জ্যের জন্য আমাদের পোশাকপরিচ্ছদ পবিত্র থাকছে কি-না তার ভরসা রাখা যাচ্ছে না, তার ওপর আমাদের আবার সময়সুযোগও হয়ে ওঠে না'। তিনি (সা.), এর প্রত্যুত্তরে তাদের বললেন, 'দেখো! নামায-ই যদি না থাকে তবে রইলোটা কী? 'নামায' না থাকলে সেটা ধর্মই নয়'।

নামায কী? নিজের অক্ষমতা, বিনয় ও দুর্বলতাসমূহকে খোদা তা'লার সমীপে নিবেদন করা আর নিজের অভাব মোচনে যাচনা করা। কখনও তাঁর বিশালত্ব ও তাঁর নির্দেশ প্রতিপালনার্থে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে যাওয়া, আবার কখনওবা নিজেকে একান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করে বিনম্রবিলাজে তাঁর সমীপে সেজদাবনত হওয়া, যাবতীয় চাওয়াপাওয়া তাঁরই সমীপে নিবেদন করা, এই-ই হলো নামায। এক ভিক্ষুকের ন্যায় নামাযে সেই দাতার বিশাল করুণা ও অপার মহিমার এমন প্রশংসাগান গাওয়া যে– এতো এতো মহিমান্বিত 'তুমি'। তাঁর মাহাত্ম ও প্রতাপের ঘোষণা দিয়ে তাঁরই দয়ার সাগরে উত্তাল জোয়ার আনার চেষ্টা করা আর তার কাছে যাচনা করা। অতএব, যে ধর্মে এটা (এমন নিবেদিত ইবাদত) নেই, তা আবার কেমন ধর্ম!

মানুষ চিরঅভাবী। তাঁর কাছে অব্যাহতভাবে তাঁর সন্তুষ্টির পথ যাচনা করে যাওয়া উচিত, তাঁর কৃপা ভিক্ষা চাওয়া উচিত। কেননা, তাঁর প্রদত্ত তৌফীকেই কোন কিছু করা সম্ভব। হে খোদা, আমাদের তৌফীক দাও যেন আমরা তোমার হয়ে যেতে পারি আর তোমার সন্তুষ্টির পথ দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারি। খোদাপ্রেম, খোদাভীতি আর হৃদয় তাঁর স্মরণে নিয়োজিত থাকার নামই হলো নামায– আর এটিই ধর্ম।

সুতরাং, যে ব্যক্তি নামায থেকেই অব্যাহতি পেতে চায়, চতুস্পদ জন্তুর চেয়ে সে বেশি আর কী করেছে? একই পানাহার করা আর পশুর মত ঘুমিয়ে থাকা –এটা কোনভাবে ধর্ম নয়। এতো কাফিরদের (অস্বীকারকারী) বৈশিষ্ট্য। 'উদাসীনতার মুহূর্তে মানুষ কাফের হয়ে যায়'– কথাটিই সত্য ও সঠিক।"
[তফসীর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬১১-৬১২, রাবওয়ায় মুদ্রিত, নব সংস্করণ]

নামায কীভাবে উপভোগ্য হয়ে ওঠতে পারে– এ প্রসঙ্গে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

“হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে দেখছো যে আমি কেমন অন্ধ ও দৃষ্টিহীন আর আমি এখন পুরোপুরি মৃতাবস্থায়। আমি জানি যে স্বল্পকাল পরই আমার ডাক আসবে আর আমি তোমার সকাশে এসে যাবো। তখন কেউ আমাকে আটকিয়ে রাখতে পারবে না। কিন্তু আমার অন্তরাত্মা অজ্ঞতার অন্ধকারে ছেয়ে আছে। তুমি এমন জ্যোতির্ময় স্ফুলিঙ্গের অবতরণ ঘটাও যেন তাতে তোমার অনুরাগ ও ভালোবাসার উন্মেষ ঘটে। তুমি আমার ওপর এমন কৃপা বর্ষণ করো যেন আমি দৃষ্টিহীন অবস্থায় উত্থিত না হই আর অন্ধদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না পড়ি!

যদি এ ধরনের দোয়া যাচনায় লেগে থাকে আর তা স্থায়ীভাবে করে তা হলে তার জীবনে এমন এক মুহূর্তের আগমনের অভিজ্ঞতা হবে, যখন স্বাদ ও রসকষহীন ওই নামাযে আকাশ থেকে এমন একটা কিছুর অবতরণ ঘটবে যা বিগলন সৃষ্টি করে দেবে।” (মলফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬১৬, নব সংস্করণ)

তাহাজ্জুদ নামায নিয়মিত পড়

বয়আতের তৃতীয় শর্তে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা’লা বলেন,

وَمِنَ الَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ‌ۖ عَسٰۤى اَنۡ يَّبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحۡمُوۡدًا ۝٨٠

(সূরা বনী ইসরাইল, ১৭:৮০)

আর নিশুতিকালের এক অংশেও এর (কুরআন পাঠের) মাধ্যমে তাহাজ্জুদ (নামায) পড়। এটা তোমাদের জন্য হবে নফল বিশেষ। অচিরেই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদেরকে ‘মাক্বামে মাহমুদ’-এ অধিষ্ঠিত করবেন।

হযরত বেলাল (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, “মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘তাহাজ্জুদ নামায তোমাদের নিয়মিতভাবে পড়া উচিত। কেননা, এটা অতীতের সৎকর্মশীলদের রীতি ছিল আর এটি স্রষ্টার নৈকট্য লাভের মাধ্যম। এই অভ্যাস পাপকর্ম থেকে বিরত রাখে, মন্দকর্ম দূর করে আর শারীরিক রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা করে’।” [তিরমিযী, আবওয়াবুদ্ দাওয়াত]

অপর একটি হাদীস রয়েছে:
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'রাতের শেষ প্রহর এলে আল্লাহ্ তা'লা নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন আর বলেন, আছে কি কেউ– যে আমার কাছে দোয়া (যাচনা) করবে আর আমি তার দোয়া কবুল করব? কেউ কি আছে– যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর আমি তাকে মার্জনা করব? কেউ কি আছে– যে আমার কাছে জীবিকার জন্য দোয়া করবে আর আমি তাকে দান করব? কেউ কি আছে– যে তার নিজের দুঃখক্লেশ দূর করার জন্য দোয়া করবে আর আমি দুঃখক্লেশ বিদূরিত করব? এভাবে আল্লাহ্ তা'লার এই আহ্বান করা প্রভাতের শুভ্ররেখা থেকে কৃষ্ণরেখা পৃথক হওয়া (সুবেহ-সাদেক) পর্যন্ত অব্যাহত থাকে'।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২১, বৈরুতে মূদ্রিত)

অনেকেই দোয়ার জন্য লিখে থাকে। তবে তারা নিজেরাও যদি এ পদ্ধতির অনুসরণ করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের বারিধারা বর্ষিত হতে দেখবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) এক প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'লা বলেন– যে আমার বন্ধুর শত্রুতা করে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। আমার বান্দা যতটা আমার পছন্দনীয় ও ফরয কর্মের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে পারে, ততটা অন্য আর কিছুর মাধ্যমে লাভ করতে পারবে না। নফলের মাধ্যমে আমার বান্দা আমার এতটা নিকটতর হয়ে যায় যে আমি তাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করি। আর আমি তাকে যখন আমার বন্ধু বানিয়ে নিই তখন তার কান হয়ে যাই যদ্বারা সে শুনে, চোখ বনে যাই যদ্বারা সে দেখে, তার হাতে পরিণত হই যদ্বারা সে ধরে , তার পা হয়ে যাই যদ্বারা সে চলাফেরা করে, অর্থাৎ আমি-ই তার কার্যনির্বাহক হয়ে যাই। আমার কাছে চাইলেই আমি তাকে দিই, সে আমার কাছে আশ্রয় যাচনা করলে আমি তাঁকে আশ্রয় প্রদান করি'।" (বুখারী, কিতাবুর রিক্বাক্ব, বাব আত্ তওয়াযে')

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) আরও বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) বলেন, 'সেই ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন, যে রাতে ঘুম থেকে জেগে ওঠে ও নামায পড়ে আর স্ত্রীকেও জাগ্রত করে। সে (স্ত্রী) জেগে উঠতে গড়িমসি করলে তাকে ওঠানোর জন্য তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা সেই স্ত্রীর প্রতিও কৃপা করুন, যে রাতকালে ঘুম থেকে জেগে

ওঠে, নামায পড়ে আর প্রিয়তম স্বামীকেও জাগিয়ে তুলে। স্বামী জেগে উঠতে গড়িমসি করলে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়, যাতে সে জেগে ওঠে'।" (আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:
"তাহাজ্জুদের নামাযকে আমাদের জামা'ত-এর অবশ্য পালনীয় জ্ঞান করে পড়া উচিত। যে বেশি পারে না, তার না হয় দু'রাকাত-ই পড়ে নেয়া উচিত কেননা, এতে অন্তত তার দোয়া করবার সুযোগ তো লাভ হবে। রাতের সেই প্রহরে দোয়াতে এক প্রভাব থাকে, কারণ তা সত্যিকার বেদনা ও আবেগের সাথে উৎসারিত হয়। যতক্ষণ অন্তরে এক বিশেষ প্রদাহ ও বেদনা অনুভূত না হয় ততক্ষণ এক ব্যক্তি কীভাবে আরামদায়ক নিদ্রা পরিত্যাগ করতে পারে? অতএব, সেই সময়ে জেগে ওঠাটাই অন্তরে এক বেদনাঘন আবহ সৃষ্টি করে, যা দোয়াতে বিনম্র কোমলতা ও উদ্‌বেগপূর্ণ আকুলতা সৃষ্টি করে আর এই উদ্বেগাকুল অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা দোয়া গৃহীত হওয়ার কারণ হয়ে যায়। কিন্তু জেগে উঠতে গিয়ে আলস্য ও উদাসীনতা প্রদর্শন করা হলে, জানা কথা যে, হৃদয়ে সেই বেদনা ও জ্বালা নেই। কেননা, মর্মবেদনা থাকলে ঘুম থাকতে পারে না। কিন্তু জেগে ওঠলে বুঝা যায় যে, মর্মপীড়ার ও বেদনার অন্য বড় কোন কারণ রয়েছে, যা ঘুম থেকে জাগিয়ে রাখছে"। (মলফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮২, নব সংস্করণ)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আরও বলেছেন:
"রাতে জেগে ওঠো! আর দোয়া করো যেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে তাঁর পথ দেখান। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণও তরবীয়ত (প্রশিক্ষণ) পর্যায়ক্রমেই লাভ করেছেন। পূর্বে কী ছিলেন তারা! বিষয়টি, চাষের জমিতে এক কৃষকের বীজ বপন করার ন্যায়। মহানবী (সা.) জমিতে পানি দেয়ার মত কাজ করলেন– তিনি (সা.) তাদের জন্য সকাতরে দোয়া করলেন। বীজ ছিল উন্নতমানের আর জমিও ছিল উর্বর, তাই সেই পানি সিঞ্চনে ফলও ফললো সব বাহারী রকমের। হুযূর (সা.) যে ভাবে হাঁটতেন তারাও একইভাবে হাঁটতো, দিন বা রাতের পার্থক্য তারা করতো না। বিশুদ্ধ অন্তরে তোমরা তওবা (প্রত্যাবর্তন) কর, তাহাজ্জুদে ওঠো, দোয়া কর, সঠিকভাবে মনোনিবেশ কর আর দুর্বলতা পরিহার কর আর নিজেদের কথা ও কাজকে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির অধিনস্থ কর।" (মলফুযাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮, নব-সংস্করণ)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করা-কে স্থায়ী অবলম্বন করে নাও

বয়আতের এই তৃতীয় শর্তে আরও রয়েছে, মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণে সচেষ্ট থাকবে, দরূদ পাঠে নিয়োজিত থাকবে আর তা নিয়মিত করবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٥٧﴾

(সূরা আল আহযাব, ৩৩:৫৭)

অর্থাৎ- নিশ্চয় আল্লাহ্ এবং তার ফিরিশ্‌তারা নবীর ওপর রহমত বর্ষণ করেন। হে লোকসকল! যারা ঈমান এনেছো তোমরাও তার প্রতি দরূদ আর সালাম অধিক হারে প্রেরণ কর।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণনা রয়েছে, "তিনি হযরত নবী করীম (সা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, 'তোমরা মুয়াজ্জিনকে আযান দিতে শুনলে তার উচ্চারিত বাক্যাবলী তোমরাও পুনরাবৃত্তি কর যা সে আযানে বলে, এর পর আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ কর। যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দশগুণ করূণাবারি বর্ষণ করেন। তিনি (সা.) আরও বলেছেন– আল্লাহ্ তা'লার সকাশে আমার 'ওসীলা' হওয়ার জন্য আকুতি কর, যা জান্নাতের মর্যাদাপূর্ণ স্তরসমূহের মধ্যে একটি এবং আল্লাহ্ তা'লার বান্দাদের মধ্য থেকে কোন একজন এটা লাভ করতে সক্ষম হবে, আমি প্রত্যাশা রাখি যে আমি-ই হবো সেই ব্যক্তি। যে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে আমার 'ওসীলা' হওয়ার জন্য দোয়া করবে, তার জন্য শাফাআ'ত লাভ করাটা বৈধতা পাবে'।" (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুস সালাত, বাব আল ক্বওলু মিসালু ক্বওলিল মুয়জ্জিনে ...)

অতএব, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য, খোদা পর্যন্ত পৌঁছার জন্য এই সবগুলো আঙ্গিক দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। নিজের দোয়াকে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে গ্রহণীয়তার মর্যাদায় উপনীত করার জন্য আবশ্যকীয় হলো মহানবী (সা.)-এর ওসীলা হওয়ার জন্য দোয়া করা। এর সর্বোত্তম উপায় যেমনটি

হাদিসে এসেছে আর যেমনটি কি-না হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-ও বলেছেন তাহলো, অনেক বেশি সংখ্যায় দরূদশরীফ পাঠ করা।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আ'লা ইব্রাহিমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা ইব্রাহিমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।

হযরত আমর বিন রাবিআ' (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, "মহানবী (সা.) বলেছেন– 'যেই মুসলমান আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে, আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমার প্রতি দরূদ পাঠে রত থাকে ততক্ষণ নাগাদ ফিরিশ্‌তারা তার ওপর আশিস বর্ষণ করে চলে। সেই দরূদ পাঠকারী তার ইচ্ছেমাফিক স্বল্পসময়ের জন্য দরূদ পাঠ করতে পারে আর ইচ্ছে হলে দীর্ঘ সময় ধরেও পড়তে পারে'।"

হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন যে, "দোয়া আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে, যতক্ষণ তুমি তোমার আপনজন মহানবী (সা.)-এর ওপর দরূদ প্রেরণ না কর ওখেকে কোন অংশই (খোদা তা'লার সকাশে উপস্থাপিত হওয়ার জন্য) ঊর্ধ্বলোকে উন্নীত হয় না।" [তিরিমিযি, কিতাবুস সালাত, বাব-মা জাআ' ফি ফাযলিস সালাতে আ'লান্নাবীয়ে (সা.)]

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "কিয়ামত দিবসে লোকদের মধ্য থেকে সেই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে, তাদের মধ্য থেকে যে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দরূদ প্রেরণকারী ছিল।" (প্রাগুক্ত হাদীস গ্রন্থ)

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) দরূদ শরীফের কল্যাণরাজি সম্পর্কে নিজস্ব অভিজ্ঞানের কথা এভাবে বর্ণনা করেছেন–

"একবার এমন হয় যে মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণে এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিমগ্ন রইলাম, কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের পথ অতীব সূক্ষ্ম, যা নবী করীম (সা.)-এর ওসীলা বা মধ্যবর্তীতা ব্যতিরেকে লাভ করা যায় না। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন– **ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা...** (আল মায়েদা, ৫:৩৬)। এভাবে একটা সময়কাল অতিক্রান্ত হবার পর দিব্যদর্শনে আমি দেখলাম, দুইজন ভিস্তিওয়ালা অর্থাৎ পানির মশক বহনকারী আমার ঘরে প্রবেশ করলো, একজন অন্দরমহলের পথ

হয়ে অপরজন বহির্মহল থেকে প্রবেশদ্বার দিয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করলো আর তাদের কাঁধে ছিল 'নূরের মশক' আর তারা বলছিল **হাযা বিমা সাল্লায়তা আ'লা মুহাম্মাদিন**।" (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩১ এর টীকা)

অর্থাৎ এইসব কল্যাণ 'সেই দরূদ শরীফ' এর কারণে যা তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি প্রেরণ করেছ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরও বলেন:

"দরূদ শরীফের বদৌলতে... আমি প্রত্যক্ষ করেছি যে, ঐশী কল্যাণরাজি বিস্ময়কর এক জ্যোতিরূপে মহানবী (সা.)-এর প্রতি সম্পাতিত হচ্ছে আর সেখানে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর বক্ষে শোষিত হয়ে যাচ্ছে। অতঃপর সেখান থেকে অসংখ্য আলোক রশ্মির ধারা নির্গত হয়ে প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তির কাছে তার প্রাপ্য অংশ পৌঁছে যাচ্ছে। এটা নিশ্চিত যে মহানবী (সা.)-এর মধ্যবর্তীতা ছাড়া কোন কল্যাণ কারও লাভ হতে পারে না।

দরূদ শরীফ কী? রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সেই আরশকে উদ্‌বেলিত-স্পন্দিত করা, যা হতে অসংখ্য আলোর ধারা উৎসারিত হয়। যে আল্লাহ্ তা'লার আশিস ও কল্যাণ প্রত্যাশী, তার জন্য অবশ্য করণীয় হলো অজস্র সংখ্যায় দরূদ শরীফ পাঠ করা, যেন সেই কল্যাণধারা উদ্‌বেলিত হয়"। (আল হাকাম, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৩, পৃষ্ঠা ৭)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আরও বলেছেন:

মানুষ তো প্রকৃতপক্ষে বান্দা অর্থাৎ 'চাকর' আর চাকর-এর কাজ হলো মনিব যে নির্দেশই দেয় তা পালন করা। অনুরূপভাবে, তোমরা যদি মহানবী (সা.)-এর আশিস পেতে চাও, তোমাদের জন্য আবশ্যক হবে, তাঁর (সা.) অনুগত দাস হয়ে যাওয়া। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ

(সূরা আল যুমার, ৩৯:৫৪)

(তুমি বল, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের প্রাণের ওপর অবিচার করেছ।)

এখানে 'বান্দা' বলতে 'চাকর' বোঝানো হয়েছে (সাধারণ) সৃষ্টি নয়। রসূল

করীম (সা.)-এর বান্দা বা চাকর গণ্য হওয়ার জন্য যা আবশ্যক, তা হলো তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ প্রেরণ করা আর তাঁর (সা.) কোন একটি নির্দেশেরও অমান্য না করা আর সমস্ত আদেশনির্দেশের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা।" (আল বদর, দ্বিতীয় বর্ষ, ১৪তম সংখ্যা, ২৪ এপ্রিল ১৯০৩, পৃষ্ঠা ১০৯)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর প্রতি এভাবেও দরূদ পাঠ করতেন:

"আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লাইহি ওয়া আলিহি বি আ'দাদি হাম্মিহি ওয়া গাম্মিহি ওয়া হুযনিহী লি হাযিহিল উম্মাতি ওয়া আনযিল আ'লাইহি আনওয়ারা রাহমাতিকা ইলাল আবাদি"।

অর্থাৎ– হে আল্লাহ্! দরূদ ও সালাম আর কল্যাণরাজিতে সিক্ত মহানবী (সা.)-কে তাঁর (সা.) অনুসারীদের এতো বেশি পরিমাণে কৃপা ও আশিস দান করো যতটা তাঁর হৃদয়ে এই উম্মতের জন্য দুঃখবেদনাপূর্ণ উদ্বেগ বিরাজ করতো আর তাঁর (সা.) প্রতি তোমার রহমতের জ্যোতি সর্বক্ষণ অবতীর্ণ করতে থাকো। (বারাকাতুদ্ দোয়া, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১)

প্রতিনিয়ত ইস্তেগফারে রত থাকো

এই তৃতীয় শর্তে 'ইস্তেগফার'এর বিষয়ও উল্লেখিত হয়েছে। পবিত্র কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ﴿۱۱﴾
يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿۱۲﴾
وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ
لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ﴿۱۳﴾

(সূরা নূহ, ৭১:১১-১৩)

অর্থাৎ- অতএব, আমি বললাম, নিজ প্রভু-প্রতিপালকের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের প্রতি অবিরাম বর্ষণকারী মেঘমালা প্রেরণ করবেন, সেই সাথে তিনি ধনসম্পদ ও সন্তানাদি দ্বারা তোমাদের সমৃদ্ধশালী করবেন, আরও দিবেন বিভিন্ন ফলফলাদির বাগান এবং বইয়ে দিবেন (তাতে) নদী ও ঝর্ণাধারা।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝٤

(সূরা আন নাসর, ১১০:৪)

অতএব, নিজ প্রভু-প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্রতার গান গাও, সেই সাথে নিজ দুর্বলতার জন্য তাঁর সমীপে শক্তি প্রার্থনা করে ক্ষমা ভিক্ষা কর। নিশ্চয় তিনি বার বার তওবা কবুলকারী।

এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস রয়েছে:

আবু বরদাহ বিন আবু মূসা (রা.) তার পিতা আবু মূসা (রা.)-এর বরাতে বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন– 'আল্লাহ্ তা'লা আমার উম্মতকে দু'টি আমানত পৌঁছানোর জন্য আমার প্রতি ওহী করেছেন; আর তা হলো–

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۝٣٤

(সূরা আল আনফাল, ৮:৩৪)

অর্থাৎ– আল্লাহ্ এমন নন যে, তুমি তাদেরই মাঝে রয়েছ অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ্ এমনও নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদের শাস্তি দিবেন। অতএব, আমি যখন তাদের ছেড়ে যাবো তখন কিয়ামত দিবস নাগাদ ইস্তেগফারকে তাদের মাঝে দিয়ে যাবো'।" (তিরমিযী, কিতাব তফসীরুল কুরআন, তফসীর সূরাতুল আনফাল)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি 'ইস্তেগফার'-এর সাথে নিজেকে আঁকড়ে রাখে (অর্থাৎ ইস্তেগফারে সর্বদা নিয়োজিত থাকে) আল্লাহ্ তা'লা তাকে সর্ব প্রকার বিপদআপদ থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন আর তার প্রত্যেক সমস্যা থেকে উত্তরণের রাস্তা খুলে দেন। সেসব স্থান থেকে তাঁর জীবিকার ব্যবস্থা করেন, যা সে ধারণাও করতে পারে না'।" (সুনান আবি দাউদ, কিতাবুল বিতর, বাব ফিল ইস্তেগফার)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

"...ইস্তেগফার, যার কল্যাণে ঈমানের শিকড় দৃঢ়তা লাভ করে, কুরআন শরীফে তা দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এক হলো, নিজ হৃদয়কে খোদার প্রেমে শক্তিশালী করে পাপের প্রকাশকে রুখে দেয়া যা একাকিত্বে মাথাচাড়া দেয়

আর খোদার মাঝে বিলীন হয়ে তাঁর সাহায্য চাওয়া। নৈকট্যপ্রাপ্তগণের ইস্তেগফার এটাই, যারা এক নিমেষকালও খোদা তা'লা হতে পৃথক হওয়াকে নিজেদের ধ্বংসের কারণ বলে জানেন। এজন্য তারা ইস্তেগফারে রত থাকেন, যেন খোদা তা'লা তাদেরকে স্বীয় প্রেমধারায় সিক্ত করে রাখেন। দ্বিতীয় প্রকার ইস্তেগফার হলো, পাপবন্ধন ছিন্ন করে খোদা তা'লার দিকে ধাবিত হওয়া। বৃক্ষ যেমন মাটিতে প্রোথিত হয়ে যায়, তেমনি মানব অন্তর যেন খোদার প্রেমে বিভোর হয়ে পবিত্র প্রবৃদ্ধি লাভ করে আর পাপের শুষ্কতা ও পতন হতে রক্ষা পায়। এই দুই প্রকারের অবস্থার নাম 'ইস্তেগফার' রাখা হয়েছে। 'ইস্তেগফার' শব্দ মূল ধাতু 'গাফ্র' হতে উদ্ভূত, যার অর্থ ঢেকে দেওয়া বা চাপা দেওয়া। অতএব, ইস্তেগফারের মর্মার্থ হলো, (যাচনারত থেকে) যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্ তা'লার প্রেমে প্রতিষ্ঠিত করে, আল্লাহ্ তা'লা যেন তার পাপ চাপা দিয়ে রাখেন এবং মানবীয় দুর্বলতার শেকড় যেন নগ্ন হতে না দেন। পরন্তু ঐশী চাদরে আচ্ছাদিত করে তাকে স্বীয় পবিত্রতার আশিস থেকে যেন অংশ দেন, অথবা কোন শিকড় পাপের প্রকাশে নগ্ন হয়ে গেলে, তা ঢেকে দেন এবং নগ্নতার অনিষ্ট হতে রক্ষা করেন। যেহেতু, আল্লাহ্ তা'লা কল্যাণের উৎস এবং তাঁর জ্যোতি যাবতীয় অন্ধকার দূর করার জন্য সব সময় প্রস্তুত, তাই পবিত্র জীবনলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা হলো, এই ভয়ঙ্কর অবস্থা হতে ভীত হয়ে সেই পবিত্র উৎসের পানে আমাদের উভয় হস্ত প্রসারিত করা, যাতে সেই ঝর্ণা-ধারা প্রবল বেগে আমাদের দিকে ধাবিত হয় এবং সমস্ত অপবিত্রতাকে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাঁর পথে মৃত্যুকে বরণ করে স্বীয় অস্তিত্বকে তাঁর নিকট সমর্পণ করা অপেক্ষা খোদা তা'লাকে সন্তুষ্টকারী আর কোন উত্তম কুরবানী নাই। (সিরাজুদ্দিন ঈসায়ীকে চার সায়ালোকা জওয়াব, রূহানী খাযায়েন, ১২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৬-৩৪৭)

তিনি (আ.) আরো বলেন:

... তারা যখন খোদার নিকট শক্তি প্রার্থনা করে অর্থাৎ, ইস্তেগফার করে তখন রূহুল কুদুসের (পবিত্র আত্মার) সাহায্যে তাদের দুর্বলতা কেটে যেতে পারে এবং তারা পাপে লিপ্ত হওয়া হতে রক্ষা পেতে পারে, যেভাবে খোদার নবী রসূলগণ রক্ষা পেয়ে থাকেন। যদি তারা এমন মানুষ হয়, যারা পাপে লিপ্ত হয়ে গিয়েছে, তাহলে ইস্তেগফার তাদের এই উপকার সাধন করে যে, পাপের কুফল অর্থাৎ, শাস্তি হতে তাদের রক্ষা করা হয়। কেননা, আলোর আবির্ভাবে

অন্ধকার তিষ্টিতে পারে না। আর যে সকল অপরাধী ইস্তেগফার করে না অর্থাৎ, খোদা তা'লার নিকট শক্তি যাচনা করে না, তারা তাদের কৃত পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করতে থাকে। (কিশতিয়ে নূহ্, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) অন্যত্র বলেন:
"কিছু মানুষ এমন রয়েছে, যারা পাপ সম্পর্কে সচেতন আবার কিছু এমনও লোক আছে, যারা পাপ সম্পর্কে জানেই না। এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা সার্বক্ষণিক ইস্তেগফারের ব্যবস্থা রেখেছেন, যাতে লোকদের প্রতিটি পাপ প্রকাশ্যে ঘটুক বা সংগোপনে, জানা থাকুক বা অজানা এবং হাত ও পা, জিহ্বা ও নাক আর কান ও চোখ, যার দ্বারাই তা ঘটে থাকুক না কেন, সব ধরনের পাপ থেকেই ইস্তেগফার করতে থাকা উচিত। এ যুগে হযরত আদম (আ.)-এর দোয়া বেশি বেশি পাঠ করা উচিত–

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۗ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

(সূরা আ'রাফ, ৭:২৪)

অর্থাৎ– হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা নিজেদের প্রাণের ওপর যুলুম করেছি আর তুমি আমাদের ক্ষমা না করলে এবং আমাদের প্রতি কৃপা না করলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

এই দোয়া শুরুতে কবুলিয়তের মর্যাদা পেয়ে গেছে। উদাসীনতার মাঝে জীবন কাটিও না। যে ব্যক্তি উদাসীনভাবে জীবন কাটায় না, তার ক্ষেত্রে আদৌ ভাবা যায় না যে, ভয়াবহ কোন বিপদে সে নিপতিত হবে! কোন বিপদই খোদার অনুমতি ছাড়া আসে না: যেমন আমার প্রতি এই দোয়া ইলহাম হয়েছে–

'রাব্বে কুল্লু শাইয়েন খাদেমুকা রাব্বে ফাহফাযনী ওয়ানসুরনি ওয়ার হামনী'

অর্থাৎ- হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।" (মলফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭৭, নব সংস্করণ)

ইস্তেগফার ও তওবা

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ

(সূরা হুদ, ১১:৪)

(অর্থাৎ- তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও, তাঁর কাছে সবিনয়ে তওবা কর)।

স্মরণ রেখো! দু'টো জিনিস এই উম্মতকে প্রদান করা হয়েছে, একটি শক্তি সামর্থ্য অর্জনের জন্য, অপরটি হলো অর্জিত শক্তিকে কার্যে রূপায়িত করার জন্য। শক্তি অর্জনের নিমিত্ত হলো ইস্তেগফার। অন্যভাবে একে সাহায্য যাচনা ও সাহায্য কামনা করাও বলা হয়।

সুফি সাধকগণ লিখেছেন, ব্যায়াম বা শরীরচর্চা, যেমন ভার-উত্তোলন আর মুগুর চালনা দৈহিকভাবে কুস্তিগীরদের শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি করে, তেমনিভাবে ইস্তেগফার হলো আধ্যাত্মিক শরীর-চর্চা। এর দ্বারা আত্মার বিশেষ শক্তি লাভ হয় আর চিত্ত দৃঢ়তা লাভ করে। সেজন্য, যে আত্মাকে শক্তিশালী করতে চায় সে যেন ইস্তেগফার করে। 'গাফ্র' বলা হয় ঢেকে রাখা ও আচ্ছাদিত করাকে। ইস্তেগফারের মাধ্যমে মানুষ সেই সব আবেগ ও উত্তেজনাকে অবদমিত করার ও আচ্ছাদিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে, যা খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়ার পথে অন্তরায়। অতএব, ইস্তেগফারের অর্থ হলো বিষাক্ত উপকরণ, যা আক্রমণ করে প্রাণের বিনাশ ঘটাতে চায়, তার ওপর বিজয়ী হওয়া, অধিকন্তু খোদা তা'লার নির্দেশ অমান্য করার পথে যত বাধা রয়েছে, তা এড়িয়ে চলার কার্যত দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।

এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা মানুষের মাঝে দু'রকম বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। একটি উপকরণ বা বৈশিষ্ট্য হলো বিষাক্ত, যার মন্ত্রণাদাতা শয়তান আর অপরটি সু-প্রবৃত্তি বা সুমতি। যখন মানুষ অহংকার করে আর নিজ সত্তাকে কিছু একটা ভেবে বসে আর প্রতিষেধকরূপী উৎস থেকে সাহায্য নেয় না, সেক্ষেত্রে বিষাক্ত উপকরণ বা প্রবৃত্তি বিজয়ী হয়ে যায়। কিন্তু নিজেকে যখন তুচ্ছ ও হীন জ্ঞান করে এবং নিজ-মাঝে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যের

মুখাপেক্ষীতা খুঁজে পায়, সেইখানে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এক ঝর্ণাধারা উৎসারিত হয়, যার দ্বারা তার আত্মা বিগলিত হয়ে বহমান ও গতিশীল রূপ ধারণ করে। আর ইস্তেগফারের মর্ম এটাই অর্থাৎ, এই শক্তি লাভ করে বিষাক্ত উপকরণের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়া। (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, রাবওয়া থেকে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ৩৪৮-৩৪৯)

সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসায় রত থাক

তৃতীয় শর্তে আরো এক কথা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, 'সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসায় রত থাকবে'।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা এ প্রসঙ্গে বলেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝۲

(সূরা ফাতেহা, ১:২)

অর্থাৎ, সর্বপ্রকার প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লারই, যিনি জগতসমূহের প্রভু-প্রতিপালক।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ ؕ
وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝۲

(সূরা সাবা, ৩৪:২)

অর্থাৎ, সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই, ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে যা-ই আছে সব তাঁরই এবং পরকালেও সব প্রশংসা তাঁরই। আর তিনি পরম প্রজ্ঞাবান (ও) সম্যক-অবহিত।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) বলেছেন, 'কাজ যত গুরুত্বপূর্ণই হোক, কিন্তু খোদা তা'লার প্রশংসা ছাড়া শুরু করা হলে অসম্পূর্ণই থেকে যায়'।"

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, "সব কথা বা কাজ, যা আল্লাহ্র প্রশংসা না করে আরম্ভ করা হয়, তা অকল্যাণকর ও অকার্যকর হয়ে থাকে।" (সুনান ইবনে মাজা, আব ওয়াবুন নিকাহ্ এবং সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব)

অপর একটি হাদীসে এসেছে:

নুমান বিন বশীর (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন, 'যে ব্যক্তি স্বল্পে তুষ্ট হয় না, সে অধিক পেলেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। আর যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না, সে আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজিরও কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজির স্বীকারোক্তি উত্তমভাবে প্রকাশ করাটাও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। আর আল্লাহ্ তা'লার নেয়ামতরাজীর স্মৃতিচারণ না করাটাও অকৃতজ্ঞতা'।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৮, বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত মা'য়াজ বিন জাবল (রা.) বর্ণনা করেন, র"সূলুল্লাহ্ (সা.) তার হাত শক্ত করে ধরে বললেন, 'হে মা'য়াজ! আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি'। অতঃপর তিনি (সা.) বললেন, 'হে মা'য়াজ! আমি তোমাকে এক উপদেশ দিচ্ছি, প্রত্যেক নামাযের পরে এই দোয়া করতে ভুলে যেয়ো না, **'আল্লাহুম্মা আয়ে'ন্নি আ'লা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ই'বাদাতিকা'** অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে সামর্থ্য দান কর, যেন আমি তোমায় স্মরণ করতে পারি, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি আর তোমারই ইবাদত উত্তম রূপে করতে সক্ষম হই'।" (সুনান আবি দাউদ, কিতাবুল বিতর, বাব ফিল ইস্তেগফার)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন:

"গভীর মনোনিবেশ ও প্রণিধানে মানুষ বুঝতে পারবে যে, প্রকৃতই সব রকমের প্রশংসা ও গুণাবলীর আধার একমাত্র আল্লাহ্ তা'লা। কোন মানব বা কোন সৃষ্টি, প্রকৃত ও সত্যিকার অর্থে প্রশংসা ও সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না। মানুষ নিঃস্বার্থভাবে দেখলে, তার কাছে এটা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হবে যে, কোন সত্তা প্রশংসাযোগ্য আখ্যা পায় হয়ত এ কারণে, যখন কারো অস্তিত্বই ছিলনা আর কোন অস্তিত্বের নামগন্ধই ছিল না, এমন সময়ে সে তার সৃষ্টিকর্ম সম্পাদন করে। অথবা এ কারণে যে, এমন যুগে যখন কোন কিছুর অস্তিত্বই ছিল না আর জানাও ছিল না যে, অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব আর অস্তিত্ব ও স্বাস্থ্যরক্ষা এবং জীবনের টিকে থাকার জন্য কী-কী উপকরণ আবশ্যক, তখন তিনিই সে সকল উপকরণ সরবরাহ করেন। অথবা এমন যুগে, যখন তার ওপরে বহু বিপদআপদ নিপতিত হতে পারতো কিন্তু সে করুণা করেছে এবং তাকে

নিরাপদ রেখেছে। বা এ কারণেও প্রশংসার যোগ্য হতে পারে যে, পরিশ্রমীর পরিশ্রম সে বিনষ্ট করে না এবং পরিশ্রমীদের পাওনা পুরোপুরি প্রদান করে। মজদুরের মজুরী প্রদান বাহ্যত যদিও এক রকম বিনিময় প্রদানের শামিল, কিন্তু প্রাপ্য পুরোপুরি আদায়কারীও অনুগ্রহশীল গণ্য হতে পারে। এসব হলো উচ্চ পর্যায়ের গুণাবলী যা কাউকে প্রশংসা ও গুণগানের যোগ্য করতে পারে।

এখন চিন্তা করে দেখ, সত্যিকার অর্থে এই সব প্রশংসার যোগ্য হলেন কেবল আল্লাহ্ তা'লা যিনি পুরোপুরি এসব গুণের আধার। অন্য কারও মাঝে এসব গুণের সমাহার নেই।

মোটকথা, আল্লাহ্ তা'লাই প্রধানত সত্তা ও সম্পূর্ণতার দিক থেকে প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। সত্তাগত দিক থেকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্য কারও সে অধিকার নেই। প্রশংসা পাওয়ার অধিকার যদি অন্য কারও থেকে থাকে তাহলে তা গৌণ প্রকৃতির বা আল্লাহ্র সত্তার মাধ্যমে তা সম্ভব। এটা খোদা তা'লার অনুকম্পা, তিনি এক-অদ্বিতীয় সত্তা হওয়া সত্ত্বেও নিজ করুণায় কাউকে কাউকে তাঁর প্রশংসার ভাগীদার করে নিয়েছেন।" (রোয়েদাদ-এ-জলসা দোয়া, রূহানী খাযায়েন, ১৫তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৯৮-৬০২)

জামা'তকে সম্বোধন করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন:

"তোমরা যদি চাও যে, স্বর্গে ফিরিশ্তারাও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করেও সদানন্দ রইবে, কুবাক্য শুনেও কৃতজ্ঞ হবে। নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখেও আল্লাহ্র সাথে তোমাদের বিচ্ছেদ ঘটাবে না। তোমরাই আল্লাহ্ তা'লার শেষ ধর্মমন্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যা হতে আর উৎকৃষ্টতর হওয়া সম্ভব নয়। তোমাদের মধ্যে যে কর্মে শিথিল হয়ে পড়বে, তাকে নোংরা বস্তুর ন্যায় মণ্ডলী হতে বাইরে নিক্ষেপ করা হবে এবং আক্ষেপের সাথে তার জীবনের অবসান ঘটবে। এরূপ ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। প্রণিধান কর, আমি অতি আনন্দের সাথে তোমাদেরকে এ সংবাদ দিচ্ছি যে, তোমাদের আল্লাহ্ এক বাস্তব অস্তিত্ব। যদিও সকলে তাঁরই সৃষ্টি, তবুও তিনি সে ব্যক্তিকেই মনোনীত করে থাকেন, যে তাঁকে বেছে নেয়। যে ব্যক্তি তাঁর অন্বেষী, তিনি তার সান্নিধ্যে এসে থাকেন। যে ব্যক্তি তাঁর পানে এগোয়, তিনি তাঁর নিকটে আসেন। যিনি প্রকৃতই তাঁকে সম্মান করেন, তিনিও তাকে সম্মান দান করেন।

তোমরা নিজ মন সরল করে এবং জিহ্বা, চক্ষু এবং কর্ণকে পবিত্র করে তাঁর দিকে অগ্রসর হও, তাহলে তিনি তোমাদেরকে গ্রহণ করবেন।" (কিশতিয়ে নূহ্, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) পুনরায় বলেন:
"খোদা তোমাদেরকে বিনষ্ট করবেন, এটা কখনো মনে করবে না। তোমরা খোদার হাতের এক বীজ বিশেষ যা জমীনে বপন করা হয়েছে। খোদা বলেছেন, 'এ বীজ অঙ্কুরিত হবে, ফুল দেবে, প্রত্যেক দিকে এর শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করবে এবং এক মহা মহীরূহে পরিণত হবে'। সুতরাং কল্যাণমণ্ডিত তারা, যারা খোদার কথায় ঈমান রাখে এবং মধ্যবর্তী সময়ের বিপদাবলীর জন্য ভীত হয় না। কারণ বিপদাবলীর আগমনও আবশ্যক, এ দিয়ে খোদা তা'লা তোমাদের পরীক্ষা করেন- কে তোমাদের মাঝে নিজ বয়আতের দাবিতে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী? যে ব্যক্তি কোন বিপদে পদস্খলিত হয় সে খোদার কোন ক্ষতি করবে না, বরং দুর্ভাগ্য তাকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। তার জন্ম না হলেই তার জন্য ভাল ছিল। কিন্তু সেসব ব্যক্তি, যারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরবে, তাদের ওপর বিপদাবলীর ভূমিকম্প আসবে, দুর্ঘটনার তুফান বইবে, লোকেরা তাদেরকে নিয়ে হাসিবিদ্রুপ করবে এবং জগৎ তাদের প্রতি ঘৃণাসূচক ব্যবহার করবে, কিন্তু পরিশেষে তারাই বিজয় লাভ করবে এবং আশিসের দুয়ারসমূহ তাদের জন্য উন্মোচিত করা হবে।

খোদা তা'লা আমার জামা'তকে অবহিত করার জন্য আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন– 'যারা ঈমান এনেছে, এমন ঈমান যাতে পার্থিবতার কোন সংমিশ্রণ নেই এবং সেই ঈমান, যা কপটতা, মিথ্যা, ভীরুতা দ্বারা দুষ্ট নয় আর সেই ঈমান, যা আজ্ঞানুবর্তিতার কোন স্তর থেকে অধঃপতিত নয়, এমন ব্যক্তিরা খোদার প্রিয়ভাজন ব্যক্তি'।

খোদা বলেছেন 'ওরা-ই তারা, যাদের পদচারণা হবে নিষ্ঠাসমৃদ্ধ'।" (আল্ ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৯)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে প্রকৃত অর্থে সত্যিকার আহমদী মুসলমান করুন। আমাদের বয়আতের অঙ্গীকারে প্রতিষ্ঠিত থাকা ও এর ওপর আমল করার তৌফীক দান করুন। খোদা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রকৃত ও পরিপূর্ণ

আনুগত্যকারী বানান। আমাদের দ্বারা এমন কোন কাজ যেন সংঘটিত না হয়, যার কারণে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রিয় এই জামা'তের ওপর কলঙ্ককালিমার কোন আঁচ আসে। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের ত্রুটিসমূহ মার্জনা করো। আমাদের দোষত্রুটি ঢেকে রাখো। আমাদেরকে সর্বদাই তোমার অনুগত ও বিশ্বস্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে রাখো। আমাদেরকে সবসময় বিশ্বস্ততা ও বয়আতের অঙ্গীকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখো। আমাদেরকে তোমার প্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত করে রাখো। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও এই অঙ্গীকার রক্ষার তৌফিক দান কর। কখনও আমাদেরকে তোমা থেকে বিচ্ছিন্ন করো না। আমাদেরকে তোমার সত্তার সত্যিকার তত্ত্বজ্ঞান দান কর। হে সবচেয়ে দয়ালু সত্তা, খোদা! আমাদের প্রতি দয়ার্দ্র হও আর আমাদের সমস্ত দোয়া কবুল করো। আমাদের ওইসব যাবতীয় দোয়ার উত্তরাধিকারী করো, যা হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ জামা'তের জন্য আর তার প্রিয় জামা'তে অন্তর্ভুক্তদের জন্য, তিনি (আ.) স্বয়ং করে গেছেন।

(সমাপ্তি ভাষণ, ইংল্যান্ডের জলসা সালানা, ২৭ জুলাই ২০০৩)

(চতুর্থ শর্তের ভূমিকা)

...এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর আবশ্যকীয় বিষয় আর বর্তমান যুগে এর প্রয়োজনিয়তা আরো প্রকটভাবে অনুভূত হচ্ছে। যেখানে আমরা হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে যাচ্ছি, এই গর্ব আমরা অবশ্যই করি যে, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অমুক সাহাবীর বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু নিজেদের পূর্বপুরুষের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানী সমূহের ওপর আমাদের দৃষ্টি কমই রয়েছে। পরবর্তী প্রজন্মের সাথে (পূর্ববর্তীদের) দৈহিকভাবে রক্তের সম্পর্ক থাকলেও আধ্যাত্মিকতার মান হ্রাস পেয়েছে। যাই হোক এটি স্বাভাবিক বিষয় যে, বাস্তবতার নিরিখে, কালের প্রবাহে নবুয়্যতের যুগ থেকে যতই দূরে যাওয়া হয় কিছুটা ঘাটতি, কিছুটা দূর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েই থাকে।

কিন্তু প্রগতিশীল জামা'ত যুগ ও পরিস্থিতির জন্য অশ্রুপাত করেই ক্ষান্ত হয় না বরং চেষ্টাপ্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। আমরা সৌভাগ্যবান, আমাদের সম্পর্কে এসব সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান রয়েছে যে, মসীহ্ ও মাহ্দীর জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে হযরত আকদাস মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শিক্ষামালা পৃথিবীময় প্রচার করার সৌভাগ্য আমরাই পাব, এটিই আমাদের নিয়তি, তবে এর জন্য শর্ত হলো আমাদের তৌহিদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা আর এই শিক্ষার ওপর কেবল আমাদের প্রতিষ্ঠিত থাকাই যথেষ্ট নয় বরং নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মধারাকেও প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে। এখন আমি হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি, যা থেকে স্পষ্ট হয় যে, তিনি (আ.) তাঁর হাতে বয়আতকারীদের কাছে কী প্রত্যাশা রাখেন। এরপর আমি বয়আতের ৪র্থ শর্ত সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করব।

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, "আমার হাতে দীক্ষা গ্রহণ করা এক মৃত্যু চায়, যাতে নতুনরূপে, তোমাদের আরেক নবজীবন লাভ হয়।

অন্তরের গভীর থেকে বয়আত না (করা) হলে কোন ফলাফল প্রকাশ পায় না। আমার (হাতে) বয়আতের মাধ্যমে খোদা আন্তরিক অঙ্গীকার চান। অতএব, আন্তরিকভাবে যে আমাকে গ্রহণ করে এবং নিজের পাপসমূহ থেকে সত্যিকারের তওবা করে, গফুর ও রহীম খোদা তার পাপসমূহ অবশ্যই ক্ষমা

করে থাকেন আর সে তখন মাতৃগর্ভ থেকে সদ্যজাত শিশুর মত হয়ে যায়, আর ফেরেশতারা তাকে সুরক্ষা দিয়ে থাকে।” (মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬২)

[২৪ আগষ্ট ২০০৩ জার্মানির জলসা সালানায় প্রদত্ত সমাপ্তি ভাষণ, যাতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বয়আতের ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তের ওপর বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন]

৪
বয়আতের চতুর্থ শর্ত

প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে আর বিশেষ করে মুসলমানদেরকে কথায় বা কাজে অথবা অন্য কোন ভাবে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবে না।

বয়আতের এই শর্তে যেমনটি স্পষ্ট যে, রাগান্বিত হয়ে বা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে, আমিত্বের কারণে, মিথ্যা আত্মাভিমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে হাত দ্বারা বা কথার মাধ্যমে কাউকে দুঃখকষ্ট দিবে না। বাস্তবিকপক্ষেই এটা এক জরুরী শর্ত যে, 'কোন মুসলমানকে দুঃখ দেবো না' তাই আমাদের জন্য আবশ্যক হলো এটি বিশেষ ভাবে মেনে চলা। কেননা, মুসলমানরা আমাদের প্রিয় প্রেমাস্পদ ও মনিব হযরত আকদাস মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি আরোপিত হয়। আমরা তো তাদের অমঙ্গলের কথা ভাবতেই পারি না। তবে নামসর্বস্ব সেই সব আলেম, যারা ইসলামের নামের ওপর এক কলঙ্ক বিশেষ, যারা এই যুগের মসীহ্ মওউদ ও মাহ্দী (আ.)-এর বিরুদ্ধে নিজেদের শত্রুতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রিয় খোদার সমীপে, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহামর্যাদাবান খোদা, যিনি সকল শক্তির মালিক, তাঁরই দরবারে অবনত হয়ে এমন দুরভিসন্ধিবাজদের বিরুদ্ধে সাহায্য যাচনা করে এই নিবেদন করি যে, হে আল্লাহ্! তুমি এদেরকে ধৃত কর। এটিও এজন্য যে, খোদার রসূল তাদের নিকৃষ্ট সৃষ্টি আখ্যায়িত করেছেন, নইলে আমাদের কারো প্রতি অযথা ঘৃণা কিংবা কারো বিরুদ্ধে আমাদের রাগ বা ক্ষোভ নেই। আমরা আল্লাহ্ তা'লা-প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ পালনকারী। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আমাদের রাগ সংবরণ করা সম্পর্কে উপদেশবাণী দান করতে গিয়ে বলেন,

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۳۵﴾

(সূরা আলে ইমরান, ৩:১৩৫)

অর্থাৎ, সেই সব লোক, যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে আর যারা ক্রোধ দমনকারী এবং মানুষকে মার্জনাকারী। আর আল্লাহ্ (এমন) সৎকর্মপরায়ণদের ভালোবাসেন।

এই আয়াতের সুবাদেই হযরত ইমাম হুসেইন (আ.)-এর দাস মুক্তি লাভ করেছিল। বলা হয়ে থাকে যে, ঘটনাচক্রে ভুল করে তাঁর (আ.) ওপর তাঁর চাকর পানি বা অন্য কোন গরম জিনিস ঢেলে দিল। এতে তিনি (আ.) খুবই রাগান্বিত দৃষ্টিতে তার (সেই দাসের) প্রতি তাকালেন। সেই ব্যক্তি ছিল চৌকশ, কুরআনের জ্ঞানও রাখতো আর উপস্থিত বুদ্ধিও ছিল প্রখর, তৎক্ষণাৎ সে বলে উঠলো **"ওয়াল কাযে মিনাল গাইযা"** (যারা ক্রোধ দমন করে)। এই কথায় তিনি (আ.) বলেন, "ঠিক আছে, রাগ সংবরণ করলাম"। তখন সেই লোকের ধারণা হলো যে, রাগতো দমন করেছেন কিন্তু মনে তো থাকবেই। অন্য কোন সময়ে অন্য কোন ভুলের কারণে মার না খেতে হয়। তাই সে আবারও বলে উঠলো **"ওয়াল আফিনা আনিন নাস"** (মানুষকে মার্জনাকারী)। তখন তিনি (আ.) আবারো বললেন, "ঠিক আছে, যাও ক্ষমাও করলাম"। জ্ঞান ও উপস্থিত বুদ্ধি আবারো তার কাজে এলো, সেই ব্যক্তি সাথে সাথেই বলতে লাগলো **"ওয়াল্লাহু ইউহেব্বুল মুহসেনীন"** (আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের ভালোবাসেন)। তিনি (আ.) বললেন, "চলো! যাও তোমাকে মুক্তই করে দিলাম"। সে যুগে দাস ব্যবসার প্রচলন ছিল, কৃতদাসদের সহজে মুক্তি লাভ হতো না। তবে এই দাসের উপস্থিত বুদ্ধি ও জ্ঞান এবং প্রভুর তাক্‌ওয়া কাজে দিল আর কৃতদাসের মুক্তি লাভ হলো। ইসলামের অনুপম শিক্ষা এমনই।

ক্ষমা ও মার্জনাপূর্ণ ব্যবহার কর

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কল্যাণসাধনের প্রকারভেদ তথা দ্বিতীয় প্রকার নৈতিক গুণ, যার সাথে কল্যাণসাধনের সম্পর্ক, এর ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন:

প্রথম নৈতিক গুণ হলো 'আফ্‌উ' অর্থাৎ- কারো অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া। এক্ষেত্রে কল্যাণসাধন হলো, যে পাপ করে, সে আসলে ক্ষতিসাধন করে আর সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। অপরাধীর শাস্তিই হওয়া উচিত। এই শাস্তি আইনের মাধ্যমে দেওয়া যেতে পারে। অপরাধীর জেলজরিমানা হতে পারে।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অন্যভাবেও তাকে নিজে সরাসরি শাস্তি দিতে পারে। এমতাবস্থায়, অপরাধী ব্যক্তি ক্ষমা দ্বারা সংশোধনযোগ্য বিবেচিত হওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়, তা হলে উভয়েরই হিত সাধন হবে। এক্ষেত্রে কুরআন শরীফের শিক্ষা হলোঃ

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ

(সূরা আলে ইমরান, ৩:১৩৫)

جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ

(সূরা আশ শূরা, ৪২:৪১)

অর্থাৎ, "পুণ্যবান সে, যে ক্রোধ দমন করার স্থানে ক্রোধ দমন করে এবং ক্ষমার উপযোগী ক্ষেত্রে অপরাধ ক্ষমা করে (৩:১৩৫)। অন্যায়ের শাস্তি অন্যায় অনুপাতে হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি অপরাধ ক্ষমা করে এবং এমন ক্ষেত্রে ক্ষমা করে, যার ফলে সংশোধন হয়, কোন অমঙ্গল নয়। অর্থাৎ, সঠিক ক্ষেত্রে ক্ষমা করা উচিত, অপাত্রে নয়; তা হলে ক্ষমাকারী, এর পুরস্কার পাবে" (৪২:৪১)। (ইসলামী উসুল কি ফিলোসফী, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫১)

প্রসিদ্ধ একটি হাদীস রয়েছে, অনেকেই তা শুনে থাকবেন যাতে মহানবী (সা.) নিজের বক্ষপানে ইঙ্গিত করে বলেছেন, এখানে রয়েছে তাক্ওয়া অর্থাৎ, প্রকৃত ও অবিমিশ্র তাক্ওয়া যদি কোথাও থাকা সম্ভব হয় তবে তা কেবল। আর কেবলমাত্র তাঁরই (সা.) অন্তঃকরণে। তাঁর সেই পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত অন্তরে তাক্ওয়া ছাড়া ভিন্ন কিছুই নেই।

অতএব, হে মানবমন্ডলী! হে মু'মিনদের জামা'ত! তোমাদের জন্য সর্বদা এই নির্দেশ রয়েছে যে, তোমাদেরকে যে উত্তম জীবনাদর্শ অনুসরণ করতে হবে তা মহানবী (সা.)-এর সর্বোত্তম জীবনাদর্শ। অতএব, নিজেদের হৃদয়কে যাচাই কর। তোমরা কি ঐ সর্বোত্তম জীবনাদর্শের অনুকরণে নিজেদেরকে সার্বিকভাবে তাক্ওয়া দ্বারা সুসজ্জিত করতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছো? আল্লাহ্ তা'লার ভয় ও তাঁর প্রতি বিনয়ভাব ধারণে তোমাদের অন্তরাত্মাও কি পরিপূর্ণ আর এর কল্যাণে তাঁর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা রয়েছে কি?

এবারে আমি হাদীসটি সবিস্তারে তুলে ধরছিঃ
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, "রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'তোমরা

একে অপরকে হিংসা করবে না, পরস্পর ঝগড়াবিবাদ করবে না, পরস্পর বিদ্বেষ রেখ না, একে অপরের সাথে শত্রুতা পোষণ করো না, মূল্য নির্ধারণ হওয়ার পর চড়া দাম দিয়ে অন্যের সওদা ক্রয় করো না, হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও, মুসলমানেরা ভাই ভাই হয়েই (বসবাস করে) থাকে, সে তার ভাই-এর ওপর অন্যায় করতে পারে না, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে না এবং তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে না। মহানবী (সা.) নিজ বক্ষপানে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিন বার বলেন, **'আত্‌তাকওয়া হা হুনা'** অর্থাৎ, তাকওয়া এখানে। কোন ব্যক্তির দুষ্কৃতকারী হওয়ার প্রমাণ হিসেবে এটিই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে হীন জ্ঞান করবে। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, ধনসম্পদ আর মানসম্মান অপর মুসলমানের জন্য হারাম'।" (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল বির্‌রে ওয়াস সিলাহ্, বাবু তাহরিমি যুলমিল মুসলিমি ওয়া খাযলিহে)

কাউকে কষ্ট দিও না

৪র্থ শর্তে বলা হয়েছে যে "হাত বা কথার দ্বারা বা অন্য কোনভাবে কাউকে কষ্ট দিবে না"। বিষয়বস্তুটি আরো খোলাসা করছি। এই যে হাদীস, যা আমি উদ্ধৃত করলাম তা দৃষ্টিপটে রাখুন। বলা হয়েছে "হিংসা করো না"। হিংসাবিদ্বেষ বা ঈর্ষা এমন এক বিষয় যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে শত্রুতায় পর্যবসিত হয়। যার প্রতি অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ থাকে মানুষ সারাক্ষণ তার ক্ষতি সাধনের কথা ভাবতে থাকে। হিংসাপরায়ণতা আবার এমন এক রোগ, এর ফলে অন্যের তো ক্ষতি হয়ই, হিংসাপরায়ণ ব্যক্তি নিজেও সেই আগুনে জ্বলতে থাকে। ছোট ছোট বিষয় যা থেকে হিংসাবিদ্বেষের সৃষ্টি, যেমন অমুক ব্যক্তির ব্যবসাবাণিজ্য এতো ভাল হচ্ছে কেন? অমুক ব্যক্তির কাছে আমার চেয়েও অর্থসম্পদ বেশি রয়েছে, অমুকের বাসগৃহ আমার চেয়ে ভালো, অমুকের সন্তানসন্ততি বেশি মেধাবী! মহিলাদের অবস্থা হলো অন্যের সুন্দর গহনা দেখলেই ঈর্ষা শুরু হয়ে যায়। তবে ধর্মের ব্যাপারে যেখানে ভালো কাজ দেখলে উৎসাহিত করার কথা, নিজের চেষ্টিত হওয়ার কথা যে, আমরা আরো অগ্রসর হবো, ধর্মের সেবক হবো, অথচ এর পরিবর্তে ধর্মের সেবকদের চরিত্র হননের চেষ্টা করা হয় আর যেকোন ভাবে অভিযোগ উত্থাপন করে ধর্মের সেবা থেকে তাদেরকে বঞ্চিতও করে দেয়ার অপচেষ্টা করা হয়।

উদ্ধৃত এই হাদীসে আরো বলা হয়েছে "ঝগড়া করো না", অথচ সামান্য

সামান্য বিষয়ে ঝগড়াবিবাদ শুরু হয়ে যায়। সামান্য ব্যাপারে যেমন জলসায় কর্তব্যরত কেউ, ছোট কোন শিশুকে জলসা চলাকালে তার একটানা দুষ্টামির কারণে কিছুটা দৃঢ়তার সাথে তাকে বারণ করে বা ধমক দিয়ে সাবধান করে যে, 'তুমি যদি আবারো এমনটি কর, তবে আমি কঠোর শাস্তি দিব'। নিকটে বসে থাকা মা-বাবা সাথে সাথে যুদ্ধংদেহী হয়ে উঠে। একথাগুলো অভিজ্ঞতালব্ধ কথা; এমনভাবে কর্তব্যরত ব্যক্তির চৌদ্দ গোষ্ঠি উদ্ধার করে ছাড়ে, যা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। তোমাদের এসব আচরণের মাধ্যমে তোমরা যেখানে তোমাদের বয়আতের অঙ্গীকার ভঙ্গ করছ, নিজেদের নৈতিক চরিত্রকে কলুষিত করছ, সেখানে নিজ নব প্রজন্মের অন্তর থেকেও জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিঃশেষ করে দিচ্ছ আর তার মনমস্তিষ্ক থেকেও ভালো-মন্দ সনাক্তকরণ ক্ষমতার বিলুপ্তি ঘটাচ্ছ।

মহানবী (সা.) এই হাদীসে আরো বলেছেন:
"পরস্পর শত্রুতা পোষণ করো না"। অথচ ছোট ছোট ব্যাপারে শত্রুতা আরম্ভ হয়ে যায়। অন্তর হিংসাবিদ্বেষ ও বৈরীতায় পূর্ণ হয়ে যায়। তাক করে থাকে, কখনও সুযোগ পেলে প্রতিশোধ নেবে। যদিও নির্দেশ রয়েছে যে, কারো প্রতি শত্রুতা পোষণ করো না, প্রতিশোধপরায়ণ হয়ো না।

হাদীসে এসেছে, এক সাহাবী মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করলেন, আমি ভুলব না এমন একটি সংক্ষিপ্ত কথা বলুন, কোন উপদেশ দান করুন। মহানবী (সা.) বলেন, রাগের অভ্যাস পরিহার কর। মহানবী (সা.) আবারো বলেন, 'ক্রোধ সংবরণ কর'। অতএব, সর্বদা ক্রোধ অবদমিত রাখার কথা মাথায় রাখবেন তাহলে হিংসা ও বিদ্বেষ আপনা থেকেই উবে যাবে। কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে বা কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে কিছু একটা করা আরেকটি বদ-অভ্যাস; যেমন– পণ্য ক্রয়ে কারো দাম করা জিনিসের ওপর আরো অধিক মূল্য চড়িয়ে প্রস্তাব দেয়া। এই হাদীসে এটি করতে বারণ করা হয়েছে। অধিক মূল্য দিয়ে পণ্য কেনার এরূপ চেষ্টার উদ্দেশ্য হলো অন্যের ব্যবসা নষ্ট করা, নইলে এমনটি করায় ব্যক্তিগত কোন লাভ হয় না।

এটা বিয়েশাদীর প্রস্তাবের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারো বিয়েশাদীর প্রস্তাব হলে ঐ প্রস্তাবের ওপর দিয়ে আবার কোন প্রস্তাব করা হলে, সেটা একই অপরাধের আওতায় পড়ে আর এটাও নিষিদ্ধ। এজন্য আহমদীদের উচিত এই নিষেধাজ্ঞা মনে রেখে চলা।

মহানবী (সা.) আরো বলেনঃ
“যুলুম বা অন্যায় করো না, কাউকে হীন জ্ঞান করবে না, কাউকে অপদস্ত করো না।” অত্যাচারী কখনই খোদা তা’লার নৈকট্য অর্জন করতে পারে না। এটা কী করে হতে পারে যে, একদিকে তো তোমরা খোদা তা’লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বয়আত করেছ, আল্লাহ্ তা’লার প্রত্যাদিষ্ট এ যুগের মহাপুরুষকে মান্য করেছ আর অপরদিকে অন্যায়ভাবে মানুষের প্রাপ্য অধিকার হরণ করছো? ভাইদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার না দেয়া আর বোনদেরকে তাদের উত্তরাধিকারে প্রাপ্য সম্পদের অংশ না দেয়া, কেবল এজন্য যে, বোনদের বিবাহ অন্য বংশে হয়েছে আর আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি হাত ছাড়া হয়ে অন্য বংশের হস্তগত যেন না হয়! এই প্রথাটি সাধারণত গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়। অতএব, স্ত্রীদের ওপর নির্যাতনকারী হোক, তাদের অধিকার প্রদানের প্রতি উদাসীনরাই হোক বা স্বামীর অধিকার প্রদানে উদাসীন স্ত্রীরা হোক না কেন; দৈনন্দিন জীবনের এমন সব ঘটনা জানা যাবে, যা অন্যায়-অত্যাচারের শামিল। অতএব, এমন বহু ঘটনা সামনে আসে, যা অন্যায় বইকি। অতএব, এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যা থেকে বোঝা যায় যে, অন্যকে তুচ্ছ মনে করা হচ্ছে কিংবা অপরকে নিচু জ্ঞান করা হচ্ছে। একদিকে বয়আত গ্রহণের দাবি আর যাবতীয় অপকর্ম পরিত্যাগ করার প্রতিশ্রুতি আর অপরদিকে এসব দুষ্কর্ম! সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, এক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানকে হেয় জ্ঞানকরা কোন ভাবেই বৈধ নয়। অনুরূপভাবে, এক মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানের রক্ত, ধনসম্পদ, সম্মান হারাম। তাহলে আজ এই যুগের প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষকে মান্য করে আপনারা যারা ইসলামী শিক্ষার ওপর সর্বাধিক আমল করার দাবি করে থাকেন, তাদের ব্যাপারে কিভাবে বরদাশত করা যেতে পারে যে, এইসব দুষ্কর্ম যাদের মধ্যে রয়েছে তারা আবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা’তে অন্তর্ভুক্তও থাকবে? এই বিষয়গুলো তুচ্ছ জ্ঞান করবেন না। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের কর্মপন্থা এ ব্যাপারে কেমন ছিল, ইসলাম গ্রহণ করার পর তারাই নিজেদের অভ্যন্তরে কত অসাধারণ পরিবর্তন সাধন করেছেন, এ প্রসঙ্গে আমি হাদীস থেকে আরও কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি–

হযরত আবু যার গিফারী (রা.) বর্ণনা করেন, “তার একটি চৌবাচ্চা থেকে লোকদেরকে খাবার পানি সরবরাহ করা হতো। একবার কোন এক পরিবারের

কতিপয় লোক এলো। তাদের মধ্য থেকে একজন বললো, 'কে আছে যে আবু যারের কাছে যাবে আর তার মাথার চুল মুঠিবদ্ধ করে তার কাছে কৈফিয়ত তলব করবে'? তখন তাদের মধ্য থেকে একজন বলল– সে এটা করবে। সেই অনুযায়ী ঐ ব্যক্তি চৌবাচ্চার কাছে তার নিকট গেল আর আবু যারকে উত্যক্ত করতে শুরু করলো। আবু যার দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বসে গেলেন এরপর শুয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি বললেন, 'রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, দাঁড়ানো অবস্থায় তোমাদের মধ্যে কেউ রাগান্বিত হলে বসে যাবে, যদি রাগ প্রশমিত হয়ে যায় তো ভাল, নয় তো শুয়ে পড়বে'।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৩, বৈরুত থেকে মুদ্রিত)

অন্য এক বর্ণনায় বর্ণনাকারী উল্লেখ করেন যে:
"আমরা একবার উরুয়া বিন মুহাম্মদের কাছে বসা ছিলাম। তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এলো আর তাঁর সাথে এমন সব কথাবার্তা বলল যে, তিনি রাগান্বিত হয়ে গেলেন। বর্ণনাকারী বলেন– অত্যন্ত রাগান্বিত হওয়ায় তিনি উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন আর ওযু করে আমাদের কাছে ফেরৎ আসলেন। এরপর তিনি বললেন যে– আমার দাদা, সাহাবী আতিয়া'র বরাতে আমার বাবা আমাকে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'রাগক্ষোভ শয়তান থেকে আসে আর শয়তানকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন থেকে আর আগুন নিভানো হয় পানি দিয়ে। অতএব, তোমাদের মধ্যে কারো রাগ হলে তার 'ওযু' করে নেয়া উচিত'।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৬, বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত যিয়াদ বিন আলাকা তাঁর চাচা কুতবা (রা.)-এর বরাতে বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) এই দোয়া যাচনা করতেন, 'হে আমার আল্লাহ্! আমি অনৈতিক কাজ, মন্দ কার্যকলাপ আর দুষ্ট আকাঙ্খা থেকে তোমার আশ্রয় যাচনা করি'।" (তিরমিযী, আব আবওয়াদুদ দাওয়াত, বাব জামিউদ দাওয়াত)

আমি এবারে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর নিজ জামা'ত সম্পর্কে কী বলেছেন আর জামা'তের সদস্যদের কাছে তাঁর (আ.) কী প্রত্যাশা, সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরছি–

"আমার সমগ্র জামা'ত, যারা এখানে উপস্থিত আছেন বা নিজ নিজ অঞ্চলে অবস্থান করছেন, তাদের এ উপদেশ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা উচিত। যারা এই জামা'তভূক্ত হয়ে আমার সাথে ভালোবাসা ও শিষ্যত্বের সম্পর্ক রাখেন, তারা আচারআচরণে সদাচারী ও সদালাপী হবেন এবং তাকওয়ার উচ্চ

মর্যাদায় পৌঁছাতে সক্ষম হবেন আর কোন বিশৃঙ্খলা ও দুষ্কৃতি বা অসচ্চরিত্রের মন্দ আচরণ তাদের ধারে কাছেও ঘেঁষবে না– এটিই এর উদ্দেশ্য। তাদের রীতিমত পাঁচ বেলার নামায জামা'তের সাথে আদায়ে অভ্যস্ত হতে হবে, তারা যেন মিথ্যা না বলেন আর কথা দ্বারা কাউকে যেন কোন আঘাত না দেন। কোন ধরণের কুকর্মে তারা লিপ্ত হবেন না আর কোন দুষ্ট অভিসন্ধি, নির্যাতন-নিপীড়ন, ঝগড়া-বিবাদের কল্পনাও হৃদয়ে ঠাঁই দেবেন না।

মোট কথা, সব ধরণের পাপ, অপরাধকর্ম, নিষিদ্ধ কথা ও কাজ এবং যাবতীয় প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও নিরর্থক কর্ম থেকে তারা বিরত থাকবেন এবং খোদা তা'লার পবিত্রহৃদয় সম্পন্ন নিরীহ বান্দায় পরিণত হবেন।

আর বিষাক্ত কোন উপাদানের রেশ মাত্র তাদের সত্ত্বায় যেন না থাকে এবং সমগ্র মানবজাতির প্রতি সহমর্মিতা যেন তাদের নীতি হয় আর খোদা তা'লাকে ভয় করে। নিজ কথা, হাত, অন্তর আর নিজের ধ্যানধারণাকে প্রত্যেক প্রকার অপবিত্রতা ও নৈরাজ্যকর বিশ্বাসঘাতকতা থেকে যেন দূরে রাখে এবং পাঁচ বেলার নামায অত্যন্ত যত্নের সাথে প্রতিষ্ঠিত রাখে। অন্যায় সীমালঙ্ঘন, আত্মসাৎ, ঘুষ খাওয়া ও অন্যের অধিকার হরণ এবং অন্যায় পক্ষপাত থেকে বিরত থাকে আর অসৎ সঙ্গ যেন পরিত্যাগ করে। আর যদি পরে প্রমাণিত হয়, এক ব্যক্তি যে তাদের মাঝে আনাগোনা রাখে, সে খোদা তা'লার নির্দেশাবলীর মান্যকারী নয়.. বা মানুষের অধিকার প্রদানে আদৌ যত্নবান নয় বরং সেই ব্যক্তি স্বভাবসিদ্ধ এক অত্যাচারী, দুষ্টস্বভাব ও দুরাচারী বা এমন ব্যক্তি, যাঁর সাথে তোমাদের বয়আতের ও ভালোবাসার সম্পর্ক, তাঁর সম্পর্কে অন্যায় ও অযথা অপলাপ করে কটুবাক্য প্রয়োগ করে আর বড়বড় কথা বলে। অপবাদ ও মিথ্যা আরোপের অভ্যাস জারী রেখে খোদা তা'লার বান্দাদের ধোঁকা দিতে চায়; তবে তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক হবে, ঐ পাপকে তোমাদের মধ্য থেকে বিদূরীত করা আর এমন লোককে বর্জন করা– যে ভয়ঙ্কর লোক।

ধর্ম-জাতিবর্ণনির্বিশেষে কোন দলের লোকজনদেরই ক্ষতি সাধনের মনোবৃত্তি থেকে তোমাদের দূরে থাকা উচিৎ বরং তোমরা সত্যিকার অর্থে প্রত্যেকের মঙ্গলাকাঙ্খী হও। তবে তোমাদের অবশ্যই সাবধান হওয়া উচিত, যাতে দুষ্কৃতকারী, পাপাচারী, নৈরাজ্যবাদী ও বাটপারদের তোমাদের বৈঠকে কোনভাবে আনাগোনা না থাকে। আর তোমাদের বাড়িঘরেও যেন তাদের

ঠাঁই না হয়। কেননা, ওরা যে কোন সময় তোমাদের স্খলন ডেকে আনতে পারে।"

অনুরূপভাবে তিনি (আ.) আরও বলেন,
"এ হলো ঐ সমস্ত বিষয় ও শর্তাবলী, যা আমি শুরু থেকে বলে আসছি। আমার জামা'তের প্রত্যেকের এসব নির্দেশ পালন করা বাধ্যতামূলক। তোমাদের বৈঠক যেন অপবিত্র, অশালীন, ঠাট্টামশকরায় মজে না যায়, বরং পবিত্র অন্তঃকরণের অধিকারী সৎস্বভাব ও পূতচিন্তাধারা নিয়ে ইহজগতে বিচরণ কর। স্মরণ রেখো! প্রত্যেক দুষ্কৃতি প্রতিরোধের যোগ্য হয় না। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমা আর মার্জনার অভ্যাস গড়। ধৈর্য ও বিনম্র গাম্ভীর্যের সাথে কাজ কর। কারও প্রতি অন্যায়ভাবে আক্রমণ করো না। অন্তরের প্রবল আবেগানুভূতি অবদমিত করে রাখো, কোন বিতর্ক উঠলে, ধর্মীয় কোন কথাবার্তা হলে তা কোমল ভাষায় আর সভ্যতার গন্ডির মাঝে থেকে কর। আবার অজ্ঞতাপ্রসূত কথাবার্তা হতে থাকলে সালাম দিয়ে সেই মজলিস থেকে দ্রুত উঠে পড়ো। তোমাদের উত্যক্ত করা হলে আর গালিগালাজ করা হলে কিংবা তোমাদের সম্পর্কে মন্দ থেকে মন্দতর সব কথাবার্তা বলা হলে সাবধান থেকো যে, অর্বাচীনতার উত্তর একই ভাষায় দেবে না, নইলে তোমরাও তদ্রুপই সাব্যস্ত হবে যেমনটা তারা। খোদা তা'লা তোমাদেরকে এমন এক ঐক্যবদ্ধ জামা'তে পরিণত করতে চান, যাতে সমগ্র বিশ্বের জন্য পুণ্য ও সততার নমুনা রূপে তোমরা পরিগণিত হও। অতএব, নিজেদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তিকে শীঘ্র বের করে দাও যে পাপ, দুষ্কৃতি, নৈরাজ্য ও নোংরা মন-মানসিকতার পরাকাষ্ঠা।

আমাদের জামা'তে যে ব্যক্তি বিনয়, পুণ্য, তাক্ওয়া, বিনম্র কোমল ভাষা, পুতঃ স্বভাব ও পাক-পবিত্র রীতিনীতির ভেতর কাল যাপন করতে পারে না, সে কাল ক্ষেপণ না করে আমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাক। কেননা, আমাদের খোদা চান না যে, এমন ব্যক্তি আমাদের সাথে থাকুক। নিশ্চয় সেই ব্যক্তি দুর্ভাগা হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে। কেননা, ওই ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করে নি। সুতরাং তোমরা সাবধান হও! কার্যত সদাত্মা ও বিনয়াবনত এবং মুত্তাকী হয়ে যাও। তোমাদের পরিচিতি হবে পাঁচ বেলার নামায আর উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যার মাঝে পাপের বীজ রয়েছে, সে এই সদুপদেশে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না"। (ইশতেহার, ২৯ মে ১৮৯৮, তবলীগে রিসালত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২-৪৩)

তিনি (আ.) আরো বলেন:
"মানুষের উচিত আত্মম্ভরী না হওয়া, নির্লজ্জতা প্রদর্শন না করা, মানুষের সাথে মন্দ ব্যবহার না করা, মমতাপূর্ণ আচরণ করা, ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হয়ে কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করা এবং স্থান কাল ভেদে কঠোরতা ও কোমলতা প্রদর্শন করা।" (মলফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০৯, নব সংস্করণ)

বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন কর

পুনরায় বিনয় ও নম্রতা সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন:
"...ঐশী শাস্তি অবতীর্ণ হয়ে তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তওবা কর। জাগতিক আইনকানুনের যেখানে এতটা ভয়ভীতি থাকে তবে কী কারণ থাকতে পারে যে, খোদা তা'লার বিধানের ব্যাপারে ভয়ে তটস্থ থাকবে না? মাথার ওপর বিপদ যখন এসেই পরে তবে তো তার স্বাদ ভোগ করতেই হয়। প্রত্যেকের উচিত তাহাজ্জুদে ওঠার চেষ্টা করা আর পাঁচ বেলার নামাযের সাথে কুনুতকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া এবং খোদা তা'লাকে অসন্তুষ্ট করে, এমন প্রতিটি বিষয় থেকে তওবা করা। তওবার অর্থ হলো, ঐ সমস্ত মন্দকর্ম আর ঐ সব কিছু, যা খোদা তা'লার অসন্তুষ্টির কারণ, তা সবই পরিহার করে পবিত্র এক পরিবর্তন সাধন করা আর সম্মুখে অগ্রসর হওয়া ও তাক্ওয়া অবলম্বন করা; এরই মাঝে আল্লাহ্‌র কৃপা নিহিত। নিজের মানবিক আচার-আচরণ সুষমায় সজ্জিত করা উচিত। কোন ক্রোধ যেন না থাকে, সে স্থান যেন শিষ্টতা ও বিনয় নিয়ে নেয়। চরিত্রের সংশোধনের পাশাপাশি সামর্থ্য অনুযায়ী দানখয়রাতও কর।

يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا

(সূরা আদ দাহার, ৭৬:৯)

অর্থাৎ, খোদার সন্তুষ্টির জন্য তাঁরই ভালোবাসায় তারা অভাবী, এতিম এবং বন্দীদের খাবার খাওয়ায়। আর বলে, শুধুই আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য এই সব দিচ্ছি আর সেই দিনকে আমরা ভয় করি যেদিন হবে অত্যন্ত ভয়াবহ এক দিন। সারকথা হলো, দোয়া যাচনা কর। ক্ষমা ভিক্ষা করে তওবার সাথে দানখয়রাত করতে থাক যাতে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিজ দয়ায় তোমাদের সাথে কৃপাপূর্ণ ব্যবহার করেন।" (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৪-১৩৫, নব সংস্করণ)

এরপর তিনি (আ.) আরও বলেন:

"অতএব, হে বন্ধুগণ! এই নীতিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। সকল শ্রেণির মানুষের সাথে বিনম্র ব্যবহার কর। নম্রতায় বুদ্ধিমত্তা বাড়ে আর সহনশীলতা ও কোমলতায় বাড়ে চিন্তার গভীরতা। যে ব্যক্তি এই পন্থা অবলম্বন করে না, সে আমার জামা'তভুক্ত নয়। আবার, যে ব্যক্তি বিরুদ্ধবাদীদের গালিগালাজ আর কটু কথায় ধৈর্যধারণ করতে না পারে, তার আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার রয়েছে, তবে সঙ্গত নয় যে, কঠোরতার প্রত্যুত্তরে কঠোর ব্যবহার করে কোন অশান্তি সৃষ্টি করবে। এগুলো হলো জোরালো উপদেশবাণী যে সম্পর্কে আমি আমার আপন জামা'তকে অবহিত করেছি, আমরা এমন ব্যক্তিদের প্রতি অসন্তুষ্ট ও তাকে আমরা আমাদের জামা'ত থেকে বহিষ্কার করি, যে এ নির্দেশ মেনে চলে না।" (তবলিগে রেসালত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭০)

বয়আতের পঞ্চম শর্ত

সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে-কাঠিন্যে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থা ও পরিস্থিতিতে ঐশী সিদ্ধান্ত সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিবে। তাঁর পথে সকল প্রকার লাঞ্ছনাগঞ্জনা ও দুঃখকষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ এসে উপস্থিত হলে তাঁর প্রতি বিমুখ হবে না বরং সম্মুখপানে এগিয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۲۰۸﴾

(সূরা আল বাকারা, ২:২০৮)

অর্থাৎ, এমন মানুষও আছে, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেকে বিক্রি করে দেয় আর আল্লাহ্ (এরূপ) বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেনঃ
"মানুষের মধ্যে এমন উচ্চ মর্যাদার মানুষ, যারা খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে আত্ম বিলীন করে, তারা খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের প্রাণ বিকিয়ে দেয়; এরাই সেইসব লোক যাদের ওপর খোদা তা'লার করুণাবারি বর্ষিত হয়।... খোদা তা'লা এই আয়াতে আরও বলেছেন, সকল প্রকার দুঃখকষ্ট থেকে সেই ব্যক্তি পরিত্রাণ লাভ করে, যে আমার পথে ও আমার সন্তুষ্টির পথে নিজ জীবন বিক্রি করে দেয়। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রমাণ করে যে, সে খোদার হয়ে গিয়েছে আর তার নিজ সম্পূর্ণ সত্তাকে সে এমনই এক বিষয় মনে করে, যা স্রষ্টার আনুগত্যের জন্য আর সৃষ্টির সেবার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে।..."
(রিপোর্ট জলসা আজম মাজাহেব, পৃষ্ঠা ১৩১-১৩২)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরও বলেনঃ
"খোদা তা'লার প্রিয় বান্দা নিজের জীবন খোদার রাস্তায় উৎসর্গ করে দেয়

আর এর বিনিময়ে সে খোদার সন্তুষ্টি ক্রয় করে নেয়। এরাই সেই সব ব্যক্তি, যারা খোদার বিশেষ কৃপাভাজন।”... (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৮)

অতঃপর তিনি (আ.) আরো বলেন:
“এমন কতিপয় ব্যক্তিও রয়েছে, যারা নিজেদের জীবন খোদার পথে বিক্রি করে দেয় যাতে কোনভাবে তার প্রতি তিনি (আল্লাহ্) সন্তুষ্ট হয়ে যান।...” (পয়গামে সুলেহ, রূহানী খাযায়েন, ২৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭৩)

এমন লোকদের সম্পর্কেই খোদা তা’লা সুসংবাদ দিয়ে বলেন:

يٰۤاَيَّتُهَا النَّفۡسُ الۡمُطۡمَئِنَّةُ ﴿۲۸﴾ ارۡجِعِىۡۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرۡضِيَّةً ﴿۲۹﴾
فَادۡخُلِىۡ فِىۡ عِبٰدِىۡ ﴿۳۰﴾ وَادۡخُلِىۡ جَنَّتِىۡ ﴿۳۱﴾

(সূরা আল ফাজর, ৮৯:২৮-৩১)

অর্থাৎ, হে শান্তি প্রাপ্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পানে সন্তুষ্ট ও সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আস। অতএব, তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

যারা তকদীরের সিদ্ধান্তে সমর্পিত, তিনি তাঁর জন্য দুঃখকষ্ট বরণকারীদের বিনা প্রতিদানে কখনও পরিত্যাগ করেন না। আমাদের মধ্যে অনেকে এমন আছে, যারা ভুলভ্রান্তি ও দুর্বলতার মূর্ত প্রতীক। আমাদের দ্বারা অনেক সময় ভুলত্রুটি আর মন্দকর্ম ঘটেই যায় কিন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার অভ্যাস যদি থাকে আর সর্বাবস্থায় তাঁর (আল্লাহ্‌র) জন্য দুঃখকষ্ট বরণ করতে সদা প্রস্তুত থাকি আর সেই মহিলাদের মত যেন না হই, যারা সামান্য ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়লেই প্রচন্ড হা-হুতাশ আরম্ভ করে আর চিৎকার ও বিলাপ করে সারা পাড়া মাথায় তুলে। তাহলে এমন ধৈর্য ধারণকারীদের জন্যই আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) এই সুসংবাদ দিয়েছেন।

দুঃখকষ্ট ভোগ করায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, “কোন মুসলমান যদি কোন সমস্যা, বিপদাপদ, দুঃখবেদনা ও কোন উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠার সম্মুখীন হয়, এমনকি একটি কাঁটা বিঁধলেও সেই কষ্টের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা’লা তার পাপ মোচন করেন।” (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলা, বাবু সাওয়াবিল মুমেনে ফিমা ইউসিবুহু মিন মারাযিন আও হুযনিন)

হযরত সুহাইব বিন সিনান (রা.) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসেঃ
মহানবী (সা.) বলেছেন, "মু'মিনের বিষয়ও বিস্ময়কর, তার প্রতিটি কাজকর্মই কল্যাণমণ্ডিত ও কল্যাণকর হয়ে থাকে। এই কৃপা কেবলমাত্র মু'মিনের জন্যই নির্ধারিত। যেকোন প্রকার আনন্দ ও স্বাচ্ছ্যন্দ লাভ হলে সে আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর তার এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তার জন্য আরও অধিক কল্যাণ বয়ে আনে। আবার যদি সে কোন দুঃখবেদনা বা ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়, সে ধৈর্য ধারণ করে আর তার এই কর্মপন্থা তার জন্য মঙ্গল ও কল্যাণ বয়ে আনে। কেননা, ধৈর্যধারণ করে সে পূণ্য অর্জণ করে"। (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল যোহদ, বাবুল মু'মিনি, আমরুহু কুল্লুহু খায়ের)

আবার কখনও কখনও আল্লাহ্ তা'লা সন্তান-সন্ততির মাধ্যমেও তার প্রিয় বান্দাকে পরীক্ষা করে থাকেন। সন্তানের মৃত্যুতে হা-হুতাশ, আহাজারি অনেক করা হয়, বিশেষ করে মহিলাদের ভেতর এটি দেখা যায়। আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকে ধৈর্যশীলা ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভে নিবেদিত মা দিয়েছেন। তবে কতিপয় স্থান থেকে কখনও কখনও এ বিষয়ে আপত্তি-অভিযোগও আসে, বিশেষ করে স্বল্প শিক্ষিতদের মধ্য থেকে। শুধুমাত্র স্বল্প শিক্ষিতদের মধ্য থেকেই নয় পড়াশোনা জানাদের মধ্যেও আমি এমনটা দেখেছি। অকৃতজ্ঞতা ও অভিযোগমূলক কথা তাদেরও মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়।

একটি বর্ণনা রয়েছে, মহানবী (সা.) মহিলাদের বয়আতের সময় এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি নিতেন। হাদীসে এভাবে উল্লেখ রয়েছেঃ
"হযরত ওসাঈদ (রা.) মহানবীর হাতে বয়আত গ্রহণকারিণী এক সাহাবিয়ার পক্ষ থেকে বর্ণনা উল্লেখ করেন, মহানবী (সা.) বয়আত নেয়াকালে যে অঙ্গীকার তাদের থেকে নিয়েছেন, তাতে এ কথাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে, আমরা হুযূর (সা.)-কে অমান্য করবো না, শোক প্রকাশকালে নিজ মুখমন্ডলে আঁচড় কাটবো না, উচ্চস্বরে চিৎকার চেঁচামেচিঁ করবো না, নিজের কাপড়চোপর ছিঁড়ে ফেলবো না, মাথার চুল আগোছালো রাখব না (অর্থাৎ, এমন কান্নাকাটি করবো না, যা দ্বারা চরম ক্ষোভ ও অধৈর্য এবং মারাত্মক নৈরাশ্যভাব প্রকাশ পায়)।" (আবু দাউদ, কিতাবুল জানায়েয, বাবু ফিন নূহে)

দুঃখ যখন আঘাত হানে ধৈর্য ধারণের সঠিক সময় তখনই

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) একবার এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে এক কবরের পাশে বসে মাতম করছিল। তিনি (সা.) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। ঐ মহিলা বলল, যাও-যাও, নিজের কাজ কর, যেই দুঃখবেদনার সম্মুখীন আমি হয়েছি, সেই বিপদে তুমি পড় নাই। প্রকৃতপক্ষে, ঐ মহিলা তাঁকে (সা.) চিনতে পারে নাই (সেজন্যই অসম্মানজনক এমন কথা সে বলেছে)। তাকে যখন বলা হলো যে, ইনি ছিলেন রসূলুল্লাহ্ (সা.), সে অস্থির হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরজায় উপস্থিত হলো আর বাধা দেয়ার মত কোন দারোয়ান সেখানে না থাকায় অনায়াসে সে অন্দর মহলে ঢুকে সবিনয়ে নিবেদন করলো, 'হুযূর (সা.)! আমি আপনাকে চিনতে পারি নাই'। (আমি এখন ধৈর্য ধারণ করছি) তিনি (সা.) বললেন, 'প্রকৃত ধৈর্য তো দুঃখ আঘাত হানা কালেই ধারণ করতে হয়' (নইলে কান্না কাটি করে ব্যথিত-ক্লান্ত হয়ে অবশেষে সকলকেই ধৈর্য প্রদর্শন করতে হয়)।" (বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, বাব জিয়ারাতুল কুবুর)

একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ গুঢ় কথা ৫ম শর্তে এটি বলা হয়েছে যে, অসাচ্ছন্দ ও কষ্টদায়ক অবস্থা যদি দীর্ঘায়িত হতে থাকে আর জাগতিক প্রলোভন নাগালের ভেতর মনে হয়, যদি এমনটি মনে হয় যে আমি যদি অমুক কাজটি করি কিংবা সেই দিকে ঝুঁকে যাই, তাহলে তা অত্যন্ত লাভজনক হতে পারে, জাগতিক ক্ষমতাধরেরাও লোভ দেখিয়ে বলে, আহমদী হিসেবে জামা'তের সাথে সম্পর্কিত থেকেও তুমি এই কাজ করতে পার, এতে তেমন কোন সমস্যা নেই, এই ব্যবসা করে নাও, এর দ্বারা তোমার নিজের অবস্থার উন্নতি হবে আবার চাঁদা দিয়ে জামা'তের সেবাও করতে পারবে; এটাই হলো জামা'ত থেকে দূরে নেয়ার এবং খোদা-বিমুখ করার সেই দাজ্জালি ফেৎনা। এজন্যই হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, তোমরা যদি বয়আত করে থাক তবে ঐ চক্করে আর পড়ো না, ঐ ধোঁকা থেকে দূরে থাক। খোদার সাথে বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত স্থাপন কর। তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কর বা তাঁর সামনে ঝুঁকো তাহলে তোমরা আমার হয়ে যাবে, এতে তোমার অভিষ্ট লাভ হবে।

এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.)-এর বড়ই আকর্ষণীয় এক উপদেশ রয়েছে:

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, "একবার যখন আমি মহানবী

(সা.)-এর পিছনে বাহনে বসা ছিলাম। তিনি (সা.) বললেন, 'হে স্নেহাস্পদ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা বলছি। প্রথম কথা হলো, আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ রেখো, তিনি তোমাকে স্মরণ রাখবেন, তুমি খোদার সত্তায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে তাঁকে নিকটেই পাবে। কোন কিছু চাইতে হলে আল্লাহ্ তা'লার কাছেই চাও। তোমার কোন সাহায্য যাচনা করার থাকলে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য যাচনা কর। জেনে রাখ, সব লোক একত্রিত হয়ে তোমার ভালো করতে চাইলেও তারা তোমার কোনই মঙ্গল সাধন করতে পারবে না, যদি আল্লাহ্ তা'লা তা না চান আর তোমার ভাগ্যে তা না লিখে দেন। আর যদি তারা তোমার ক্ষতি করতে একাত্ম হয়ে যায়, তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, যদি না আল্লাহ্ তা'লা তোমার কপালে সেই ক্ষতি লিখে রাখেন, কলম প্রত্যাহার করে নেয়া হয় আর তকদীরের লেখা ফুরিয়ে যায়'।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, মহানবী (সা.) বলেনঃ

"আল্লাহ্ তা'লার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ তাহলে তুমি তাঁকে সামনে পাবে, স্বাচ্ছ্যন্দকালে বা সুখের সময় তুমি তাঁকে স্মরণ করো, দুঃসময়ে তিনিও তোমায় স্মরণ রাখবেন। জেনে রাখ, তুমি যা হারিয়েছ বা তুমি যা লাভ করতে পার নাই, তা তোমার জন্য নয় আর যা তুমি পেয়ে গিয়েছ তা তোমার প্রাপ্তির বাইরে থাকতে পারে না। কেননা, অবধারিত নিয়তির লিখন এটাই ছিল। স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ধৈর্য্যশীলদের সাথে থাকে। আনন্দ ও উৎকণ্ঠা একই বৃন্তে দু'টো ফুল আর হাসিআনন্দ, দুঃখবেদনার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রত্যেক কষ্টের অবধারিত সাথি হলো স্বাচ্ছন্দ্য।" (তিরমিযী, আবু ওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ)

মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সর্বদা গভীর বেদনার সাথে দোয়া করতেন। অথচ তাঁর (সা.) কোন কর্মই আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির বাইরে ছিল না।

বর্ণিত রয়েছে, মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম হযরত আয়েশা (রা.)-এর বরাতে বলেন, তিনি (রাযিআল্লাহু আনহা) বলেছেন, "আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পাশে শায়িত ছিলাম। রাতের কোন এক প্রহরে আমি হুযূর (সা.)-কে বিছানায় পেলাম না। চারদিকে হাতড়ানো কালে হঠাৎ আমার হাত তাঁর পবিত্র পা স্পর্শ করলো। সেসময় তিনি সিজদারত ছিলেন আর দোয়া করছিলেন– 'হে আল্লাহ্! আমি তোমার অসন্তোষ থেকে রক্ষা পেতে তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয়ে আসছি। তোমার

শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে তোমারই ক্ষমার নিরাপদ আশ্রয়তলে ঠাঁই নিই। আমি তোমার মহিমা গণনা করতে সক্ষম নই, তোমার নিজস্ব মহিমা তুমি স্বয়ং যেভাবে বর্ণনা করেছ তুমি তেমনই'।" (তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত)

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে,
হযরত আব্দুল ওয়াহাব বিন বিরদ মদীনায় এক ব্যক্তিকে বলেন– "হযরত আয়েশা (রা.)-এর সমীপে হযরত মুয়াবিয়া লেখেন যে, 'আমাকে লিখিতভাবে কোন উপদেশ দান করুন', হযরত আয়েশা (রা.) তাকে লিখে পাঠান, 'আসসালামু আলাইকুম, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে একথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জনরোষের তোয়াক্কা না করে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির সন্ধানী হয়ে থাকে তাদের (জনতার) অসন্তোষের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান আর যে ব্যক্তি জনগণের মনস্তুষ্টির জন্য আল্লাহ্ তা'লাকে অসন্তুষ্ট করে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে জনগণের হাতেই ছেড়ে দেন'।" (তিরমিযী, কিতাবুয যোহদ)

তোমরাই খোদা তা'লার শেষ ধর্মমণ্ডলী

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য নিজ প্রিয় জামা'তকে উপদেশ দিয়ে বলেন,
"বিভিন্ন প্রকার দুঃখকষ্টের মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা হওয়া অবধারিত যেভাবে পূর্ববর্তী মু'মিনগণেরও পরীক্ষা হয়েছিল। অতএব, সাবধান! এইরূপ যেন না হয় যে, তোমরা হোঁচট খাও। দুনিয়া তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না যদি আকাশের সাথে তোমাদের সম্পর্ক দৃঢ় থাকে। তোমাদের ক্ষতি তোমাদের নিজেদেরই হাতে হবে, শত্রুর হাতে নয়। তোমাদের সকল জাগতিক সম্মান হারিয়ে গেলেও তিনি (খোদা তা'লা) স্বর্গে এক অক্ষয় সম্মান তোমাদের দান করবেন। অতএব, তোমরা তাঁকে পরিত্যাগ করো না। তোমাদের জন্য দুঃখকষ্টে জর্জরিত হওয়া আর অনেক আশাহত হওয়া অবসম্ভাবী। সুতরাং এমন অবস্থায় তোমরা মনোবল হারাবে না। কেননা, তোমাদের খোদা তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে চান যে, তোমরা তাঁর পথে অবিচল রয়েছ কি-না। যদি তোমরা চাও, আকাশে ফেরেশ্তারাও তোমাদের প্রশংসা করুক তাহলে মার খেয়েও তোমরা সদানন্দ থাকবে, গালি শুনেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, বিফলতা দেখেও আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। তোমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রতিষ্ঠিত শেষ জামা'ত। সুতরাং তোমরা

পুণ্য কর্মের সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন কর, উৎকর্ষতায় যা হবে পরম মার্গের। তোমাদের মধ্যে যেকেউ অলস হয়ে পড়বে, ঘৃণিত বস্তুর মত তাকে জামা'ত হতে বাইরে নিক্ষেপ করা হবে এবং আক্ষেপের সাথে সে মরবে। সে আল্লাহ্ তা'লার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। দেখ! আমি অতি আনন্দের সাথে তোমাদেরকে এই শুভ সংবাদ দিচ্ছি যে, বাস্তবিকই তোমাদের খোদা বিদ্যমান। সকলে যদিও তাঁরই সৃষ্ট, তবুও সেই ব্যক্তিকেই তিনি মনোনীত করে থাকেন, যে তাঁকে বেছে নেয়। যে তাঁর কাছে যায় তিনি তার কাছে এসে যান। যে তাঁকে সম্মান দেয়, তিনিও তাকে সম্মান দান করেন।" (কিশতীয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, ১৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫)

অন্যত্র তিনি (আ.) আরও বলেন:

"আমাদের উচিত আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করা। এজন্য আবশ্যকতা রয়েছে নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার; কেবলমাত্র বড় বড় বুলি আওড়ানো আর কথার মাঝে আমাদের চেষ্টাপ্রচেষ্টা ও মনোবল যেন সীমাবদ্ধ না থাকে। আমরা আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে তিনি আমাদেরকে আশিসমণ্ডিত করেন আর তাঁর নিজ অনুগ্রহ ও কল্যাণের দুয়ারসমূহ খুলে দেন। ...বিশ্বস্ততা ও সততার সরু এই রাজপথ অতিক্রম করা সহজসাধ্য নয়। সত্য-স্বপ্ন ও এলহাম হওয়া আরম্ভ হবে আর আমরা চেষ্টাসাধনা ছেড়ে দিয়ে হাতের ওপর হাত রেখে বসে থাকব– এসব কথা নিয়ে কখনও বড়াই করতে পারি না। আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের পছন্দ করেন না।" (আল বদর, ৩য় খণ্ড, ১৮-১৯ সংখ্যা, তারিখ ৮-১৬ মে, ১৯০৪)

তিনি (আ.) আরও বলেন:

"প্রত্যেক মু'মিনের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে, যদি সে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁরই (আল্লাহ্‌র) হয়ে যায় তবে খোদা তা'লাও তার বন্ধু-অভিভাবক হয়ে যান। কিন্তু ঈমানের অট্টালিকা যদি জীর্ণ হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই বিপদের আশঙ্কা থাকে। কারো অন্তরের অবস্থা তো আমরা জানিই না... তবে একনিষ্ঠভাবে খোদার হয়ে গেলে খোদা তা'লা তাকে বিশেষ ভাবে নিরাপত্তা দান করেন। যদিও তিনি সবারই খোদা, তবুও যে ব্যক্তি নিজ সত্তাকে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই প্রতি নিবেদন করে রাখে, তিনি তাঁর আপন মহিমার বিশেষ বিকাশ সেই ব্যক্তিকেই দেখিয়ে থাকেন। আর খোদার প্রতি একনিষ্ঠ হওয়া হলো আমিত্ব সম্পূর্ণরূপে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়া যেন এর কোন কণাও

অবশিষ্ট না থাকে। এজন্য আমি বার বার আমার জামা'তকে সম্বোধন করে বলে থাকি– বয়আত গ্রহণ করায় গর্ববোধ করো না, অন্তঃকরণ যদি পবিত্র না হয় তাহলে আমার হাতে হাত রাখা কিইবা কাজে দেবে? ...কিন্তু যে সত্যিকারের অঙ্গীকার করে তার বড় বড় পাপও ক্ষমা করে দেয়া হয় আর সে এক নব জীবন লাভ করে।" (মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৫, নব সংস্করণ)

যে আমার হয়ে গিয়েছে, সে আমা থেকে বিচ্ছিন্ন হতেই পারে না

তিনি (আ.) আরও বলেন:

"অতএব, কেউ যদি আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে না চায় তবে সে পৃথক হয়ে যাক। আমি জানি না, কত ভয়াবহ অরণ্য ও কন্টকাকীর্ণ মরু সামনে রয়েছে যা আমাকে পাড়ি দিতে হবে। অতএব, যার পা স্পর্শকাতর বা নাযুক ঐসব লোক কেন আমার সাথে এসে বিপদাপদ মাথায় টেনে নেয়? যে আমার হয়ে গিয়েছে সে আমা থেকে বিচ্ছিন্ন হতেই পারে না, দুঃখকষ্টে নিপতিত হলেও নয়, মানুষের গালমন্দেও নয় আর ঐশী সংকট বা পরীক্ষাতেও নয়। আর যারা আমার নয়, তারা বন্ধুত্বের বৃথা দাবি করে। কেননা, অচিরেই তাদেরকে পৃথক করে দেয়া হবে এবং তাদের পরবর্তী অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থার চেয়ে শোচনীয় হবে। আমরা কি ভূমিকম্পকে ভয় পাব? খোদা তা'লার পথে পরীক্ষার সম্মুখীন হলে আমরা কি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ব? আমরা কি আমাদের প্রিয় খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ পরীক্ষার মুখোমুখি হলে সটকে পড়তে পারি? অবশ্যই এমনটি সম্ভব নয়, আর তবেই যদি তাঁর একান্ত অনুগ্রহ ও আশিস আমাদের লাভ হয়। অতএব, যে পৃথক হবার সে বিচ্ছিন্নই হয়ে যাক, তার প্রতি রইল বিদায় সম্ভাষণ। তবে তাদের মনে রাখা উচিত, কু-ধারণা পোষণ আর সম্পর্ক ছিন্ন করার পর এক সময় পুণরায় প্রত্যাবর্তন করলে, এমন প্রত্যাবর্তনে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে সেই সম্মান মানুষ লাভ করতে পারে না যেই সম্মান বিশ্বস্ত মানুষ লাভ করে থাকে। কেননা, কু-ধারণা আর বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্কদাগ গভীরই হয়ে থাকে"। (আনওয়ারুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩-২৪)

পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততা ও অবিচলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন কর

আজ থেকে শত বছর পূর্বে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর

জীবদ্দশায় দু'জন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততা ও অবিচলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং নিজেদের বয়আতের অঙ্গীকার যথাযথভাবে পালন করেছেন আর খুবই উত্তম রূপে পালন করেছেন। বয়আতের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার জন্য বহু লোভলালসা তাদেরকে দেয়া হয়েছে কিন্তু দৃঢ়তার ঐ বরপুত্রেরা সে সবের প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করেন নাই বরং বয়আতের অঙ্গীকারে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদেরকে অসাধারণ সাধুবাদ জানিয়েছেন, তারা হলেন– শহীদ সাহেবজাদা সৈয়্যদ আব্দুল লতিফ (রা.) আর শহীদ আব্দুর রহমান খান (রা.)। এ প্রসঙ্গে হুযূর (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি–

"এখানে ঈমান ও ইনসাফের সাথে ভাবা উচিত, যে জামা'তের সার্বিক ভিত্তি ষড়যন্ত্র, ধোঁকা, মিথ্যা ও প্রতারণার উপর সেই জামা'তের সদস্যরা কি এমন দৃঢ়তা ও সাহসিকতা প্রদর্শন করতে পারে যে, এ পথে পাথরে পিষ্ট হওয়াকে বরণ করবে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে আর নিজেদের স্ত্রী-সন্তানের জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা করবে না বরং বীরত্বের সাথে জীবন উৎসর্গ করবে? বয়আতের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার শর্তে বারবার মুক্তির আশ্বাস দেয়া সত্ত্বেও এ পথ পরিত্যাগ করবে না? একইভাবে শেখ আব্দুর রহমানকেও কাবুলে জবাই করা হয়েছে। কিন্তু তিনি উহ শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করেন নি আর এ কথাও বলেন নি যে, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি বয়আতের অঙ্গীকার পরিত্যাগ করছি। এটিই সত্য ধর্ম ও সত্য ঈমান হওয়ার প্রমাণ যে, কারো যখন পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়ে যায় আর ঈমানের সুমিষ্ট স্বাদ দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হয় এমন সব মানুষ এ পথে মৃত্যুকে ভয় করে না। হ্যাঁ! যাদের ঈমান কেবল বাহ্যিকতার মাঝে সীমাবদ্ধ এবং যাদের শিরা-উপশিরায় ঈমান প্রবেশ করে না তারা ইস্করিয়তীয় যিহুদার ন্যায় সামান্য লালসায় পড়ে ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারে। প্রত্যেক নবীর যুগে এমন অপবিত্র ধর্মত্যাগীদের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। অতএব, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। কেননা, নিষ্ঠাবানদের বড় এক জামা'ত আমার সাথে রয়েছে। আর তাদের প্রত্যেকে আমার দাবির সত্যতার সপক্ষে এক-একটি নিদর্শন স্বরূপ। এটি হল, আমার খোদার কৃপা।

রাব্বি ইন্নাকা জান্নাতি ওয়া রাহমাতুকা জুন্নাতি ওয়া আয়াতুকা গিযাঈ ওয়া ফাযলুকা রিদাঈ"

(হকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬০-৩৬১)

অর্থাৎ, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমার স্বর্গ আর তোমার রহমত আমার ঢাল, তোমার আয়াত বা নিদর্শন আমার খাদ্য আর তোমার অনুগ্রহ আমার চাদর।

এ ঘটনার পর জামা'তের শত বর্ষেরও অধিক কালের ইতিহাস এ কথার সাক্ষী যে, এই বিশ্বস্ততা ও অবিচলতার দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হওয়া আজও অব্যাহত আছে। প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে, শহীদ করা হয়েছে বাপের চোখের সামনে ছেলেকে, ছেলের সামনে বাপকে খুন করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো সেই খোদা, যিনি বিশ্বস্ততা প্রদর্শনকারীদের পক্ষে সর্বোত্তম জবাব দিয়ে থাকেন, এই রক্ত কী বৃথা যেতে দেবেন? অবশ্যই নয়, বরং পরবর্তী প্রজন্মকে তিনি পূর্বের চেয়ে অধিক কল্যাণ ও আশিসধারা বর্ষণে সিক্ত করেছেন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই, যারা এখানে উপস্থিত আছেন, বিভিন্ন দেশে বসবাস করছেন, তারা এর জীবন্ত সাক্ষী বরং আপনাদের অধিকাংশ সেই অনুগ্রহের বর্ষণস্থলে পরিণত হয়েছেন। এটা সেই বিশ্বস্ততা রক্ষার প্রতিদান যা খোদা তা'লার সাথে তারা করে দেখিয়েছেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত বয়আতের অঙ্গীকার বাস্তবেও পালন করে দেখিয়েছেন। স্বচ্ছলতার মাঝে কোথাও আপনারা বা আপনাদের প্রজন্ম যেন বয়আতের সেই অঙ্গীকার ভুলে যাবেন না।

সেই প্রিয় খোদার সাথে সর্বদা বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষা করে চলুন যাতে এই আশিস ধারা আপনাদের প্রজন্মের মধ্যেও প্রবহমান থাকে আর বিশ্বস্ততার এই ঐশী সম্পর্ককে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝেও দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করুন।

বয়আতের ষষ্ঠ শর্ত

সামাজিক কদাচার ও কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব পরিহার করবে। কুরআনের অনুশাসন শতভাগ শিরোধার্য করবে এবং আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশনাবলীকে নিজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্মপন্থা হিসেবে অবলম্বন করবে।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, তোমরা আমার হাতে এই শর্তেও বয়আতের অঙ্গীকার কর যে, সামাজিক কদাচারে লিপ্ত হবে না। তোমরা যে সমাজে বসবাস কর সেগুলো তারই অংশ হয়ে রয়েছে। তোমরা ধর্মের মাঝে অনেক কুপ্রথা ও কদাচার অন্তর্ভুক্ত করেছ এ অযুহাতে যে পূর্বেকার ধর্মে ঐ সমস্ত আচার অনুষ্ঠানগুলো প্রচলিত ছিল আর তোমরা সে সমাজেই বসবাস করছিলে। উদাহরণস্বরূপ বিবাহের অনুষ্ঠানে কতিপয় বৃথা কার্যকলাপ হয়ে থাকে। যেমন– বর পক্ষের প্রদত্ত মোহরানা স্বরূপ উপঢৌকন সামগ্রী প্রদর্শনীর আয়োজন আর কনে পক্ষের নিজ পরিবার থেকে প্রাপ্ত যৌতুক রীতিমত ঘটা করে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। ইসলাম বিবাহের আনুষ্ঠানিকতায় কেবলমাত্র হক-মোহরানা প্রকাশ্যভাবে জনসমক্ষে ঘোষণা করার কথা বলে, অন্যসব আচারঅনুষ্ঠান নিরর্থক। প্রথমত, অবস্থা সম্পন্ন লোকেরা কেবলমাত্র নিজেদের নামডাক ছড়াতে ও বড়াই করতে বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠানে স্বামী প্রদত্ত উপহার সামগ্রী ও যৌতুকের প্রদর্শনী করে থাকে। বড়াই করে উপহারদাতারা বলে, আমাদের ছেলেমেয়েদের বা ভাইবোনদের বিয়েতে অপর পক্ষের আত্মীয়স্বজনরা যা দিয়েছে, দেখে নাও তাদের চেয়েও ঢের বেশি আমরা দিয়েছি। এ কেবলই প্রতিযোগিতা আর আত্মপ্রদর্শন। আজকাল আপনাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন, অভিবাসন গ্রহণ করার পর যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে অনেক উন্নতি দান করেছেন, অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছেন, এটাও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ারই কল্যাণ আর প্রদত্ত কুরবানীরই ফল, যা আপনাদের পূর্বপুরুষগণ দিয়েছিলেন, এসব তাদেরই দোয়ার ফসল। কিন্তু কতিপয় এমন

ব্যক্তিও রয়েছেন যারা ঐসব কল্যাণ ও আশিসের প্রকাশ তাঁর (আল্লাহ্‌র) সমীপে নিবেদিত হয়ে তাঁর রাস্তায় খরচ না করে বিয়েশাদীতে নাম কামানো, লোক দেখানো আর আত্মম্ভরিতা প্রদর্শনের জন্য এসব কদাচার পালন করে চলছেন। আবার বিবাহে, ওলিমায় ভোজের আয়োজনে বাহুল্য ব্যয় করা হচ্ছে আর লোক দেখানোর জন্য নানা পদের খাবার তৈরী করা হচ্ছে। এতে গরীব বা অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল লোকেরাও দেখাদেখি উপহার সামগ্রী প্রদর্শনীর আয়োজন করতে গিয়ে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ছে। আবার কখনও বরপক্ষ কনে পক্ষের কাছে যৌতুক দাবি করে বসে, এজন্য যে, লোকেরা কি বলবে নব বধু যৌতুক আনে নি! আর এতে করে কনে পক্ষকে ঋণগ্রস্ত হতে হয়।

অতএব, পাত্রপক্ষের অন্তত খোদার ভয় থাকা উচিত। কেবলমাত্র কুপ্রথার দাসত্ব করে নিজের নাম উঁচু রাখার জন্য গরীবদেরকে বিপদগ্রস্ত আর ধার দেনায় জর্জরিত করবেন না। অথচ দাবি করা হয়, আমরা আহমদী আর আমরা বয়আতের ১০টি শর্ত পুরোপুরি মেনে চলি। সংক্ষেপে এই হলো বিবাহের আচার অনুষ্ঠানের একটি চিত্র, যা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম।

এ বিষয়টি যদি আরও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরি তাহলে বিবাহের আচার অনুষ্ঠান সংক্রান্ত ভয়াবহ পরিণতি তুলে ধরার মত আরো অনেক দৃষ্টান্তই পাওয়া যাবে। আর সামাজিক কদাচার যখন বাড়তে থাকে, এর প্রভাবে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে সে পুরোপুরি কুপ্রবৃত্তির শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়, যদিও সে বয়আতের অঙ্গীকারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, কামনাবাসনা থেকে দূরে থাকবে আর নিজের ওপর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর নির্দেশাবলী মান্য করা বাধ্যতামূলক করে নিবে।

আল্লাহ্ ও রসূল (সা.) আমাদের কাছ থেকে কী চান? এটাই যে, সামাজিক কদাচার আর কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে আমার আদেশসমূহের ওপর আমল করে চল। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে এ প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন–

فَاِنۡ لَّمۡ یَسۡتَجِیۡبُوۡا لَکَ فَاعۡلَمۡ اَنَّمَا یَتَّبِعُوۡنَ اَہۡوَآءَہُمۡ ؕ وَ مَنۡ اَضَلُّ مِمَّنِ
اتَّبَعَ ہَوٰىہُ بِغَیۡرِ ہُدًی مِّنَ اللّٰہِ ؕ اِنَّ اللّٰہَ لَا یَہۡدِی الۡقَوۡمَ الظّٰلِمِیۡنَ ﴿۵۱﴾

(সূরা কাসাস, ২৮:৫১)

অর্থাৎ, তারা তোমার এ আহ্বানে সাড়া না দিলে জেনে রাখ, তারা কেবল নিজেদের কামনাবাসনারই অনুসরণ করছে। তার চেয়ে অধিক বিপথগামী আর

কে হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র পথনির্দেশনা বাদ দিয়ে নিজ কামনা-বাসনার অনুসরণ করে? আল্লাহ্ কখনও জালেম লোকদের সঠিক পথের দিশা দেন না।

সুতরাং, লক্ষ্য কর! এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন, যা আমাদের জন্য মারাত্মক এক সাবধান বাণী। যেসব লোক কেবলমাত্র নিজেদের কামনাবাসনার দাসত্ব করছে তারা কখনই হেদায়াত লাভ করতে পারবে না। আমরা এক দিকে তো এই দাবি করি যে, যুগইমামকে আমরা সনাক্ত করতে পেরেছি, তাকে মান্য করে চলছি, অপর দিকে সামাজিক যেসব কদাচার রয়েছে, যুগইমামের সাথে সেইসব কদাচার পরিহার করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তা ছাড়ছি না, তবে কি আমরা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছিনা! অতএব, প্রত্যেকের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত, প্রত্যেকের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত। যদি আমরা বয়আতের অঙ্গীকারে প্রতিষ্ঠিত থাকি, খোদাকে ভয় করে পার্থিব কামনাবাসনার দাসত্ত্ব হতে বিরত থেকে আর সেই প্রিয় খোদার প্রশংসায় রত থেকে আমরা তাঁর মহিমার প্রকাশ ঘটিয়ে তাঁরই প্রতি বিনয়াবনত হই তাহলে এর প্রতিদানে তিনি আমাদেরকে তাঁর নিজ জান্নাতের শুভ সংবাদ দিচ্ছেন। তিনি পবিত্র কুরআনে যেমন বলেছেন—

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۙ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى

(সূরা নাযেআত, ৭৯:৪১-৪২)

অর্থাৎ, যে তার প্রভু-প্রতিপালকের মর্যাদাকে ভয় করে এবং নিজেকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে নিশ্চয় জান্নাতই হবে (তার) আবাস স্থল।

কুপ্রথা ও সামাজিক কদাচার সম্পর্কে এবারে আমি হাদীসের কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি:

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ধর্মীয় বিষয়ে এমন কোন নব্যরীতির সূচনা করে, ধর্মের সাথে যার কোনই সম্পর্ক নাই তবে সেই কুপ্রথা বা আচারঅনুষ্ঠান অগ্রহণীয় ও পরিত্যাজ্য'।" (বুখারী, কিতাবুস্ সুলাহ, বাব ইযা ইসতালাহু আলা সুলহি যুদি)

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, "রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে উপদেশ দান করছিলেন। তার (সা.) চোখ ছিল রক্তিম, কণ্ঠস্বর ছিল উঁচু, আর তার উত্তেজনাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এমন মনে হচ্ছিল, আক্রমণে উদ্যত কোন সেনাবাহিনী সম্পর্কে তিনি যেন আমাদের সতর্ক করছিলেন। তিনি (সা.)

বলেন, ঐ সেনাদল সকাল-সন্ধ্যায় যে কোন মুহূর্তে আক্রমণে উদ্যত। তিনি (সা.) বলেন, আমার আগমনকাল আর ঐ মুহূর্ত এমন সন্নিকটবর্তী করা হয়েছে (এটা বলতেই তিনি তর্জনীর সাথে মধ্যমা আঙ্গুলটি একত্রে মিলিয়ে দেখালেন) যেভাবে এই দু'টি আঙ্গুল একত্রে সংযুক্ত রয়েছে। তিনি একথাও বলেন, 'এবারে আমি তোমাদেরকে এ-ও বলছি যে, সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহ্‌র কিতাব আর সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শের পথ। সর্বনিকৃষ্ট কাজ হলো ধর্মে নব্য রীতিনীতির প্রচলন করা আর সেইসব নব্যরীতি বা বিদা'ত ভ্রান্ত পথেই নিয়ে যায়'।" (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল জুমুআতি, বাব তাখ ফিকুস সালাতে ওয়াল খুতবাতে)

হযরত আমর বিন আওউফ (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার সুন্নতের কোন একটি সুন্নত এমনভাবে জীবিত রাখে, যার ফলে লোকেরা তা অনুশীলন করা আরম্ভ করে। এক্ষেত্রে পুণ্যকর্মশীল প্রত্যেক ব্যক্তির পুণ্যের সমপরিমাণ পুণ্য সুন্নতকে পুনরুজ্জীবিতকারী সেই ব্যক্তির পুণ্যে যোগ হতে থাকবে, কিন্তু এর ফলে নেক কর্মের অনুসারী ব্যক্তিগণের কোন একজনেরও পুণ্যে কোন কমতি বা ঘাটতি হবে না। অপর দিকে, যে ব্যক্তি কোন বিদা'তের (নতুন রীতির) সংযোজন ঘটায় আর লোকেরা তা অনুসরণ করে তাহলে এর ওপর আমলকারী সকলের পাপের দায়ভার তারই ওপর বর্তাবে। আর এতে সেসব নব্যরীতি বা বিদাতের অনুসারী লোকের স্ব স্ব পাপের বোঝা কোনরূপেই হাল্কা হবে না'।" (সুনানে ইবনে মাজা, বাব মান আহ্ইয়া সুন্নাতা কাদ উমিতাত)

নবসংযোজন বা বিদা'ত এবং কুপ্রথা-কদাচার পরিত্যাজ্য

উপরে বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সা.) বলেন, সেই সমস্ত নব্য আচার-অনুষ্ঠানের সাথে ধর্মের কোনই যোগসূত্র নাই যা ধর্ম থেকে দূরে ঠেলে দেয় আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর আদেশনিষেধের অসম্মান ও অবমাননার কারণ হয় এর সবটাই সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য আর এসবই নিরর্থক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার যোগ্য। সুতরাং এসব এড়িয়ে চল, কেননা তা ধর্মে নিত্যনতুন কথা বা বিদাতের সংযোজন করবে এবং ধর্ম বিকৃতির শিকার হবে। লক্ষ্য করে দেখ! অন্যান্য ধর্মগুলোতে কুপ্রথার অনুপ্রবেশ সেগুলোর বিকৃতি ঘটিয়েছে। অবশ্য এটাই হওয়ার ছিল। কেননা, এ যুগে কেবল আর কেবলমাত্র ইসলামেরই জীবিত থাকা অবধারিত। তবে পর্যবেক্ষণ করলে জানা যাবে, অন্যান্য ধর্মগুলো

যেমন খ্রিষ্টধর্মও এক ধর্ম, কিন্তু বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত খ্রিষ্টানরা স্ব স্ব দেশ বা অঞ্চলে প্রচলিত রীতিগুলোকে ধর্মেরই অংশ বানিয়ে বসেছে। আফ্রিকাতেও এমন বিষয় দৃষ্টিতে আসে। অতএব, ধর্মীয় কুসংস্কারের পথ খুলে গেলে নতুন নতুন সব কুপ্রথা ব্যাপকভাবে ধর্মে অনুপ্রবেশ করে। সে জন্যই মহানবী (সা.) এমন সব ধর্মীয় কুসংস্কার সৃষ্টিকারীদেরকে কঠোর ভাষায় সতর্ক করেছেন আর আল্লাহ্‌র ভয়ও দেখিয়েছেন খুব। এ বিষয়ে সত্যিই তিনি গভীর ভাবে উৎকণ্ঠিত থাকতেন।

হাদীসে এসেছে মহানবী (সা.) বলেন, "আমি তোমাদের কুপ্রথায় জড়ানো নিয়ে এবং তোমাদের স্থূল কামনাবাসনার শিকার হওয়ার কারণে অত্যন্ত ভীত। আমার আশংকা হয় যে, এর ফলে ধর্মের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়! তোমরা না আবার পথভ্রষ্ট হয়ে যাও।"

এখন আপনারা এখানে, এই পাশ্চাত্য সমাজে বসবাস করছেন। এখানে বহু রকম সামাজিক প্রথাদি রয়েছে, যা আপনাদেরকে ধর্ম থেকে দূরে ঠেলে দেয়ার এবং ইসলামের সৌন্দর্যপূর্ণ শিক্ষায় অমানিশা লেপনকারী কুপ্রথা। কেননা, পার্থিব চাকচিক্য আকর্ষণীয় হয়ে থাকে আর অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করে। এজন্য এই সমাজে অনেক ভেবেচিন্তে পা ফেলার প্রয়োজন রয়েছে। তাদের ঐসব ভ্রান্ত রীতিনীতির অনুসরণ করার পরিবর্তে ইসলামের সুন্দর শিক্ষা উপস্থাপন করা উচিত। প্রত্যেক আহমদীর চরিত্র এতটা সুদৃঢ় হওয়া চাই এবং এতই উন্নত আচার-আচরণ হওয়া উচিত, যাতে পশ্চিমা সমাজ এর ওপর নিজের প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ হয়। যেমন- ইসলামে নারীদেরকে পর্দা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নারীদের সম্মান এতেই নিহিত। পর্দা পালনের কারণে তাদের এক স্বতন্ত্র মর্যাদা পরিদৃষ্ট হয়। একজন মহিলা নিজে যখন পর্দা করবে আর এই পাশ্চাত্য সমাজে পর্দার সুফল বর্ণনা করবে, বাস্তবে তা হবে একজন পুরুষের পর্দার সুফল আর উপকারীতা বর্ণনা করার তুলনায় হাজার গুণ বেশি প্রভাব বিস্তারকারী। অতএব, যেসব মহিলা পর্দা করেন তাদের এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে তবলীগ করার সুযোগও বেশি লাভ হয়ে থাকে। এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। অনুরূপভাবে পশ্চিমা সমাজের আরও অনেক রোগব্যাধি রয়েছে, সেইসব কেবল এ কারণে গ্রহণ করবেন না যে, এই সমাজে আমরা বসবাস করছি, অপারগতা রয়েছে। এমনটা ভাবা হলে তা হবে অত্যন্ত ভয়ের ব্যাপার! উদাহরণস্বরূপ, আপনার যদি এমন এক ব্যক্তির সাথে

সখ্যতা থাকে যার মদ পান করার অভ্যাস আছে, আপনি তার সাথে রেষ্টুরেন্ট বা পানশালা ইত্যাদি জায়গায় চলে যান আর ভাবেন যে, ঠিক আছে, ওখানে গেলে সে না হয় মদ পান করবে আর আমি কফি বা অন্য কোন পানীয় পান করব– এটাও ভ্রান্ত রীতি। অনেক চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। কোন এক দিন আপনি তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে হয়ত নিজেই আগ বাড়িয়ে এক ঢোক পান করে নিবেন এরপর সেই বদঅভ্যাস ক্রমাগত বাড়তে থাকবে– আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া থাকবে এমনটি যেন না হয়। তাই এই হাদীসটি দৃষ্টিগোচর রাখবেন যাতে মহানবী (সা.) অনেক বেশি চিন্তাভাবনা করার কথা বলেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, "আমি তোমাদের সম্পর্কে যে বিষয়ে আশংকা করি, তা হলো সে সব কামনাবাসনা যা তোমাদের পেট ও তোমাদের লজ্জাস্থানে সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় সৃষ্ট পথভ্রষ্টতার বিষয়েও আমি শঙ্কিত।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২৩, বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেনঃ

যতক্ষণ পর্যন্ত এক ব্যক্তি সত্যিকারের চেষ্টাসাধনা ও পরিশ্রম না করে ততক্ষণ ইসলামে অন্তর্নিহিত সেই আধ্যাত্মিক তত্ত্বদর্শনের নাগাল সে পায় না, খোদাকে দেখার সৌভাগ্যও হয় না, যা অর্জন করতে পারলে পাপে জর্জরিত জীবনের অবসান ঘটে এবং মানুষ খোদাদর্শনের সৌভাগ্য লাভ করে আর তাঁর বাণী শুনতে পায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলেছেন–

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤١﴾ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى ﴿٤٢﴾

(সূরা নাযেআত, ৭৯:৪১-৪২)

অর্থাৎ, "কিন্তু যে তার প্রভু-প্রতিপালকের মাকাম মর্যাদাকে ভয় করে এবং নিজেকে কু-প্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে, নিশ্চয় জান্নাতই হবে (তার) আবাসস্থল।

বড় গলায় এক ব্যক্তির বলতে থাকা যে, আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ঈমান এনেছি; এটা সহজ কথা। অথচ এই দাবি করা সত্ত্বেও সেই ঈমানের কোন লক্ষণ বা সুফল কিছুই সৃষ্টি হয় না। এটি নিছক বাগাড়ম্বর, এমন লোকেরা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করে না আর আল্লাহ্ তা'লাও এদেরকে

মোটেই গ্রাহ্য করেন না।" (আল হাকাম, ৯ম খণ্ড, সংখ্যা ২৯, তারিখ ১৭ আগষ্ট, ১৯০৫, পৃষ্ঠা ৬)

তিনি (আ.) আরও বলেন:
"যে ব্যক্তি নিজের প্রভু-প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হতে ভয় পায় এবং নিজস্ব কামনাবাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করে চলে, তার ঠিকানা হলো জান্নাত। প্রবৃত্তির তাড়না প্রতিহত করাই হলো আল্লাহ্তে বিলীন হওয়া। এর দ্বারা মানুষ খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করে ইহজগতেই জান্নাতের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান লাভ করতে পারে।" (আল বদর, ১ম খণ্ড, ৩ আগষ্ট ১৯০৫, পৃষ্ঠা ২)

ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের পথপ্রদর্শক পবিত্র কুরআন

অতএব, কুপ্রথা ও কদাচার থেকে দূরে থাকা আর কুপ্রবৃত্তির তাড়না এড়িয়ে চলা ইসলামী শিক্ষামালার অংশ। ঐ শিক্ষাকে বুঝবার জন্য আমাদের পথপ্রদর্শক হলো পবিত্র কুরআন। অতএব, প্রত্যেক মু'মিন যদি প্রকৃতপক্ষে কুরআন শরীফকে পরিপূর্ণরূপে নিজের জীবনের কর্মনীতি হিসেবে অবলম্বন করে তাহলে যাবতীয় মন্দ আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। কোন প্রকারের মন্দ কামনাবাসনা হৃদয়ে বিরাজ করে না। কেননা, এটা সেই পবিত্র কিতাব, যা এক জীবনবিধান রূপে শরীয়তের পূর্ণতা সাধন করে মানব জীবনের জন্য সবকিছু পরিবেষ্টন করে, আল্লাহ্ তা'লাই মহানবী (সা.)-এর পবিত্র অন্তরে এটি নাযিল করেছেন। আবার যেখানে প্রয়োজন ছিল মহানবী (সা.) নিজের জীবনাচারে, নিজের কাজকর্মে আর নিজ কথায় তার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। এজন্য হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) তাগিদ দিয়ে বলেছেন, একে (পবিত্র কুরআন) শিরোধার্য কর।

এই প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন, হাদীস আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কতিপয় উদ্ধৃতি তুলে ধরছি–

"আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٨﴾

(আল কমর, ৫৪:১৮)

অর্থাৎ- নিশ্চয় আমরা কুরআনকে উপদেশ গ্রহণ (করার ও স্মরণ রাখার) জন্য সহজসাধ্য করে দিয়েছি। অতএব, আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী?"

হাদীসে এসেছে:
হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) বলেছেন, 'এমন মু'মিন, যে পবিত্র কুরআন পাঠ করে আর এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, সে এক কমলালেবুর মত, যার স্বাদও মজাদার আর গন্ধও সুবাসযুক্ত। আরেক মু'মিন যে কুরআন পাঠ করে না, কিন্তু এর নির্দেশনা অনুসারে চলে, সে সেই খেজুরের ন্যায় যার স্বাদতো সুমিষ্টই হয় কিন্তু সুগন্ধি থাকে না। আবার কুরআন পাঠকারী মুনাফেক (কপট বিশ্বাসী) এর উপমা হলো রাইহানের (পুদিনাজাতীয় গুল্ম) ন্যায়, যার সুবাস হয় আকর্ষণীয় কিন্তু স্বাদে তিক্ত বিস্বাদময়। আর কুরআন পাঠ না-কারী মুনাফেকের উপমা হলো কলোসিন্থের (স্বাদে তিক্ত এক প্রকার কুমড়াতুল্য ফল) ন্যায়, যার স্বাদও তিক্ত আর গন্ধও অসহনীয়'।" (বুখারী, কিতাবু ফাযায়েলে কুরআন, বাব ইসমু মান রায়া বেকিরয়াতিল কুরআনে...)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন:
"...পবিত্র কুরআন গভীর প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ এবং শিক্ষার সকল শাখায় প্রকৃত পুণ্যের শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে বাইবেলের তুলনায় অগ্রবর্তী ধাপে অবস্থান করছে। বিশেষ করে, সত্য ও পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে 'খোদাদর্শন-এর প্রদীপ' পবিত্র কুরআনই ধারণ করে আছে। পৃথিবীতে যদি এর আগমন না হতো তবে আল্লাহ্-ই জানেন সৃষ্টিপূজারীর সংখ্যা কততে গিয়ে ঠেকতো! অতএব, এটা কৃতজ্ঞ থাকার বিষয়, আল্লাহ্র একত্ব, পৃথিবী থেকে যা হারিয়ে গিয়েছিল তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে।" (তোহ্ফা কায়সারিয়া, রূহানী খাযায়েন, ১২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮২)

পবিত্র কুরআনেই তোমাদের জীবন নিহিত

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

"কুরআন শরীফকে পরিত্যক্ত জিনিসের মত ফেলে রেখো না, কারণ এতেই তোমাদের জীবন নিহিত। যারা কুরআনকে সম্মান দান করবে তারা আকাশে সম্মান লাভ করবে। প্রত্যেক হাদীস ও উক্তির ওপর যারা কুরআনকে প্রাধান্য দান করবে, আকাশে তাদেরকে প্রাধান্য দেয়া হবে। মানবজাতির জন্য জগতে

আজ কুরআন ব্যতীত কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং সকল আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) ভিন্ন কোন রসূল ও শাফী' (সুপারিশকারী) নাই।" (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আরও বলেন:
"পবিত্র কুরআন নিজস্ব আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যে আর স্বকীয় জ্যোতিতে এর সত্যিকার অনুসারীদেরকে নিজ পানে আকর্ষণ করে তাদের অন্তর জ্যোতির্ময় করে তুলে। আবার বড় বড় উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে খোদা তা'লার সাথে তাদের এমন গভীর সম্পর্ক গড়ে দেয়, যা কেটে টুকরো টুকরো করতে পূর্ণ-সক্ষম তরবারির আঘাতেও ছিন্ন হতে পারে না। তা অন্তর্চক্ষু খুলে দেয়, পাপের পূতিগন্ধময় প্রস্রবণকে বন্ধ করে দিয়ে খোদা তা'লার সাথে সুমিষ্ট বাক্যালাপের সম্মান দান করে আর অদৃশ্যের জ্ঞানও তাকে দান করে। নিজ বাণীর মাধ্যমে খোদা তার দোয়া গৃহীত হওয়ার বিষয়ে অবহিত করেন। প্রত্যেকেই, যারা সেই ব্যক্তির বিরোধিতা করে, যে কুরআন করীমের সত্যিকার অনুসরণকারী, খোদা তা'লা নিজের ভীতিকর নিদর্শনের দ্বারা তার কাছে প্রকাশ করে দেন যে, তিনি তাঁর সেই বান্দার সাথে রয়েছেন, যে তাঁর পবিত্র কালামের আজ্ঞানুবর্তীতা করে।" (চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, ২৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৮-৩০৯)

অন্যত্র তিনি (আ.) আরও বলেন:
"সুতরাং, তোমরা সাবধান থাক এবং খোদা তা'লার শিক্ষা ও কুরআনের অনুশাসনের বিরুদ্ধে এক পা-ও আগে বাড়িও না। আমি সত্য-সত্যই বলছি, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাত শত বিধিবিধানের মধ্যে একটি ছোট্ট নির্দেশকেও লঙ্ঘন করে, সে নিজ হাতে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করেছে আর অবশিষ্ট সবই ছিল এর প্রতিচ্ছবি।

তোমরা কুরআন শরীফ গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ কর এবং এর সাথে প্রগাঢ় ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন কর, এরূপ ভালোবাসা যা অন্য কারো সাথে তোমরা কর নাই। কেননা, খোদা তা'লা আমাকে সম্বোধন করে যেমনটি বলেছেন, **আল খায়রু কুল্লুহু ফিল কুরআন** অর্থাৎ 'সর্বপ্রকার মঙ্গল কুরআন শরীফে নিহিত', এ কথাই সত্য। আফসোস! সেই লোকদের জন্য, যারা কুরআন শরীফের ওপর অন্য কোনকিছুকে প্রাধান্য দেয়। কুরআন শরীফ তোমাদের সকল সফলতা ও মুক্তির উৎস। তোমাদের ধর্মসম্বন্ধীয় এমন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নাই, যা কুরআন শরীফে পাওয়া যায় না। 'কিয়ামত' দিবসে

কুরআন শরীফই তোমাদের ‘ঈমানের’ সত্যাসত্যের মানদণ্ড হবে। কুরআন শরীফ ব্যতীত আকাশের নীচে অন্য কোন গ্রন্থ নাই, যা কুরআন শরীফের সাহায্য গ্রহণ না করে তোমাদেরকে ‘হেদায়াত’ দান করতে পারে।

খোদা তা’লা তোমাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন যে, কুরআন শরীফের ন্যায় ধর্মগ্রন্থ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমাদেরকে আমি সত্য-সত্যই বলছি, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদেরকে দান করা হয়েছে তা যদি খ্রিষ্টানদেরকে দেয়া হতো, তাহলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো না। এই যে হেদায়াত ও নেয়ামত তোমাদেরকে দান করা হয়েছে, তা যদি ইহুদীদেরকে তওরাতের বদলে দেয়া হতো, তাহলে তাদের কোন কোন ফেরকা কিয়ামতের অস্বীকারকারী হতো না। সুতরাং, তোমরা এই নেয়ামতের মর্যাদা উপলব্ধি কর। এটা অতি প্রিয় নেয়ামত। এটা এক মহা সম্পদ। যদি কুরআন শরীফ অবতীর্ণ না হতো, তাহলে দুনিয়া এক অপবিত্র মাংসপিণ্ডের ন্যায় রয়ে যেতো। কুরআন শরীফ এমন এক গ্রন্থ, যার তুলনায় অন্য সকল হেদায়াতই তুচ্ছ।” (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬-২৭)

অতএব, আমাদের প্রত্যেকের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যে, সে পবিত্র কুরআনকে কতটা ভালোবাসে, এর বিধিনিষেধ কতটা মেনে চলে আর এর শিক্ষা অনুসরণের চেষ্টা করে। ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশেরও বিভিন্ন রীতি রয়েছে। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা প্রত্যেক আহমদীকে নিজের ওপর বাধ্যতামূলক করে নেয়া উচিত, তা হলো বিনা ব্যতিক্রমে রীতিমত অন্তত দুই-তিন রুকু অবশ্যই তেলাওয়াত করা, পরবর্তী ধাপে অনুবাদ পাঠ করা আর প্রতিদিন তেলাওয়াত করার সাথে সাথে যদি অনুবাদ পাঠ করা হয়, তাহলে এই সৌন্দর্যময় শিক্ষা ধীরে ধীরে নিজের অজান্তেই মস্তিষ্কে গ্রথিত হতে শুরু করবে।

এই ৬ষ্ঠ শর্তে আরো একটি বিষয় হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, তাহলো আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশাবলী নিজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্মপন্থা হিসেবে সামনে রাখবে, যখনই প্রয়োজন দেখা দিবে তা থেকে দিকনির্দেশনা নিবে। এটা কেবলমাত্র বুলিসর্বস্ব কোন কথা নয়, এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার জন্য মানুষ যদি চিন্তা করে, তাহলে সত্যিই এটি মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। কেননা, আল্লাহ্ তা’লা বলেছেন−

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝٦٠

(সূরা আন-নিসা, ৪:৬০)

অর্থাৎ, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের কর্তৃপক্ষেরও (আনুগত্য কর)। কিন্তু (কর্তৃপক্ষের সাথে) কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ করলে সে বিষয়টি আল্লাহ্ ও রসূলের সমীপে উপস্থাপন কর, (সত্যিকার অর্থে) যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখ। এ হলো সর্বোত্তম (পন্থা) এবং পরিণামের দিক থেকে সবচেয়ে ভালো।"

পুনরায় তিনি (আল্লাহ্ তা'লা) বলেছেন:

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝١٣٣

(সূরা আলে ইমরান, ৩:১৩৩)

অর্থাৎ, "আর তোমরা আল্লাহ্ এবং এ রসূলের আনুগত্য কর, যেন তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।"

আল্লাহ্ তা'লা আরও বলেন,

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ۭ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ
بَيْنِكُمْ ۠ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝٢

(সূরা আনফাল, ৮:২)

অর্থাৎ, "তারা তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। তুমি বল, 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের।' অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং তোমাদের নিজেদের মাঝে (বিরোধের) নিষ্পত্তি করে নাও। আর তোমরা মু'মিন হয়ে থাকলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর।"

এখানে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, আমার নির্দেশসমূহ সঠিকভাবে পালন কর, তা কাজে রূপায়িত কর। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঐসব নির্দেশাবলীর যে অর্থ করেছেন, সেই অনুযায়ী ব্যবহারিক পদক্ষেপ নাও। তোমাদের মধ্যে যেসকল আমীর নিযুক্ত রয়েছেন এবং যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে,

তার সম্পূর্ণরূপে আনুগত্য কর; তবেই বলা যায় যে, তোমরা বয়আতের প্রতিশ্রুতি রক্ষার দায়িত্ব পালন করেছো।

এই প্রসঙ্গে আমি কতিপয় হাদীসও উদ্ধৃত করছি–
হযরত আবাদা বিন সামিত (রা.) বর্ণনা করেন, "আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বয়আত এই প্রতিশ্রুতির সাথে করেছি যে, মনঃপুত হোক আর অপছন্দই হোক সর্বাবস্থায় তাঁর নির্দেশ মানবো এবং তাঁর আনুগত্য করবো?" (বুখারী, কিতাবুল আহকাম, বাব কায়ফা ইউবাই-উল ইমামুন্নাস)

আব্দুর রহমান বিন উমরুল সালমি ও হযরত হাজর বিন হেজাজ বর্ণনা করেন, তারা আরবাজ বিন মারয়া (রা.)-এর কাছে এলে, তিনি (রা.) বলেন, "একদিন হুযূর (সা.) আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ালেন, অতঃপর তিনি (সা.) বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষায় আমাদেরকে উপদেশ দান করলেন, যার প্রভাব ছিল সুগভীর, এতে লোকদের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে আর অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়। উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এটা তো বিদায় ভাষণ মনে হচ্ছে। আপনার উপদেশটি কী? তিনি (সা.) বলেন, আমার উপদেশ হলো, তোমাদের আমীর এক হাবশী গোলামই হোক, আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, তার কথা মানো আর আনুগত্য কর। কেননা, এমন যুগ আগত যে, আমার পরে তোমাদের কেউ জীবিত থাকলে অনেক বড় বড় মতভেদ দেখবে, সংকটময় ঐ অবস্থায় আমার এবং আমার হেদায়াদপ্রাপ্ত খলীফাদের অর্থাৎ, খোলাফায়ে রাশেদীনগণের সুন্নতের অনুসরণ কর আর তা আঁকড়িয়ে রেখো, যদি দাঁত দিয়ে তা কামড়ে ধরে রাখতে হয় তাও করো। তোমাদেরকে ধর্মে নতুন কথা উদ্ভাবন করা এড়িয়ে চলতে হবে। কেননা, ধর্মের নামে যে নতুন প্রথা চালু হয়, তা বিদা'ত আর বিদা'ত পুরোটাই পথভ্রষ্টতা।" (তিরমিযী, কিতাবুল ইলম, বাবুল আখেজ বিস্‌সুন্নাত, আবু দাউদ, কিতাবুল সুন্নাত, বাব লুযুমুস্ সুন্নাহ)

মহানবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ আর ঈমানের দাবিকারক আমরা, যারা আহমদী, তাদেরকে সর্বদা এই উপদেশ আর এই হাদীসটি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত।

অনুরূপভাবে আরেক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, যার ভেতর তিনটি বিষয় থাকবে সে ঈমানের স্বাদ পাবে। প্রথমত আল্লাহ্ ও রসূল (সা.) অন্য সকল সত্তার চেয়ে তার কাছে

অধিকতর প্রিয় হবে, দ্বিতীয়ত কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে সে কাউকে ভালোবাসবে, তৃতীয়ত হলো কুফরে ফেরত আসাকে সে এতটাই অপছন্দ করবে, আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে সে যতটা অপছন্দ করে"। (বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব হালাওয়াতুল ঈমান)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেনঃ
"দেখ! আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

(আলে ইমরান, ৩:৩২)

অর্থাৎ, 'তুমি বল, তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালোবাস তাহলে তোমরা আমাকে অনুসরণ কর। (এমনটি হলে) আল্লাহ্ও তোমাদের ভালোবাসবেন।'

খোদাপ্রেমী হওয়ার জন্য কেবলমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণই একমাত্র পথ। আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই যা তোমাদেরকে খোদা তা'লার সাথে মিলিত করবে। মানুষের পরম আকাঙ্খা হওয়া উচিত শুধুমাত্র সেই অদ্বিতীয় এক খোদার অন্বেষী হওয়া, শির্ক ও বিদা'ত পরিত্যাগ করা, কুসংস্কার ও কামনাবাসনার দাসত্ব পরিত্যাগ করা। দেখ, আমি আবারও বলছি, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রকৃত অনুসরণের পথ ছাড়া অন্য কোন ভাবেই মানুষ সফলতা লাভ করতে সক্ষম হবে না।

আমাদের জন্য কেবল একজন রসূলই রয়েছেন আর কেবলমাত্র একটাই পবিত্র কুরআন সেই মহান রসূল (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। যার পূর্ণ অনুসরণে আমরা খোদাকে লাভ করতে পারি। আজকাল পীর-ফকিরদের আবিষ্কৃত পদ্ধতি এবং গদ্দীনশিন, সাজ্জাদনসিনদের উদ্ভাবিত দোয়াদরূদ, অজিফা, এসব মানুষকে সরল সঠিক পথ থেকে হটানোর মাধ্যম মাত্র। অতএব, তোমরা সেইসব পরিহার কর। এইসব লোকেরা মহানবী (সা.)-এর খাতামুল আম্বিয়া হওয়ার সীলমোহরকে ভঙ্গ করার দূরভিসন্ধি এঁটেছে অথবা নিজেরা পৃথক এক শরীয়ত বানিয়ে নিয়েছে। তোমরা স্মরণ রেখো, কুরআন শরীফ ও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশাবলীর আনুগত্য আর নামায, রোযা ইত্যাদি যেসব নির্ধারিত পদ্ধতি রয়েছে এর বাইরে খোদার কৃপাভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য কোন চাবি নেই। যে এসব পথ ছেড়ে দিয়ে ভিন্ন কোন পথ খুঁজছে, সে পথ ভুলে গেছে। অকৃতকার্য হয়েই মরবে সে, যে আল্লাহ্ ও তাঁর

রসূল (সা.)-এর আদেশের মান্যকারী পথে নয় বরং ভিন্ন সব পথে তাঁকে অন্বেষণ করে।” (মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০২-১০৩, নব সংস্করণ)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) অন্যত্র আরও বলেন:
“দেখ! আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

(আলে ইমরান, ৩:৩২)

অর্থাৎ, ‘তুমি বল, তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালোবাস তাহলে তোমরা আমাকে অনুসরণ কর। (এমনটি হলে) আল্লাহ্ও তোমাদের ভালোবাসবেন।’

আল্লাহ্ তা’লাকে খুশি করার জন্য একমাত্র পদ্ধতি হলো মহানবী (সা.)-এর সত্যিকারের আনুগত্য করা। দেখা যায় যে, লোকেরা বিভিন্ন প্রকারের কুপ্রথায় লিপ্ত। কেউ মারা গেলে বিভিন্ন প্রকারের কদাচার আর কুপ্রথার অনুসরণ করা হয়। অথচ তাদের উচিত, মৃতের জন্য দোয়া করা। সামাজিক কুপ্রথার অনুসরণে মহানবী (সা.)-এর কেবল বিরুদ্ধাচরণই করা হচ্ছে না বরং তাঁর (সা.) অবমাননাও করা হচ্ছে আর তা এভাবে যে, মহানবী (সা.)-এর বাণীকে যথেষ্ট মনে করা হচ্ছে না। যদি যথেষ্ট মনে করত, তাহলে নিজেদের মনগড়া আচার অনুষ্ঠান বানিয়ে নেয়ার প্রয়োজন কেন পড়বে?” (মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৬, নব সংস্করণ)

তিনি (আ.) আরো বলেন:
“কাজেই কষ্টে হোক আর স্বাচ্ছন্দ্যেই হোক এই ক্ষণভঙ্গুর ইহজীবন তো কেটেই যাবে, কিন্তু পরকালের বিষয় বড়ই কঠিন, তা চিরস্থায়ী-চিরবিরাজমান স্থান আর তার শেষও নেই। অতএব, সে স্থানে যদি সে এই অবস্থায় যায় যে, খোদা তা’লার সাথে সম্পর্ক স্বচ্ছ, আল্লাহ্ তা’লার ভয় তার অন্তরে সর্ববিরাজমান এবং এমন প্রত্যেক প্রকারের পাপ থেকে সে মুক্ত যেগুলোকে আল্লাহ্ তা’লা পাপ আখ্যায়িত করেছেন, তাহলে খোদা তা’লার আশিস তার সমর্থনে থাকবে। আর সে, সেই মর্যাদায় আসীন থাকবে যেখানে খোদা তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন আর সে-ও নিজ প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। আর এমনটা যদি না করে বরং বেপরোয়াভাবে নিজ জীবন অতিবাহিত করে তাহলে তার পরিণাম ভয়াবহ। এই জন্য বয়আত করা কালে এই সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত যে, বয়আতের উদ্দেশ্য কী আর কিভাবে এর সুফল লাভ হবে। কেবল

যদি জাগতিকতার জন্যই বয়আত করা হয় তবে তা নিরর্থক। কিন্তু ধর্মের জন্য, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য যদি হয়, তা হলে এমন বয়আত কল্যাণময় আর তা বয়আতের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে থাকে সমৃদ্ধ। আর এর মাধ্যমে সেই সব ঐশী কল্যাণ ও আশিসের পূর্ণ আশা রাখা যেতে পারে, যা সত্যিকারের বয়আতে লাভ হয়ে থাকে।" (মলফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪২)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ যুগের ইমাম হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কবুল করার তৌফিক দান করুন। যে বেদনা নিয়ে গভীর আন্তরিকতার সাথে তিনি (আ.) আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর রাজত্বকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজ জামা'তকে প্রস্তুত করতে চেয়েছেন আর যে মমতার সাথে উপদেশ দান করেছেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তেমনটাই বানিয়ে দিন। যে শর্তাবলীর ভিত্তিতে তিনি (আ.) আমাদের থেকে বয়আতের অঙ্গীকার নিয়েছেন, আমরা যেন তার পরিপূর্ণ মান্যকারী হই, একে কর্মে রূপায়নকারী হই এবং সর্বদা সেইসব অঙ্গীকারকে নিজেদের সামনে রেখে চলি। আমাদেরকে কোন কর্ম, কোন কাজ হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষার বিপরীতে চলার দোষে যেন দোষী সাব্যস্ত করতে না পারে। আমরা যেন সর্বদা আত্মবিশ্লেষণে রত থাকি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সাহায্য করুন। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আজ দোয়ার পর এই জলসার সমাপ্তি ঘটবে। এই জলসার কল্যাণ ও আশিসে আপনারা সারা বছর বরং জীবনভর উপকৃত হোন এটিই আমার দোয়া।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের বংশধরদের মধ্যেও আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের (সা.), মসীহ্ মওউদ (আ.) আর খেলাফতের সাথে আনুগত্যপূর্ণ ভালোবাসার সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত রাখুন। আমাদের অতীতের দুর্বলতাসমূহ আর পাপসমূহ ঢেকে রেখে আমাদের তিনি ক্ষমা করুন। আমাদেরকে কেবল আর কেবলমাত্র তাঁরই অনুগ্রহে তাঁর প্রিয়দের জামা'তভুক্ত রাখুন। হে খোদা! তুমি গাফুরুর রাহীম, আমাদের পাপসমূহ মার্জনা কর, আমাদের প্রতি কৃপা কর, নিজ ক্ষমা এবং করুণার চাদর দ্বারা আমাদেরকে আচ্ছাদিত করে নাও। আমাদেরকে কখনই তোমা থেকে পৃথক করো না। আমীন! ইয়া রাব্বাল আ'লামীন! (হে জগতসমূহের প্রভু-প্রতিপালক আমাদের দোয়া কবুল কর!) (সমাপ্তি ভাষণ, জলসা সালানা জার্মানি, ২৪ আগষ্ট, ২০০৩)

বয়আতের সপ্তম শর্ত

অহংকার ও দম্ভ সর্বতোভাবে বর্জন করবে। নম্রতা, বিনয়, সদাচরণ, সহনশীলতা ও দীনতার সাথে জীবনযাপন করবে।

(জুমুআর খুতবা, ২৯ আগষ্ট, ২০০৩ ফ্রাঙ্কফোর্ট জার্মানি, এই খুতবায় হুযূর বয়আতের ৭ম ও ৮ম শর্তের ওপর বিশদ ব্যাখ্যাসহ আলোকপাত করেন)

শির্কের পর অহংকারের ন্যায় বড় আর কোন পাপ নেই

অহংকার প্রদর্শনের পর সূচনাতেই শয়তান যেহেতু এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় যে, আমি চুড়ান্ত চেষ্টা চালাবো আর মানুষকে আল্লাহ্‌র বান্দায় পরিণত হতে দেব না। বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষকে এই জালে এমনভাবে ফাঁসাবো যে, তার হাতে সৎকর্ম সম্পাদিত হয়ে গেলেও সে প্রকৃতিগতভাবে সেসব নিয়ে আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত হবে আর এই আত্মম্ভরিতা ও গর্ব তাকে ধীরে ধীরে অহংকারের দিকে নিয়ে যাবে। এই অহংকার শেষ পর্যন্ত তাকে সেই (কৃত) সৎকর্মের পুণ্য থেকে বঞ্চিত করে দেবে। কেননা, শয়তান প্রথম দিনই এই সিদ্ধান্ত করে নিয়েছে যে, মানুষকে সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেই ছাড়বে। আর সে নিজেই তো অহংকারের কারণে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অমান্য করেছিল।

অতএব, এটা সেই অস্ত্র যা শয়তান বিভিন্ন অজুহাতে মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। যারা আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত বান্দা হয়ে থাকে, ইবাদতে যারা একনিষ্ঠ হয়ে এই আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে চলে; রহমান খোদার এমন বান্দা ছাড়া অন্যদের সচরাচর এই অহংকারের মাধ্যমেই শয়তান নিজ করায়ত্তে আনতে সক্ষম হয়। এটা এমন এক বিষয় যাকে তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়, আমরা বয়আত গ্রহণকালে শর্ত প্রতিপালন করার অঙ্গীকার করে নিয়েছি যে, 'অহংকার করবো না। আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন করব না।' এসব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করব। এটা এত সহজ কাজ নয়। কারণ এর বহু

প্রকারভেদ রয়েছে। মানব জীবনে বিভিন্নভাবে শয়তান আক্রমণ করতেই থাকে। পরম সাবধানতার প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কেবল আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহেই এ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এজন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি অর্জন করার জন্য এই ৭ম শর্তে এক উপায় বাতলিয়েছেন।

তিনি (আ.) বলেন, "যখন তোমরা অহংকারের অভ্যাস পরিত্যাগ করবে তোমাদের মধ্যে এক শূন্যতা সৃষ্টি হবে। বিনয় ও নম্রতার মাধ্যমে যদি তা পূর্ণ না কর তাহলে অহংকার পুনরায় আক্রমণ চালাবে, এজন্য বিনয় অবলম্বন কর। কেননা, আল্লাহ্ তা'লার পছন্দের পথ এটাই।" তিনি (আ.) স্বয়ং এই বিনয়কে সেই উচ্চমানে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন যার কোনই দৃষ্টান্ত নাই, তবেই তো আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর (আ.) প্রতি ইলহাম করে বলেছেন, **'তেরি আজ্যানা রাহেঁ উসকো পছন্দ আয়ি'** (তোমার বিনয়াবনত পন্থা তাঁর পছন্দ হয়েছে।)

অতএব, আমরা যারা তাঁর (আ.) হাতে বয়আতের দাবিদার, তাঁকে (আ.) যুগ-ইমাম হিসাবে মান্য করি, আমাদের এই বৈশিষ্ট কী পরিমান অবলম্বন করা উচিত! মানুষের এমনিতেই সত্তাগত এমন কোন অবস্থানই নেই যে, সে অহংকার দেখাবে, বুক ফুলিয়ে চলবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন–

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝٣٨

(সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৩৮)

অর্থাৎ, "আর পৃথিবীতে দম্ভভরে চলো না। কেননা, তুমি কখনো পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় পর্বতসমও হতে পারবে না।"

এই আয়াত থেকে যা সুস্পষ্ট হয়, তা হলো মানুষের তো কোনই মর্যাদা নাই, তাহলে অহংকারের কারণটি কী! কতিপয় লোক নিজেদেরকে যুগের বাদশাহ্ মনে করে আর নিজের গণ্ডির বাইরে মিশতেই চায় না। নিজ পরিমণ্ডলে বসে থেকে ভাবে আমরা বড়ই করিৎকর্মা।

এসংক্রান্ত একান্ত ছোট্ট একটি দৃষ্টান্ত আমি তুলে ধরছি। পারিবারিক জীবনের

যে পরিমণ্ডল, আপনার ঘরের সেই পরিবেশকেই নিন। কতিপয় পুরুষ নিজ বাড়িতে নিজের স্ত্রী-সন্তানদের সাথে এমন নির্দয় ব্যবহার করে যে, অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। কোন কোন মেয়েরা লিখে জানায় যে, শৈশব থেকে এখন আমরা সাবালিকা বয়সে উপনীত হয়েছি, আমাদের আর সহ্য হয় না। আমাদের বাবা মায়ের সাথে আর আমাদের সাথে সব সময় নির্যাতনমূলক আচরণ করে আসছেন। বাবা গৃহে প্রবেশের সাথে সাথেই আমরা ভয়ে নিজ নিজ কক্ষে চলে যাই। আমাদের মা বা আমরা, বাবার সামনে কখনও তার পছন্দের বাইরে কোন মতামত ব্যক্ত করলেই বাবা এমনই অত্যাচারী যে, সবার ওপর চড়াও হয়ে যায়। অতএব, অহংকারই এমন বাবাদেরকে চরম সীমায় পৌঁছিয়েছে। বেশিরভাগ এমন মানুষ, বাইরে নিজেদের ভাবমূর্তি খুব ভালোই রাখে, বাইরের লোকেরা ভাবে তার মত ভদ্র মানুষই হয় না। আর বাইরের লোকদের সাক্ষ্যও তাদেরই সপক্ষে থাকে। কতিপয় এমনও মানুষ আছেন, আচারব্যবহারে যারা গৃহের অভ্যন্তরে আর বাইরে এক-অভিন্ন রকমের, তাদেরতো সবটাই প্রকাশিত। সে সকল পিতা, সন্তানদের মা অথবা বোন বা তাদের নিজেদের সাথে যা করেছে, অমন দুরাচারী ও অহংকারী মানুষের সন্তানেরাও, বিশেষভাবে ছেলেরা যৌবনে উপনীত হলে, এই নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বাবার মুখোমুখি হয়ে যায় আর এমন এক সময়ও আসে বাপ যখন নিজের বয়সের ভারে দুর্বল হয়ে পড়ে তখন তার (পিতার) ওপর বিশেষ প্রতিশোধ নিয়ে থাকে। অহংকারী স্বভাবের লোকদের নিজেদের গণ্ডিতে এমন দৃষ্টান্ত অহরহ দেখা যায়। সমাজের বিভিন্ন গণ্ডি ও পরিমণ্ডল রয়েছে। এক, গৃহাভ্যন্তরের গণ্ডি আরও রয়েছে বাইরের পরিমণ্ডল। স্ব স্ব গন্ডিতে পর্যবেক্ষণ করলে অহংকারের এসব দৃষ্টান্ত আপনার সামনে আসতে থাকবে।

আবার এর চরম রূপ দৃশ্যমান হয় বৃহত্তর পরিসরে, যেখানে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠি, রাষ্ট্র আর সরকার উন্নাসিকতার কারণে নিজেদের থেকে অন্যকে নিচু মনে করে। দরিদ্র দেশ ও জাতিগুলোকে নিজেদের জুতোর তলায় পিষে রাখতে চায়। আজকের বিশ্বে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার একটি প্রধান কারণ এটিই। এই অহংকারের অবসান ঘটলে বিশ্বে ঝগড়াবিবাদও মিটে যাবে। তবে এসব অহংকারী জাতি ও সরকারগুলো বুঝতে পারছে না যে, আল্লাহ্ তা'লা অহংকারীদের অহংকারকে যখন পদদলিত করেন তখন তাদের চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায় না।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন–

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٩﴾

(সূরা লুকমান, ৩১:১৯)

অর্থাৎ, "আর (অহংকারবশে) মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং ঔদ্ধত্যের সাথে পৃথিবীতে চলাফেরা করো না। আল্লাহ্ কোন অহংকারী (ও) দাম্ভিককে পছন্দ করেন না।"

এই আয়াত থেকে প্রকাশ পায়, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বলছেন, দম্ভভরে এমন অহংকারের সাথে চলাফেরা করো না। অহংকারী লোকদের এক বিশেষ অঙ্গভঙ্গি হয়ে থাকে, তারা ঘাড় সটান করে চলাফেরা করে, যা আল্লাহ্ তা'লার সম্পূর্ণরূপে অপছন্দনীয়। কোন কোন লোকের অভ্যাস, নিজের চেয়ে অধঃস্তন লোকদের সামনে ঘাড় উঁচিয়ে থাকে আর নিজের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সামনে পরম বিনয়াবনত ব্যবহার করে। এমন লোকদের পক্ষ থেকে কপটতার (মন্দ) স্বভাব প্রকাশ পেয়ে থাকে।

অতএব, এই যে অহংকার তা অনৈতিক ব্যধিতে পর্যবসিত হয় এবং সৎকর্মে উন্নতি করার পথ ক্রমান্বয়ে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়, আবার ধর্ম থেকেও দূরে নিয়ে যায়। জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথেও দূরত্ব বেড়ে যায়। অহংকার বৃদ্ধির পাশাপাশি তারা আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর নৈকট্য থেকে এবং খোদার কল্যাণরাজি থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়।

হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে:
হযরত যাবের (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) বলেন, 'কেয়ামত দিবসে তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় আর সবচেয়ে নৈকট্যপ্রাপ্ত হবে সেইসব লোকেরা, যারা সর্বোত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য আর আমার থেকে সবচেয়ে দূরে থাকবে 'ছরছার' বা নোংরাভাষী ও অপলাপকারীরা এবং মুতাসাদ্দিক বা যারা গাল ফুলিয়ে কথা বলে আর মুতাফাইহিক'। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! ছরছার আর মুতাসাদ্দিক-এর অর্থ তো আমরা জানি, তবে মুতাফাইহিক কারা'? তিনি (সা.) জবাবে বললেন, 'মুতাফাইহিক হলো তারা, যারা

আত্মম্ভরিতা, অহংকার ও ঔদ্ধত্যের সাথে কথা বলে'।" (তিরমিযী, আবওয়াবুল বির্‌রে ওয়া সিলাহ, বাব ফি মামালিল আখলাক)

অপর এক হাদীসে রয়েছেঃ

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) বলেছেন, 'প্রত্যেক পাপের মূলে রয়েছে ৩টি বিষয়– তা থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত, প্রথমত অহংকার থেকে বাঁচো। কেননা, অহংকারই শয়তানকে আদমের সেজদা (মান্য) না করার বিষয়ে প্ররোচিত করেছে। দ্বিতীয়ত লোভ সংবরণ করো। কেননা, এই লোভই আদম (আ.)-কে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেতে উসকিয়ে দিয়েছে। তৃতীয়ত হিংসা থেকে বাঁচো। কেননা, এই হিংসার কারণেই আদমের দুই পুত্রের মধ্য থেকে একজন নিজের ভাইকে হত্যা করেছে'?" (আর রিসালাহ, আল কুশাইরিয়া, বাব আল হাসাদু, পৃষ্ঠা ৭৯)

অপর একটি হাদীসঃ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) বলেছেন– 'যার অন্তরে সামান্য পরিমাণও অহংকার থাকবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দিবেন না'। এক ব্যক্তি নিবেদন করলো, 'হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)! মানুষ চায় তার পোশাক-পরিচ্ছদ সুন্দর হোক, জুতা ভালো দেখাক আর তাকে দেখতে সুন্দর লাগুক'। তিনি (সা.) বললেন, 'এটা অহংকার নয়'। এরপর তিনি (সা.) আরো বললেন, 'আল্লাহ্ তা'লা পরম সুন্দর, সৌন্দর্য তিনি পছন্দ করেন। প্রকৃত অহংকার হলো, এক অহংকারী মানুষ সত্যকে অস্বীকার করতে শুরু করে, অন্যদেরকে নীচু জ্ঞান করে, তাদেরকে হীন দৃষ্টিতে দেখে আর তাদের সাথে মন্দ আচরণ করে'।" (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, তাহরীমীল কিবর ওয়া বায়ানেহ)

আরও একটি হাদীসেঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, "রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'জাহান্নাম ও জান্নাতের পরস্পরের মধ্যে তর্কবিতর্ক হবে। জাহান্নাম বলবে, আমার ভেতর বড় বড় স্বৈরাচারী ও অহংকারী লোকেরা প্রবেশ করে আর জান্নাত বলতে শুরু করবে যে, আমার মাঝে দুর্বল আর দীনহীনরা প্রবেশ করে। এতে আল্লাহ্ তা'লা জাহান্নামকে বলবেন– তুমি আমার শাস্তির প্রকাশস্থল, যাকে আমি চাই তোমার মাধ্যমে শাস্তি দিয়ে থাকি এবং জান্নাতকে তিনি (আল্লাহ্) বলবেন– তুমি আমার কৃপার বিকাশস্থল, আমি যাকে চাই তোমার মাধ্যমে কৃপাবর্ষণ করি। আর তোমরা উভয়েই তোমাদের প্রাপ্য অংশ পুরোপুরি পাবে'।" (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল জান্নাত, ওয়া সিফাতি নিয়ামেহা ওয়া আহ্‌লেহা)

প্রত্যেক আহমদী বিনয়, নম্রতা আর সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার কৃপাদৃষ্টি লাভকারী হবেন, আল্লাহ্ তা'লার জান্নাতে প্রবেশকারী হবেন আর প্রতিটি গৃহ অহংকারের পাপ থেকে পবিত্র থাকবে– আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই দোয়াই থাকবে।

অন্য এক হাদীসে:
হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহ্ আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, "মহানবী (সা.) বলেন, 'মান-সম্মান হলো মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্র পোশাক এবং মহানুভবতা ও বিশালত্ব হলো তাঁর চাঁদর। আল্লাহ্ তা'লা বলেন– অতএব, যে কেউ আমার থেকে এইসব ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করবে আমি তাকে শাস্তি দিব'।" (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল বির্‌রে ওয়াস সিলাহ)

অহংকারীরা কখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে না

অতএব, অহংকার শেষ পর্যন্ত মানুষকে খোদা তা'লার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। খোদা তা'লার অংশীবাদীদের আল্লাহ্ তা'লাই যখন বলেন 'ক্ষমা করবো না' তবে যে নিজেই খোদা হওয়ার দাবিদার সাজে তার কী করে ক্ষমা লাভ হতে পারে? এই অহংকারই তো ছিল, যা বিভিন্ন সময়ে ফেরাউনি বৈশিষ্ট্যের মানুষ সৃষ্টি করেছে আর এমন ফেরাউনদের পরিণাম আপনারা পাঠও করেছেন; এই যুগেও তা দেখেছেন। এটি সত্যিই ভয়ের কারণ। প্রত্যেক আহমদীর সামান্যতম অহংকার থেকেও আত্মরক্ষা করে চলা উচিত। কেননা, এটি ক্রমান্বয়ে মানুষকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই নূর (আলো) আমার চাদর। এটা আমার অনুকম্পা, এটা গ্রহণ কর– বিনয় অবলম্বন কর। যদি এই গণ্ডির বাহিরে যাওয়ার চেষ্টা কর তবে শাস্তিতে নিপতিত হবে। এক সরিষা দানা পরিমাণও অহংকার থাকলে শাস্তি তোমাদের জন্য অবধারিত। একই সাথে অবশ্য এই শুভসংবাদও দিয়েছেন যে, বিন্দু পরিমাণ ঈমানও যদি তোমাদের ভেতর থাকে তাহলে আমি তোমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করবো। যেমনটি হাদীসের বর্ণনায় এসেছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, আবার যার অন্তরে এক সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান থাকবে, সে আগুনে প্রবেশ করবে না"। (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল মুকাদ্দামা)

হযরত আকদস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেনঃ

"আমি সত্য-সত্যই বলছি, কেয়ামতের দিন শির্কের পর অহংকারের মত বড় আর কোন আপদ নেই। এটা এমন এক বিপদ যা মানুষকে উভয় জগতে লাঞ্ছিত করে। খোদা তা'লার কৃপা, এক খোদার উপাসনাকারী প্রত্যেকের তদারকী করে থাকে তবে অহংকারীর নয়। শয়তানও একত্ববাদী হওয়ার দাবি করতো কিন্তু তার প্রকৃতিতে যেহেতু অহংকার ছিল এবং আদম (আ.) খোদা তা'লার দৃষ্টিতে প্রিয় ছিলেন। তাই যখন সে তাকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখলো আর তার সমালোচনা করলো, এ অপরাধে সে ধ্বংস হলো আর অভিসম্পাতের মালা তার গলায় পরানো হলো। অতএব, প্রথম পাপ যার কারণে একব্যক্তি চিরকালের জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো, তা এই অহংকারই।" (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৯৮)

তিনি (আ.) আরো বলেনঃ

"যদি তোমাদের মধ্যে কোথাও অহংকার, কপটতা, আত্মশ্লাঘা বা আলস্য বর্তমান থাকে, তাহলে আদৌ তোমরা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এরূপ যেন না হয়– মাত্র কয়েকটি কথা শিখে এই বলে তোমরা আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হবে যে, 'যা কিছু করণীয় আমরা তা করে ফেলেছি'। কেননা, খোদা তা'লা, তোমাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন দেখতে চান। তিনি তোমাদের কাছে এক মৃত্যু চান যার পর তিনি তোমাদেরকে এক নতুন জীবন দান করবেন।" (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২)

অহংকার ও শয়তানের মাঝে গভীর এক যোগসূত্র রয়েছে

পুনরায় তিনি (আ.) বলেনঃ

"অবশ্য এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ্র নবীদের চেয়ে মর্যাদায় হাজার হাজার স্তর নীচে অবস্থান করে, মাত্র দিন কয়েক নামায পড়লেই তাদের হৃদয়ে অহংবোধ দানা বাধে। অনুরূপভাবে রোযা রেখে বা হজ্জ পালন করে আত্মশুদ্ধির পরিবর্তে তাদের মাঝে অহংকার আর লোকদেখানো ভাব মাথাচাড়া দেয়। স্মরণ রেখো! অহংকার আসে শয়তান থেকে আর তা মানুষকে শয়তান বানিয়ে ছাড়ে। এ থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ দূরে না থাকবে তা সত্য গ্রহণে এবং ঐশী কল্যাণ লাভের ক্ষেত্রে বাদ সাধে। কোন ক্রমেই অহংকার করা উচিত নয়। না জ্ঞানের ক্ষেত্রে, না ধনসম্পদের বেলায় আর না উচ্চপদের জন্য, প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্যও না, বংশ ও গোত্রের গরিমায়ও নয়। অধিকাংশ

ক্ষেত্রে এসব বিষয়ের জন্যই অহংবোধ জন্মায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ এই সব অহংবোধ থেকে আত্মশুদ্ধি করছে ততক্ষণ পর্যন্ত মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সে মনোনীত হতে পারে না। আর সেই তত্ত্বজ্ঞান যা হীন কামনা-বাসনার ঘৃণ্য চাওয়াপাওয়াকে জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দেয় তা তার লাভ হয় না। কেননা, এই সব হীন বিষয়াদী শয়তানের সাথে সম্পৃক্ত যা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা মোটেই পছন্দ করেন না...।"

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরও বলেন:
"কতিপয় মৌলিক বিষয় রয়েছে যার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। আর সেগুলো এড়িয়ে চলো। কতিপয় লোক দু'চারদিন নামায পড়ে মনে করে, আমরা বড়ই নেক হয়ে গিয়েছি, তাদের চেহারায় অদ্ভুত ধরণের গাম্ভীর্যের সাথে অহংকারও ফুটে উঠে। আর আপনারা কখনো কখনো কতক জুব্বাধারীদের দেখে থাকবেন যে, তসবীহ হাতে মসজিদ থেকে বের হচ্ছে, তাদের ঘাড়েই গর্ব ও অহংকার দৃশ্যমান। কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্‌র, খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমাদের নেই, আহমদীয়া জামা'ত এমন জুব্বাধারীদের থেকে পবিত্র। হজ্জ করে যখন ফেরত আসে, এর এত প্রচারণা চালানো হয়ে থাকে যে, এর কোন সীমা-পরিসীমাই নেই। এমন ব্যক্তিদের রোযাও হয় লোক দেখানোর জন্য আর তাদের হজ্জও হয় লোক দেখানোর খাতিরে। কেবল বড়াই করার জন্যই এইসব করা হয়ে থাকে যে, লোকেরা বলুক– অমুক অত্যন্ত নেক লোক, রোযাও রাখে আবার তিনি হাজীও, বড়ই সৎপরায়ণ ব্যক্তি। লোক দেখানো এই সব কাজ অহংকারের কারণেই হয়ে থাকে বা লোক দেখানোর ইচ্ছা থেকেই এই অহংকার সৃষ্টি হয়ে যায়।"

তিনি (আ.) আরও বলেন, কতিপয় ব্যক্তি নিজ বংশ মর্যাদার কারণে গর্ব ও অহংকার করে থাকে যে, আমাদের বংশ অনেক উঁচা, অমুকেরা তো নিচু জাতের, তারা কি করে আমাদের সমকক্ষ হতে পারে! এ প্রসঙ্গে, হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, অহংকার কয়েক রকমের রয়েছে যা তোমাদেরকে খোদা তা'লার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা থেকে দূরে নিয়ে যায়, তাঁর নৈকট্য থেকে দূরে নেয় আর এভাবে ধীরে ধীরে মানুষ শয়তানের দলে ভিড়ে যায়।

তিনি (আ.) আরও বলেন:
"অতএব, আমার দৃষ্টিতে পাক-পবিত্র দৃষ্টান্ত স্থাপনের উত্তম পদ্ধতি হলো

মানুষের সর্ব প্রকারের গর্ব ও অহংকার থেকে বিরত থাকা আর এর চেয়ে উত্তম কোন পদ্ধতি পাওয়াও সম্ভব নয়। জ্ঞানের দিক থেকেও নয়, বংশ মর্যাদায়ও নয় আর অর্থসম্পদের বেলায়ও নয়। খোদা তা'লা কাউকে দৃষ্টিশক্তি দান করলে সে দেখতে পায় যে, প্রতিটি আলোক রশ্মি যা এই অন্ধকার থেকে মুক্তি দিতে পারে তা আকাশ থেকেই অবতীর্ণ হয়। প্রতিটি মুহূর্তে মানুষ সেই ঐশী জ্যোতির মুখাপেক্ষী। চক্ষুও দেখতে সক্ষম নয় যতক্ষণ না সূর্যের আলো আসে যা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়। অনুরূপভাবে, আধ্যাত্মিক জ্যোতি যা প্রত্যেক ধরণের অন্ধকারকে বিদূরিত করে আর এর জায়গায় তাক্ওয়া ও পবিত্রতার জ্যোতি সৃষ্টি করে তা আকাশ থেকেই এসে থাকে। আমি সত্য সত্যই বলছি, মানুষের তাক্ওয়া ঈমান, ইবাদত, পবিত্রতা– এক কথায় সবকিছু আকাশ থেকেই অবতীর্ণ হয়। আর এসবই খোদা তা'লার বিশেষ অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে। তিনি চাইলে এই সব বিরাজমান রাখেন আবার তিনি চাইলে এসব মিটিয়ে দেন।

অতএব, সত্যিকার তত্ত্বদর্শন হলো মানুষের নিজ সত্তাকে অতি তুচ্ছ ও অর্থহীন জ্ঞান করে বিনয় ও অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়ে এক অদ্বিতীয় সত্তার আস্তানায় সিজদাবনত হয়ে খোদা তা'লার আশিস যাচনা করা আর তত্ত্বজ্ঞানের সেই জ্যোতির প্রার্থী হওয়া যা প্রবৃত্তির মোহকে জ্বালিয়ে ভস্মিভূত করে দেয়। আর হৃদয়ে এক জ্যোতি ও পুণ্যের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও উষ্ণতা সৃষ্টি করে। এরপর যদি তাঁর অনুগ্রহ ও কল্যাণরাজি থেকে তার অংশ লাভ হয় আর কোন এক মূহুর্তে বিশেষ প্রশান্তি ও দৃঢ় বিশ্বাস লাভ হয়ে থাকে তাহলে এজন্য গর্ব বা অহংকার করা উচিত নয় বরং বিনয় ও কাকুতি-মিনতিতে আরও উন্নতি লাভ করা উচিত। কেননা, যে নিজ সত্তাকে যত বেশি তুচ্ছ জ্ঞান করে তত বেশি ঐশী জ্যোতি তার ওপর অবতীর্ণ হবে আর অভিজ্ঞতায় সে তত সমৃদ্ধ হবে, যার কল্যাণে সে শক্তিশালী ও জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠবে। মানুষ যদি এই বিশ্বাস পোষণ করে তাহলে প্রত্যাশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার নৈতিক মান উন্নততর হবে। জগতে নিজ সত্তাকে কিছু একটা ভেবে বসাও অহংকার এবং তা একই পরিণাম ডেকে আনে, সে এমনই হয়ে যায় যে, সে অন্যের ওপর অভিসম্পাত করা আরম্ভ করে আর তাকে নিচু বা হীন মনে করে।" (মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১২-২১৩, নব সংস্করণ)

তিনি (আ.) আরও বলেন:

"অহংকার অত্যন্ত ভয়াবহ রোগ। যে ব্যক্তির মাঝে এ রোগ সৃষ্টি হয় তার

জন্য এটা আধ্যাত্মিক মৃত্যু। আমি নিশ্চিত জানি, এই রোগ হত্যার চেয়েও গুরুতর। অহংকারী-ব্যক্তি শয়তানের ভাই হয়ে যায়। কেননা, অহংকারই শয়তানকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করেছে। এ কারণে মু'মিন হওয়ার শর্ত হলো, তার মাঝে অহংকার না থাকা বরং তার মাঝে বিনয়, দীনতা ও কাকুতিমিনতির বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকা চাই। আর এটা খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের বিশেষত্ব হয়ে থাকে। তাদের মাঝে পরম মার্গের বিনয় বিরাজিত থাকে। আর এইসব চারিত্রিক গুণাবলী মহানবী (সা.)-এর মাঝে ছিল সর্বাধিক। তাঁর (সা.) এক সেবককে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তোমার সাথে তাঁর (সা.) আচার-আচরণ কেমন ছিল, উত্তরে সে বলল, অবস্থা এমনই ছিল যে, আমার চেয়ে তিনিই আমার অধিক সেবা করতেন **(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলে মুহাম্মদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম)**।" (মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৭-৪৩৮, নব সংস্করণ)

অহংকার খোদা তা'লার দৃষ্টিতে চরম ঘৃণ্য বিষয়

তিনি (আ.) আরও বলেন:

"...আমি আমার আপন জামা'তকে উপদেশ দিচ্ছি যে, অহংকার এড়িয়ে চল। কেননা, অহংকার আমাদের মহাপরাক্রমশালী খোদার দৃষ্টিতে চরম ঘৃণ্য বিষয়। তবে তোমরা হয়তো বুঝবে না যে, অহংকার জিনিসটা কী? অতএব, আমার কাছ থেকে জেনে নাও, কারণ আমি ঐশী প্রেরণায় কথা বলি।

প্রত্যেক ব্যক্তি অহংকারী, যে তার ভাইকে এইজন্য হীন জ্ঞান করে যে, সে নিজে তার অপেক্ষা বেশি শিক্ষিত বা বেশি জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন বা বেশি দক্ষ। কেননা, সে খোদাকে বুদ্ধি ও জ্ঞানের উৎস মনে করে না আর নিজ সত্তা সম্পর্কে ভাবে যে আমি কিছু একটা হনুরে। খোদা কী তাকে বিকারগ্রস্থ করে দেয়ার আর তার ঐ ভাই যাকে সে ছোট মনে করে তাকে জ্ঞানবুদ্ধি শিক্ষা-দীক্ষা আর কুশলে তার চেয়ে উন্নততর করে তুলার মত ক্ষমতা রাখেন না? অনুরূপভাবে, যেই ব্যক্তি নিজের কোন অর্থসম্পদে ও মানমর্যাদার গরিমায়, নিজেকে উঁচু মনে করে আর নিজের ভাইকে নিচু জ্ঞান করে সে-ও অহংকারী। কেননা, সে একথা ভুলে গিয়েছে যে, এই মানমর্যাদা খোদা তা'লাই তাকে দান করেছেন। সে অন্ধ, কেননা সে জানে না যে, খোদা তার ওপর এমন এক দৈবদুর্বিপাক নিপতিত করার ক্ষমতা রাখেন, যার ফলে নিমিষে সে সর্বনিকৃষ্টাবস্থায় পতিত হতে পারে আর তার সেই ভাই যাকে সে হীন জ্ঞান

করে তার চেয়ে তাকে অধিক অর্থকড়ি ও ধনসম্পদ দান করতে পারেন। তেমনি ভাবে, ঐ ব্যক্তি যে নিজের দৈহিক স্বাস্থ্যের গর্ব করে বা নিজের রূপ-সৌন্দর্য আর শক্তিসামর্থ্যের বড়াই করে আর হাসিঠাট্টা বসত নিজের ভাইয়ের বিকৃত নাম রাখে এবং তার দৈহিক খুঁতের কথা লোকদের কাছে বলে বেড়ায়, সে-ও অহংকারী। সে ব্যক্তি ঐ খোদা সম্পর্কে অজ্ঞ, যিনি মুহূর্তের মধ্যে তার মাঝে দৈহিক ত্রুটি সৃষ্টি করে তাকে সেই ভাইয়ের চেয়ে হীন পর্যায়ে উপনীত করতে পারেন আর যাকে অপদস্থ করা হয়েছিল, এক দীর্ঘ কালের জন্য তার শক্তিবৃত্তিতে সেই আশিষ সৃষ্টি করতে পারেন, যাতে কোন কমতিও আসবে না আর যা নষ্টও হবে না। কেননা, তিনি যা চান তা-ই করেন। একই ভাবে ঐ ব্যক্তিও যে নিজের শক্তি ও ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে দোয়া যাচনা করতে আলস্য দেখায় সে-ও অহংকারী। কেননা, শক্তি ও মহিমার উৎস সে সনাক্ত করতে পারে নাই আর নিজ সত্তাকে সে কিছু-একটা ভেবে বসেছে।

অতএব, তোমরা হে আমার প্রিয়গণ! এই যাবতীয় কথা স্মরণ রেখো। এমন যেন না হয় যে, তোমাদের অজান্তেই কোন দিক থেকে তোমরা খোদা তা'লার দৃষ্টিতে অহংকারী সাব্যস্ত হয়ে যাও। এক ব্যক্তি, যে নিজের এক ভাইয়ের কোন কথা অহংকার প্রদর্শনপূর্বক সংশোধন করে সে-ও অহংকারে অংশগ্রহণ করে, আবার এক ব্যক্তি যে মনোযোগের সাথে নিজ গরীব ভাই-এর কথাবার্তা শুনতে চায় না আর মুখ ফিরিয়ে নেয় সে-ও অহংকারে অংশগ্রহণ করছে। এক ব্যক্তি যে দোয়াকারীদেরকে ঠাট্টা ও হাসিবিদ্রূপের দৃষ্টিতে দেখে সে-ও অহংকারের এক ভাগ গ্রহণ করেছে। আর সেই ব্যক্তি, যে খোদার প্রত্যাদিষ্ট ও প্রেরিত মহাপুরুষের সম্পূর্ণরূপে আনুগত্য করতে চায় না, সে-ও অহংকারে ভাগ বসিয়েছে। আবার সেই ব্যক্তিও যে খোদার প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির কথা মনোযোগের সাথে শুনে না আর তার উক্তিসমূহ মনোযোগের সাথে পাঠ করে না, সে-ও অহংকার করেছে। অতএব, চেষ্টা কর যাতে অহংকারের কোন অংশই তোমাদের মধ্যে না থাকে, যাতে ধ্বংস হয়ে না যাও আর তোমরা নিজ সন্তান-সন্ততি ও পরিবারবর্গসহ মুক্তি লাভ করতে পার। খোদামুখী হও, পৃথিবীতে কাউকে যতটা ভালোবাসা সম্ভব, সেই ভালোবাসা তাঁকে (খোদাকে) দাও, পৃথিবীতে সর্বাধিক যতটা ভয় কাউকে করা যায়, সেই ভয় তোমরা খোদাকে কর। পবিত্র হৃদয়ের ও পবিত্র ইচ্ছার অধিকারী হয়ে যাও আর গরীব মিসকিন ও নিরীহ প্রকৃতি সম্পন্ন হও।" (নুযুলুল মসীহ্, রূহানী খাযায়েন, ১৮তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০২-৪০৩)

আবার বয়আতের এই শর্তে আরেকটি বিষয় যা বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো, কাকুতিমিনতি ও বিনয়, উত্তম ব্যবহার ও সহিষ্ণু স্বভাব এবং দীনহীনতার মাঝে জীবন অতিবাহিত করবো। যেমনটা আমি পূর্বেই বলেছি, নিজেদের অন্তর আর চিন্তা-চেতনাকে আপনারা যদি অহংকারমুক্ত করার চেষ্টা করেন বরং মুক্ত করেন তখন আবশ্যকীয় ভাবে এক মহান বৈশিষ্ট্য, এক মহান গুণ এক উন্নত চরিত্র আপনাদের নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে। নইলে শয়তান পুনরায় আক্রমণ করবে। কেননা, সে এ কাজের জন্যই বসা আছে, আপনার পিছু ছাড়ছে না। ঐ নৈতিক গুণ হলো বিনয় ও দীনতা আর এটা হতেই পারে না যে, বিনয় ও অহংকার সহাবস্থান করবে। অহংকারী ব্যক্তিরা সর্বদাই এমন বিনয়ী ব্যক্তি যারা 'ইবাদুর রহমান'(রহমান খোদার বান্দা) তাদেরকে তীর্যক বাক্যবাণে জর্জরিত করতে থাকে, বড় বড় কথা বলে থাকে, এমন লোকদের মোকাবেলায় আপনারা তাদের মত পদ্ধতি অবলম্বন করবেন না বরং আপনাদেরকে খোদা তা'লার সেই নির্দেশনা অনুসারে কাজ করতে হবে। যেমনটি কি-না তিনি বলেন,

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٤﴾

(সূরা আল ফুরকান, ২৫:৬৪)

অর্থাৎ- রহমান আল্লাহ্‌র বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্র হয়ে চলে এবং অজ্ঞরা যখন (তাদের) সম্বোধন করে তখন তারা বলে, 'সালাম'।

হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেনঃ
মহানবী (সা.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লার প্রেমপ্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি এক স্তর পর্যন্ত বিনয় অবলম্বন করেছে, আল্লাহ্ তা'লা মর্যাদায় তাকে এক স্তর পর্যন্ত উন্নীত করবেন। এতটাই উন্নীত করবেন যে, তাকে **ইল্লিয়্যীনে** (উঁচুদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে) জায়গা দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সামনে এক স্তর পর্যন্ত অহংকার প্রদর্শন করেছে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এক স্তর নিম্নে পতিত করে দিবেন, এতটা নিচুঁতে যে, তাকে **আসফালা সাফেলিনে** (নিচুঁদের মধ্যে সর্বনিম্নে) প্রবেশ করিয়ে ছাড়বেন।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, বাকী মুসনাদীল মুখছারিনা মিনাস সাহাবা)

এমন লোকদের বৈঠক থেকে 'সালাম' বলে উঠে পড়ার মাঝেই আপনাদের

জীবন ও আপনাদের কল্যাণ নিহিত। কেননা, এতেই আপনাদের মর্যাদা বেড়ে যায় আর বিরুদ্ধাচরণকারীরা এই ধরনের মন্দ আচরণের কারণে নিজেরাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট পর্যায়ে গিয়ে পতিত হতে থাকে।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে আর আমাদের পারস্পরিক বিষয়েও তা দৃষ্টি গোচর রাখা উচিত:

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করলে অর্থ সম্পদ কমে যায় না বরং আল্লাহ্ তা'লার বান্দা কাউকে যতটা ক্ষমা করে, আল্লাহ্ তা'লা ততই তার সম্মান বৃদ্ধি করেন। কোন ব্যক্তি যতই বিনয় ও দীনতা অবলম্বন করে আল্লাহ্ তা'লা তাকে ততটাই উচ্চ মর্যাদা দান করেন'।" (মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াসসিলাহ, বাবু ইসতেহ বাবুল আফু ওয়াত তাওয়াযে')

ইয়াজ বিন হুমার বীন মাজাশয়ী (রা.) বর্ণনা করেন, "রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের মাঝে বক্তৃতা করতে দাঁড়ালেন আর বললেন, 'আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ওহী করেছেন যে, তোমরা এতটা বিনয়ী হও যাতে তোমাদের মধ্যে কোন একজন অপরজনের ওপর যেন গর্ব না করে আর কেউ অন্যের ওপর যেন নির্যাতন না চালায়'।"

আরও একটি হাদীস রয়েছে; আমাদেরকে পারস্পরিক বিষয়ে তা দৃষ্টিতে রাখা উচিত।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করলে অর্থ সম্পদ কমে যায় না বরং আল্লাহ্ তা'লার বান্দা কাউকে যতটা ক্ষমা করে, আল্লাহ্ তা'লা ততই তার সম্মান বৃদ্ধি করেন। কোন ব্যক্তি যতই বিনয় ও দীনতা অবলম্বন করে আল্লাহ্ তা'লা তাকে ততটাই উচ্চ মর্যাদা দান দান করেন'।" (মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াসসিলাহ, বাবু ইসতেহ বাবুল আফু ওয়াত তাওয়াযে')

অতএব, প্রত্যেক আহমদীর পরস্পরকে ক্ষমা করার অভ্যাস গড়া উচিত, এর ফলে পরজগতেও উঁচু মর্যাদা লাভ হবে আর ইহজগতেও আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সম্মান বৃদ্ধি করতে থাকবেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিজের খাতিরে কৃত কোন কর্মকেই কখনও বিনা পুরস্কারে যেতে দেন না।

মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে দীনহীন ও কাঙালদের মর্যাদা

মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে কাঙ্গালদের মর্যাদা কতটা, নিম্নবর্ণিত হাদীস থেকে সেই ধারণা পাওয়া যায়।

হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা.) মহানবী (সা.)-এর বরাতে বর্ণনা করেন, "দীনহীন-কাঙালদের ভালোবাসবে।" তিনি বলেছেন, "আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এই দোয়া করতে শুনেছি–

'আল্লাহুম্মা আহ্ইনি মিসকিনা ওয়া আমেতনি মিসকিনা ওয়াহ্ শুরনি ফি জুমরাতিল মাসাকিনা' অর্থাৎ- হে আল্লাহ্! আমাকে দরিদ্র অবস্থায় জীবিত রাখ, আমাকে কাঙ্গাল অবস্থায় মৃত্যুদান করো আর আমাকে কাঙ্গালদের মধ্যেই উত্থিত কর।" (ইবনে মাজা, কিতাবুল যোহদ, বাব মাজালিসাতুল ফুকারা)

অতএব, প্রত্যেক আহমদীরও সেই পথ অবলম্বন করা উচিত। সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা উচিত, যার ওপর আমাদের মনিব ও নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) চলতেন। প্রত্যেক আহমদীর নিজেরও দীনহীন-মিসকিনের বেশে জীবন কাটানোর চেষ্টা করা উচিত। কেননা, বয়আতের অঙ্গীকার এটাই যে, 'দীনতার মাঝে জীবনযাপন করবো'।

হাদীসের অপর এক বর্ণনায় রয়েছেঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, "জাফর বিন আবু তালিব (রা.) মিসকিন ও কাঙালদের অনেক বেশি ভালোবাসতেন। তাদের বৈঠকে তিনি বসতেন, তিনি তাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন আবার মিসকিনেরাও তার সাথে আলাপ-চারিতা করতো। সেকারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত জাফর (রা.)-কে **'আবুল মাসাকিন'** (মিসকিনদের পিতা) বলে ডাকতেন।" (ইবনে মাজা, কিতাবুল যোহদ, বাব মাজালিসাতুল ফুকারা)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেনঃ

"আল্লাহ্ তা'লাকে সন্ধান করতে হলে মিসকিনদের হৃদয়পাশে সন্ধান কর। এ কারণেই, নবীগণ দীনতার পোশাক পরে নিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে, বড় বড় জাতির লোকেরা অপেক্ষাকৃত ছোট জাতির লোকদেরকে যেন হাসিবিদ্রুপ না করে আর কেউ যেন এই কথা না বলে যে, আমার বংশই উঁচু। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'তোমরা যারা আমার নিকট আসবে তোমাদেরকে এটা জিজ্ঞাসা করব

না যে, তোমার বংশমর্যাদা কী, বরং জিজ্ঞাসা এটা করা হবে, তোমার আমল বা কর্ম কী'? অনুরূপভাবেই খোদার নবী (সা.) তাঁর নিজের মেয়েকে বলেছেন, 'হে ফাতেমা! খোদা তা'লা কারো বংশ পরিচয় কী তা জানতে চাইবেন না। তুমি যদি কোন মন্দকর্ম কর তবে খোদা তা'লা তোমাকে এ কারণে ছাড় দিবেন না যে, তুমি রসূলকন্যা। অতএব, তোমার উচিত হবে প্রতিটি মুহূর্ত নিজের কাজকর্মের বিশ্লেষণ করা'।" (মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭০, নব সংস্করণ)

তিনি (আ.) আরও বলেন:
"তাক্ওয়া অবলম্বনকারীর জন্য এই শর্ত ছিল, দীনতার মাঝে ও প্রবাসীর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করা। এটা তাক্ওয়ার এক শাখা, যার মাধ্যমে আমাদেরকে অবৈধ ক্রোধ ও ক্ষোভের মোকাবেলা করতে হবে। বড় বড় তত্ত্বজ্ঞানী ও সাধু-সত্যবাদীদের জন্য চূড়ান্ত ও কঠিন গন্তব্য হলো– ক্রোধ পরিত্যাগ করে চলা। আত্মম্ভরিতা ও গর্ব, ক্রোধ থেকেই সৃষ্টি হয় আর কখনও কখনও আত্মম্ভরিতা থেকেও ক্রোধ জেগে উঠে। কেননা, ক্রোধের উদ্রেক সেই সময়ে হয়, মানুষ যখন নিজেকে অন্যের ওপর প্রাধান্য দেয়।" (রিপোর্ট জলসা সালানা ১৮৯৭, পৃষ্ঠা ৪৯)

তিনি (আ.) আরও বলেন:
"তোমরা যদি চাও আকাশে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হোন, তাহলে তোমরা এমনভাবে এক হয়ে যাও যেন সহোদর দুই ভাই। তোমাদের মধ্যে সে-ই অধিক ধর্মপরায়ণ, যে আপন ভাইয়ের অপরাধ অধিক ক্ষমা করে এবং হতভাগা সে, যে হঠকারিতামূলক আচরণ করে, অপরাধ ক্ষমা করে না। সুতরাং তার সাথে আমার সম্পর্ক নাই।" (কিশতিয়ে নূহ্, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২-১৩)

বয়আতের অষ্টম শর্ত

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধনপ্রাণ, মানসম্ভ্রম, সন্তানসন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

দুনিয়ার ওপর ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার এমন এক অঙ্গীকার যে, জামা'তের প্রত্যেক ব্যক্তি, জামা'তের সাথে যে সর্বাবস্থায় সম্পর্ক রাখে, সে এই অঙ্গীকার, জামা'তের অনুষ্ঠান এবং ইজতেমা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণকালে বার বার পুনরাবৃত্তি করে থাকে। প্রত্যেক ইজতেমা এবং জলসা ইত্যাদিতে ব্যানার লাগানো হয়। আর এইসব ব্যানারের মধ্যে প্রায়ই এটা প্রদর্শিত হয়ে থাকে যে, 'ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেবো। এই বিষয়টিকে কেন এতটা গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে? এ জন্যই যে, এটা ছাড়া ঈমান অটুট-অক্ষত থাকতেই পারে না। কিন্তু এটি মেনে চলা কোন সহজ কাজ নয়। এটা অর্জন করার জন্য সর্বদা সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার নিকট সাহায্য চাইতে থাকা উচিত। এ উঁচু মান কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থাকলেই অর্জন করা সম্ভব। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছি, আমাদের জন্য কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হলো–

وَمَآ اُمِرُوۡۤا اِلَّا لِيَعۡبُدُوا اللّٰهَ مُخۡلِصِيۡنَ لَهُ الدِّيۡنَ ۬ۙ حُنَفَآءَ وَ يُقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ
وَيُؤۡتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيۡنُ الۡقَيِّمَةِ ؕ‏۝۶

(সূরা আল বাইয়্যেনাহ্, ৯৮:৬)

অর্থাৎ, আর তাদেরকে কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে, তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে সদা তাঁর প্রতি বিনীত থাকতে, নামায কায়েম করতে এবং যাকাত দিতে আদেশ দেয়া হয়েছে আর এই-ই হলো চিরস্থায়ী ধর্ম।

সুতরাং নামায প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্থাৎ, বাজামা'ত ও সময়মত নামায

আদায়ের মাধ্যমে, তাঁর পথে খরচ করে এবং গরীবদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার মাধ্যমেও আমরা সত্য ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি। আর ঐ শিক্ষাসমূহকে নিজেদের জীবনের অংশ করে নিতে পারি, নিজেদের জীবনে অবিচ্ছেদ্য অনুসঙ্গ করে নিতে পারি। যখন আমরা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করবো, তার প্রদত্ত শিক্ষা মেনে চলবো তখনই আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তওফিক দান করবেন। আমাদের ঈমানকে এতটা দৃঢ়তা দান করবেন যে, আমাদের নিজ সত্ত্বা, নিজস্ব আশা-আকাঙ্খা, নিজ সন্তানসন্ততি ধর্মের মোকাবেলায় তুচ্ছ মনে হবে। অতঃপর সব কিছু যখন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ তা'লার জন্য হয়ে যাবে এবং আমাদের নিজেদের বলে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না, তখন আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের বিফল মনোরথ হতে দেন না। তিনি তাদের সম্মানের সুরক্ষা দান করেন, তাদের সন্তানসন্ততিদেরও সুরক্ষা বিধান করেন, তাদের প্রতি কল্যাণ বর্ষণ করেন, বৃদ্ধি করেন তাদের সম্পদও এবং তাদেরকে কৃপা ও করুণার চাদরে সর্বদা আবৃত করে রাখেন আর তাদের সকল ধরণের ভয় দূরীভূত করেন।

যেভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা বলেছেন:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٣﴾

(সূরা আল বাকারা, ২:১১৩)

অর্থাৎ– না, বরং যে কেহ আল্লাহ্‌র সমীপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মশীল হয় তার জন্য তার প্রভুর নিকট প্রতিদান রয়েছে এবং না তাদের ওপর কোন ভয় আসবে আর না তারা দুঃখ-ভারাক্রান্ত হবে।

ইসলামী শিক্ষার সংক্ষিপ্ত-সার

আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٦﴾

(সূরা আন্ নিসা, ৪:১২৬)

অর্থাৎ- আর ধর্মের ক্ষেত্রে তার চেয়ে উত্তম আর কে, যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহ্‌র সমীপে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের

ধর্মাদর্শের অনুসরণ করে? আর আল্লাহ্ ইব্রাহীমকে বিশেষ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।

এই আয়াতে ইসলামী শিক্ষার সারাংশ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, পরিপূর্ণ আনুগত্যের সাথে নিজের সবটুকু শক্তিসামর্থ্য উজাড় করে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার বিধিবিধানের অনুসরণ ও তার ধর্মের খাতিরে নিজেকে উৎসর্গকারী ও সতকর্মশীল হওয়া চাই। অতএব, সে যেহেতু আল্লাহর খাতিরে সৎকর্ম করবে তাই কারও মনে এই ধারণা জাগা উচিত নয় যে, যদি সে সর্বদা ধর্মের দিকে এবং ধর্মের সেবায় লেগে থাকে তাহলে তার ধনসম্পদ বা সন্তানসন্ততি নষ্ট হয়ে যাবে! কখনও নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লা প্রতিদান ও পুরস্কার প্রদানে সকলের চেয়ে অগ্রগামী, তিনি নিজেই তার সেই কর্মের পুরস্কার দিবেন। যেভাবে পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি স্বয়ং তার প্রাণ, ধনসম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা প্রদান করবেন। এমন লোকদেরকে এবং তাদের বংশধরদেরকে তিনি কখনও বিনষ্ট হতে দেন না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পবিত্র কুরআন থেকে উদ্ধৃত করে বলেন:

بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۝

(সূরা আল বাকারা, ২:১১৩)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজের অস্তিত্বকে খোদার হাতে সোপর্দ করে এবং নিজের জীবন তাঁর রাস্তায় উৎসর্গ করে আর সাগ্রহে পুণ্যকর্ম করে, সে খোদার নৈকট্যরূপী ঝর্ণাধারা থেকে নিজের পুরস্কার লাভ করবে এবং তাদের ওপর না কোন ভয় আসবে আর না তারা দুঃখিত হবে।

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজ সমুদয় শক্তি-বৃত্তি খোদার রাস্তায় নিয়োজিত করে রাখে তার কথা-কর্ম, গতি-স্থিতি, আনন্দ-বেদনা, মোট কথা জীবনের সবকিছুই একনিষ্ঠভাবে খোদারই জন্য নিবেদিত হয়ে যায় আর প্রকৃত নেকী অর্জনে উদ্যোগী হয়ে প্রশান্তি লাভ করে। সুতরাং খোদা তা'লা তাকে নিজ পক্ষ থেকে প্রতিদান দেবেন এবং ভয় ও দুঃখকষ্ট থেকে পরিত্রাণ দেবেন। (সিরাজ উদ্দীন ঈসাইয়োঁ কী চার সওয়ালোঁকা জওয়াব, রূহানী খাযায়েন, ১২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৪)

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

মুয়াবিয়া বিন হায়দাহ কুশায়রি (রা.) তার নিজের ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা

বর্ণনা করে বলেন, "আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনাকে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক কি বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন আর কি ধর্ম নিয়ে আপনি এসেছেন'? তিনি (সা.) বললেন, 'খোদা আমাকে ইসলাম ধর্মসহ পাঠিয়েছেন'। আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'ইসলাম ধর্ম কি'? হুযূর (সা.) উত্তরে বললেন, 'ইসলাম ধর্ম এটাই যে, তুমি নিজ সত্তাকে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার হাতে সোপর্দ করে দাও এবং অন্যান্য মা'বুদ (উপাস্য)-দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর, নামায কায়েম কর আর যাকাত দাও'।" (আল ইসতিআব)

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

হযরত সুফিয়ান (রা.) বর্ণনা করেন, "একবার আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাকে ইসলামের এমন কোন কথা বলুন যার বাইরে অন্য কারও কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার আর প্রয়োজন থাকবে না, অর্থাৎ আমি যেন পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারি'। হুযূর (সা.) উত্তরে বললেন: 'তুমি একথা বল যে– আমি আল্লাহ্ তা'লার ওপর ঈমান এনেছি। এরপর এর ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও এবং অবিচলতার সাথে এতে প্রতিষ্ঠিত থাক'।" (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব জামেউ আওসাফুল ইসলাম)

সাহাবীদের কর্ম কেমন ছিল? একটি হাদীসে এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে– শুরুতে যখন ইসলামে মদ নিষিদ্ধ ছিল না সাহাবীরাও মদ পান করতেন আর প্রায়শ নেশাগ্রস্তও হতো। কিন্তু সেই অবস্থায়ও হৃদয়ে ধর্ম ও ধর্মের সম্মানের প্রাধান্য বিরাজ করতো। এই চিন্তা মাথায় থাকতো যে, সবকিছুর ওপরে ধর্ম আর ধর্মই সবার ঊর্ধ্বে। সুতরাং, মদ হারাম হওয়ার নির্দেশ যখন এলো তখন যারা বসে মদ পান করছিল, তাদের মধ্যে কিছু নেশাগ্রস্ততাও ছিল। কিন্তু এটি নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত নির্দেশ শোনামাত্র তাৎক্ষণিকভাবে তারা তা পালন করলেন। এ বিষয়ে হাদীসে এসেছে, হযরত আনাস ইব্‌নে মালেক (রা.) বলেন, "আমি একবার আবু তালহা আনসারী, উবায়দা ইবনে জাররাহ এবং উবাই ইবনে কাব (রা.)-কে খেজুরের তৈরী মদ পরিবেশন করছিলাম। এমন সময় তাদের কাছে একব্যক্তি এসে বলল, 'মদ পান হারাম করা হয়েছে'। এটি শুনে আবু তালহা (রা.) বললেন, 'আনাস উঠে পড়! আর মদের কলসিগুলো ভেঙ্গে ফেল'। আনাস (রা.) বলেন, 'আমি উঠলাম এবং পাথুরে হাতুড়ির বাট দ্বারা কলসে আঘাত হানলাম আর সেটি ভেঙ্গে গেল'।" (সহীহ্ বুখারী, কিতাবু খাবরিল ওয়াহেদ, বাব মাযাআ ফি ইযাজাতিল ওয়াহেদিস সুদুক)

ইসলামের জীবন লাভ আমাদের কাছে এক ফিদিয়া (উদ্ধার-মূল্য) দাবি করে

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

"ইসলামের জীবন লাভ আমাদের কাছে এক উদ্ধার-মূল্য দাবি করে। তা কী? তা হলো এই পথে আমাদের মৃত্যুবরণ। এই মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন, মুসলমানদের জীবন আর জীবন্ত খোদার মহিমা-বিকাশ নির্ভর করে। এটি সেই বিষয় যার অপর নাম ইসলাম। খোদা তা'লা এই ইসলামকে এখন জীবিত করতে চাইছেন। আর এই মহান অভিযাত্রাকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত করার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে সব দিক দিয়ে কার্যকর এক বিরাট কর্ম-ব্যবস্থাপনার সূত্রপাত করা আবশ্যক ছিল। সুতরাং সেই মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান খোদা এ অধমকে সংস্কারের জন্য পাঠিয়ে এমনটিই করেছেন। (ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০-১২)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন:

মানুষ যতক্ষণ নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতার সাথে খোদা তা'লার বান্দা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন মর্যাদা লাভ করা দুস্কর। যেভাবে ইব্রাহীম (আ.) সম্পর্কে খোদা তা'লা সাক্ষ্য দিয়েছেন **"ওয়া ইব্রাহীমাল্লাজি ওয়াফ্‌ফা"** (সূরা আন্ নাজ্ম, ৫৩:৩৮) অর্থাৎ, ইব্রাহীম সেই ব্যক্তি, যিনি তার অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। সেভাবেই অন্য সবকিছু থেকে নিজের হৃদয়কে মুক্ত ও পবিত্র করা, খোদার ভালোবাসায় অন্তরাত্মা পরিপূর্ণ করে রাখা আর খোদা তা'লার ইচ্ছা অনুযায়ী চলা উচিত। যেভাবে ছায়া কায়ার অধীনস্থ হয়ে চলে ঠিক সেরকমই অধীনস্থ হয়ে পথ-চলা, যেন তার (বান্দার) এবং খোদার ইচ্ছা এক ও অভিন্ন হয়ে যায় আর এসব বিষয় অর্জিত হয়ে থাকে দোয়ার মাধ্যমে। নামায প্রকৃতপক্ষে দোয়া করার জন্যই অর্থাৎ, নামাযরত প্রত্যেক অবস্থায় দোয়া করা উচিত। কিন্তু নামাযে যে ব্যক্তি প্রায় ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে, যদি তার জানাই না থাকে যে সে কী যাচনা করছে, তাহলে সেটি আসলে নামাযই নয়।... সুতরাং মানুষের উচিত, নামায আদায়-কালে অলস ও অমনোযোগী না হওয়া। আমাদের জামা'ত সত্যিকারের কোন জামা'ত হতে চাইলে নিজেদের ওপর একটি মৃত্যু আনয়ন করতে হবে। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও এর প্রণোদনা থেকে আত্মরক্ষা করে চলতে হবে এবং আল্লাহ্ তা'লাকে সকল ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য করতে হবে। (মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, নব সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৫৭-৪৫৮)

পাপ থেকে বাঁচার উপায় হলো একীন (অর্থাৎ, দৃঢ়বিশ্বাস)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন:

"হে খোদা-অন্বেষী বান্দারা! কান খুলে শোন, একীনের (দৃঢ়বিশ্বাস) ন্যায় আর কোন কিছু নাই। একমাত্র দৃঢ়বিশ্বাসই মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করে। দৃঢ়বিশ্বাস মানুষকে পুণ্যকর্ম সাধনের শক্তি যোগায়। একমাত্র দৃঢ়বিশ্বাস মানুষকে খোদা তা'লার খাঁটি প্রেমিক করে তুলে। তোমরা কি দৃঢ়বিশ্বাস ব্যতিরেকেই পাপ বর্জন করতে পার? একীনের জ্যোতি ব্যতীত তোমরা কি প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে দমন করতে পার? দৃঢ়বিশ্বাসের অনুপস্থিতিতে তোমরা কি প্রকৃত কোন পরিবর্তন সাধন করতে পার? দৃঢ়বিশ্বাস ব্যতিরেকে তোমরা কি কোন সত্যিকারের স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পার? আকাশের নীচে এমন কোন 'কাফফারা' (প্রায়শ্চিত্ত) এবং এমন কোন 'ফিদিয়া' (বিনিময়) আছে কি, যা তোমাদেরকে পাপ বর্জন করাতে পারে? অতএব, তোমরা স্মরণ রেখো, দৃঢ়বিশ্বাস ব্যতিরেকে অন্ধকারপূর্ণ জীবন হতে তোমাদের নিষ্কৃতি লাভ হবে না এবং রুহুল কুদুস (পবিত্রাত্মা) লাভ করাও তোমাদের জন্য সম্ভবপর নয়। কল্যাণমণ্ডিত তারা, যারা একীন বা দৃঢ়বিশ্বাস লাভ করেছে। কেননা, খোদা তা'লার দর্শন তারা লাভ করবে। ভাগ্যবান তারা, যারা সে সকল সংশয় ও সন্দেহ হতে মুক্তি লাভ করেছে। কেননা, তারাই পাপ হতে পরিত্রাণ পাবে। কল্যাণমণ্ডিত তোমরা, কেননা তোমাদেরকে একীনের বা দৃঢ়বিশ্বাসের সম্পদ প্রদান করা হবে, যা প্রাপ্তির পর তোমাদের পাপের অবসান ঘটবে। পাপ এবং দৃঢ়বিশ্বাস একীভূত হতে পারে না। তোমরা কি সেই গর্তের ভেতর হাত দিতে পার, যার মধ্যে তোমরা ভয়ানক এক বিষাক্ত সাপ দেখেছ? তোমরা কি এমন স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে পার, যেখানে কোন আগ্নেয়গিরি থেকে পাথরবারি বর্ষন ঘটে, কিম্বা বজ্রপাত হয় অথবা যেখানে এক রক্তপিপাসু বাঘের আক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে অথবা এমন জায়গা যেখানে প্রাণবিনাশী প্লেগ মানুষের এক প্রজন্মকে নিপাত করেছে? সুতরাং খোদা তা'লার প্রতি যদি তোমাদের বিশ্বাস ঠিক সেইরূপ থাকে, যেইরূপ সাপ, বজ্রপাত, বাঘ বা প্লেগের উপস্থিতির বিষয়ে তোমরা নিশ্চিত, তাহলে খোদা তা'লার বিরুদ্ধাচারণ ও অবাধ্যতা করে শাস্তির পথ অবলম্বন করবে বা তাঁর সাথে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক তোমরা ছিন্ন করবে, এটি অসম্ভব। (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৬, ৬৭)

তিনি (আ.) বলেন:

"ভয়, ভালোবাসা আর প্রশংসাবোধের মর্মের মূলে রয়েছে পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান (মারেফাতে কামেলা) লাভ, যাকে পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান দেয়া হয়েছে তাকে ভীতি আর ভালোবাসাও পরিপূর্ণরূপে দান করা হয়। আর যাকে পূর্ণাঙ্গ ভীতি ও ভালোবাসা দেয়া হয় তাকে ঔদ্ধত্যের ফলে সৃষ্ট প্রত্যেক পাপ থেকে রক্ষা করা হয়।

সুতরাং এই মুক্তি লাভের জন্য আমরা কোন রক্তদানেরও মুখাপেক্ষী নই, আমাদের কোন ক্রুশেরও প্রয়োজন নেই আর কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তেরও আমাদের দরকার নেই। বরং আমাদের কেবল একটিই ত্যাগের প্রয়োজন এবং সেটি হচ্ছে আমার আমিত্বকে পদদলিত করা। মানব প্রকৃতি, এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। এ ধরণের ত্যাগেরই আরেক নাম ইসলাম। ইসলামের অর্থই হলো জবাই হবার জন্য নিজের গলা আগে বাড়িয়ে দেয়া। অর্থাৎ, সানন্দে নিজের আত্মাকে খোদার কাছে সমর্পণ করা। এই সুন্দর নামটি সমস্ত ধর্মের প্রাণ এবং যাবতীয় আধ্যাত্মিক বিধানের মূলকথা। সানন্দে-স্বেচ্ছায় জবাই হবার জন্য প্রস্তুত হতে অনুরাগপূর্ণ ভালোবাসা এবং পূর্ণ-প্রেমের প্রয়োজন আর পূর্ণ ভালবাসা সৃষ্টির জন্য পূর্ণ মারেফাত আবশ্যক। সত্যিকার ত্যাগ স্বীকার, অন্য কিছু করা নয় বরং চায় পূর্ণ ভালোবাসা ও পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান। "ইসলাম" শব্দটি কেবল এরই দিকে ইঙ্গিত করছে। (লেকচার লাহোর, পৃষ্ঠা ৫-৬, রূহানী খাযায়েন, ২০ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫১-১৫২)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ সকল বিষয় বুঝবার ও এর ওপর যথাযথ আমল করার তৌফিক দান করুন। (জুমুআর খুতবা, ২৯ আগষ্ট ২০০৩, ...ফ্রাঙ্ক ফোর্ট, জার্মানি)

নবম শর্তের ভূমিকা

ইসলামী শিক্ষা এমন অনুপম সুন্দর এক শিক্ষা, যা মানবজীবনের এমন কোন দিক বাদ রাখে নি যার সম্পর্কে মনে হতে পারে যে, এতে কিছুটা ঘাটতি রয়ে গেছে। অতএব, আল্লাহ্ তা'লার এসব অনুগ্রহ দাবি করে যে, তাঁর প্রিয় রসূল (সা.)-এর কাছে অবতীর্ণ এসব শিক্ষা অবলম্বন করে আমরা যেন একে নিজেদের জীবনের অংশ বানিয়ে নেই এবং নিজেদের ব্যবহারিক জীবনে তা প্রয়োগ করি। আমাদের উপর দায়দায়িত্ব আরো বেশি বর্তায়, যারা মহানবী (সা.)-এর সত্যিকারের প্রেমিক ও দাস আর এ যুগের ইমামের জামা'তে শামিল হয়েছি এবং শামিল হবার দাবি করে থাকি। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিজের ইবাদত এবং প্রাপ্য প্রদানের নির্দেশ যেভাবে দিয়েছেন, তেমনিভাবে মানুষের অধিকার প্রদানের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করে আমাদেরকে বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনের প্রাপ্য অধিকার আদায়ের নির্দেশও দিয়েছেন। আর এই গুরুত্বের কারণেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বয়আতের শর্তাবলীর মাঝে নবম শর্তে বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টজীবের প্রতি সহমর্মিতা এবং তাদের অধিকার আদায়ের অঙ্গীকার করিয়েছেন।

বয়আতের নবম শর্ত

কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট সকল জীবের সেবায় রত থাকবে এবং খোদাপ্রদত্ত নিজ শক্তি ও সম্পদ ব্যয়ে মানবজাতির যথাসাধ্য হিতসাধন করবে।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন–

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ
وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ ﴿۳۷﴾

(সূরা আন্ নিসা, ৪:৩৭)

অর্থাৎ, "আর তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে অন্যকিছুকে শরীক করো না, পিতামাতার সাথে সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, এতিম, অভাবী, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গীসহচর, পথচারী ও তোমাদের অধিকারভুক্তদের সাথেও (সদয় ব্যবহার কর)। নিশ্চয় অহংকারী ও দাম্ভিককে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।"

সবার সাথে সদাচরণের শিক্ষা

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, শুধু নিজের ভাই, আত্মিয়স্বজন, পরিচিতজন এবং প্রতিবেশীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করো না, কেবল তাদের প্রতিই সহমর্মিতা প্রদর্শন করো না, সাহায্যের প্রয়োজন হলে কেবল তাদেরই সাহায্য ও যথাসাধ্য উপকার সাধন করো না, বরং যাদেরকে এবং যেসব প্রতিবেশীদের তোমরা চেনো না, যাদের সাথে তোমাদের কোন আত্মিয়তা বা উঠা-বসার সম্পর্ক নেই, যাদের সাথে তোমাদের ক্ষণিকের পরিচয় হয়েছে মাত্র এদের ক্ষেত্রেও যদি তোমার সহমর্মিতা এবং তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে,

তোমাদের মাধ্যমে যদি তারা কিছুটা হলেও উপকৃত হতে পারে তবে তাদের সেই উপকার সাধন কর। এর মাধ্যমে একটি সুন্দর ইসলামী সমাজ গড়ে উঠবে। সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টজীবের উপকার সাধনের বৈশিষ্ট্য ও গুণ নিজের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে এবং এই পুণ্যকে সাধারণ পুণ্যকর্ম সাধনের গণ্ডির উর্ধ্বে অনুগ্রহের পর্যায়ের পুণ্য মনে করতে হবে। আর অনুগ্রহ কখনও প্রতিদান লাভের আশায় করা হয় না। অনুগ্রহ মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকে। এর ফলে এমন সুন্দর একটি সমাজ গড়ে উঠবে, যেখানে স্বামী-স্ত্রীর বিবাদবিসংবাদ থাকবে না, শাশুড়ি-বউয়ের ঝগড়াও থাকবে না, ভাইয়ে ভাইয়ে কোন দ্বন্দ-কলহ থাকবে না, প্রতিবেশীর সাথে প্রতিবেশীর কোন বিতণ্ডা থাকবে না। সেখানে এক পক্ষ অপর পক্ষের সাথে অনুগ্রহের আচরণ করবে এবং অপর পক্ষের অধিকার মমতাপূর্ণ আবেগ নিয়ে আদায় করতে সচেষ্ট থাকবে। আর তারা কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি ও ভালোবাসা লাভের জন্য এসব কাজ সম্পাদন করবে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এ বিষয়টির প্রয়োজনিয়তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যদি এসব কাজ সম্পাদন না কর, তাহলে তোমরা অহংকারী আখ্যায়িত হবে আর আল্লাহ্ অহংকার পছন্দ করেন না। অহংকার এমন এক ব্যাধি, এর থেকেই সকল বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যের সূচনা হয়। বয়আতের সপ্তম শর্তে এ বিষয়টি পূর্বে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে, তাই এখানে অহংকার সম্পর্কে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই। সারকথা হলো, সৃষ্টির প্রতি সহমর্মি হও, যেন তোমরা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে প্রিয়ভাজন হতে পার এবং উভয় জগতে সফলতা লাভ করতে পার। আর একে অপরের প্রতি যে অনুগ্রহ করবে, তা ভালোবাসার টানেই করবে, অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে খোঁটা দেয়ার জন্য নয়।

আল্লাহ্ তালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ۝٩

(সূরা আদ্ দাহর, ৭৬:৯)

অর্থাৎ, এবং খাবারের প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও তারা মিসকিন, এতীম ও বন্দীদের খাবার খাওয়ায়।

এর একটি অর্থ হলো, যদিও তাদের নিজেদের অভাব থেকে থাকে তা সত্ত্বেও তারা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যেই অভাবীদের প্রয়োজনের প্রতি

যত্নবান থাকে। নিজেরা ক্ষুধার্ত থেকে তাদেরকে খাওয়ায়। দানকালে সংকীর্ণ মনেরও বহিঃপ্রকাশ ঘটায় না। অর্থাৎ, কাউকে যা কিছু দিচ্ছে তা পরিমাণে এত অল্প নয় যে, গ্রহীতার প্রয়োজনই মেটাতে ব্যর্থ হবে আর ক্ষুধাও নিবারণ করতে পারবে না। বরং যথাসাধ্য সাহায্য করে এবং এ সবকিছু করে পুণ্য অর্জনের লক্ষ্যে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, কোন ধরণের খোঁটা দেয়ার জন্য নয়। এর আরেকটি অর্থ হলো, তাদের নিজেদেরও যা প্রয়োজন, অর্থাৎ দাতারও যেই জিনিসের প্রয়োজন থাকে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে তারা সেই জিনিসও দান করে। 'আল্লাহ্‌র খাতিরে তা দান কর যা তোমরা নিজেদের জন্য পছন্দ কর'– মর্মে নির্দেশ সর্বদাই তারা দৃষ্টিপটে রাখে। অনেকে নিজেদের কোন অভাবী ভাইকে সাহায্য করে পরবর্তীতে সেই অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে খোঁটা দিতে থাকে– এমনটি হওয়া উচিত হয়। অদ্ভুত স্বভাবের এমন অনেক লোকও আছে, যারা কোন উপহার দিলে নিজেদের ব্যবহৃত জিনিস থেকেই দেয় বা ব্যবহৃত কাপড় দিয়ে থাকে। এমন প্রকৃতির লোকদের উচিত, নিজের ভাই-বোনদের আত্মসম্মানের প্রতি যত্নবান থাকা। সামর্থ্য যদি না থাকে তাহলে উপহার না দেয়াই শ্রেয় বা একথা স্পষ্ট বলে দেয়া উচিত, এটি আমার ব্যবহৃত জিনিস, তুমি নিতে চাইলে আমি দিতে পারি।

অনেকেই আবার লিখেন, আমরা গরীব মেয়েদের বিয়ের জন্য ভালো কাপড়-চোপড় দিতে চাই যেগুলো আমরা এক-আধ দিন পরেছি, যা ছোট হয়ে গেছে অথবা কোন কারণে ব্যবহার করতে পারি নি। এমন ক্ষেত্রে স্পষ্ট হওয়া উচিত, এমন জিনিস অঙ্গসংগঠনসমূহ লাজনা বা খোদ্দামুল আহমদীয়ার মাধ্যমেই দেয়া হোক বা ব্যক্তিগত পর্যায়েই দেয়া হোক না কেন অঙ্গসংগঠনকেও এটিই বলা হয়ে থাকে যে, এমন লোকেরা জিনিস দেয়ার ক্ষেত্রে যেন গরীবদের আত্মসম্মানের বিষয়ে যত্নবান থাকেন। আর সেই জিনিস, দেবার যোগ্য হলে তবেই যেন দেয়া হয়। এমন (পরিত্যক্ত) কাপড় যা ব্যবহারের একেবারেই অযোগ্য, তা যেন দেয়া না হয়। দাগ লেগে আছে বা কাপড় থেকে ঘামের দুর্গন্ধ আসছে এমন জিনিস দেয়া শোভনীয় নয়। গরীবেরও আত্মসম্মানবোধ রয়েছে, এর প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে। এমন কাপড় যদি দিতেই হয় তাহলে ধুয়ে পরিষ্কার করে, পরিপাটি করার পর দেয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন আমি আগেও বলেছি, আমাদের অঙ্গসংগঠনগুলো যেমন লাজনা ও অন্যান্য সংগঠন কাপড় প্রভৃতি বিতরণ করে থাকে। যাদেরকে এসব জিনিস দিতে হয় তাদের কাছে

এটি স্পষ্ট করতে হবে যে, এটি ব্যবহৃত জিনিস। যে নিচ্ছে সে যেন এটি স্বেচ্ছায় নেয়। প্রত্যেকেরই আত্মসম্মানবোধ রয়েছে, আমি এর আগেও বলেছি, এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন আছে এবং খুবই গুরুত্বের সাথে এর প্রতি খেয়াল রাখা দরকার।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) পবিত্র কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গে বলেন:

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ۝

(সূরা আদ্ দাহ্র, ৭৬:৯)

অর্থাৎ, "... স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যকে খুবই ভালোবাসেন এবং তিনি চান যে, তাঁর সৃষ্টজীবের প্রতি সহানুভূতি বা সহমর্মিতা প্রদর্শন করা হোক। পাপ পছন্দ করলে তিনি পাপ করার নির্দেশ দিতেন কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সত্তা এ থেকে পবিত্র, সুবহানাল্লাহু তালা শানুহু।... অতএব, যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখ স্মরণ রেখো, প্রত্যেকের সাথে তোমরা সহমর্মিতা প্রদর্শন করবে, তা সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন, কোনরূপ ভেদাভেদ না করে সবার সাথে পুণ্য কর। কেননা, এটিই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা।

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ۝

(সূরা আদ্ দাহ্র, ৭৬:৯)

বন্দী হিসাবে তখন যারাই আসতো তাদের অধিকাংশ কাফেরই ছিল। এখন লক্ষ্য কর, ইসলামের সহমর্মিতার শিক্ষা কত পরম মার্গের। আমার মতে পূর্ণাঙ্গীন নৈতিক শিক্ষা ইসলাম ছাড়া আর কারো ভাগ্যে জোটে নি। আমি সুস্থ হলে চারিত্রিক শিক্ষা প্রসঙ্গে একটি পৃথক পুস্তিকা লিপিবদ্ধ করব। কেননা, আমি চাই, আমার সব ইচ্ছা বা অভিপ্রায় যেন প্রকাশিত হয়। আর আমার জামা'তের সামনে যেন একটি পূর্ণাঙ্গীন শিক্ষা থাকে আর এর মাঝে যেন আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথ কীভাবে অন্বেষণ করতে হয় তা বিধৃত থাকে। প্রায়শই আমি যখন দেখি ও শুনি যে, কেউ এ কাজ করেছে, কারো হাতে এই কাজ সাধিত হয়েছে, তখন আমার খুবই কষ্ট হয়। আমার হৃদয় এসব কথা ও বিষয়াবলী শুনে মোটেই প্রীত হয় না। আমি আমার জামা'তকে এখনও সেই শিশুর মতই দেখতে পাচ্ছি, যে দু-পা চলতে গিয়ে চারবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। কিন্তু আমি বিশ্বাস রাখি,

খোদা তা'লা এ জামা'তকে উৎকর্ষতা দান করবেন। তাই তোমরাও প্রচেষ্টা, পরিকল্পনা, কঠিন সাধনা এবং আকুতি ভরা দোয়ায় রত থাক যেন খোদা তা'লা নিজ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। কেননা, তাঁর ফযল বা অনুগ্রহ ছাড়া কিছুই সাধিত হওয়া সম্ভব নয়। যখন তাঁর ফযল অবতীর্ণ হয় তখন সকল পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। (মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৮-২১৯, নব সংস্করণ)

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্রকরণ শক্তির মাধ্যমে এবং তার শিক্ষা অনুযায়ী চলার ফলে অনেক রোগব্যাধি জামা'ত থেকে দূর হয়ে গিয়েছিল, যেগুলো নিয়ে তিনি সেসময় উদ্বিগ্ন থাকতেন। আর আল্লাহ তা'লার কৃপায় একটি বড় অংশ এসব ব্যাধি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু আমরা সেযুগ ও সেসময় থেকে যতটা দূরে যাচ্ছি সমাজের কিছু কদাচারকে ভর করে শয়তানও আক্রমণ করে চলছে। তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, তাঁর শিক্ষা অনুসারেই পরিকল্পনা ও আকুতিভরা দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যাচনা করে এসব অপকর্ম বা পাপ থেকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট থাকা উচিত, যেন আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তকে স্থায়ীভাবে উন্নতির পরম মার্গে স্থান দিয়ে রাখেন।

এখন আমি এ সংক্রান্ত কিছু হাদীস উপস্থাপন করছি–

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত, "রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামতের দিন বলবেন– হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম তুমি আমার সেবা-শুশ্রূষা কর নি'। বান্দা বলবে– 'হে আমার প্রভু, তুমি সারা বিশ্বের প্রতিপালক। আমি তোমার সেবা-শুশ্রূষা কীভাবে করতে পারি'? আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, 'আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল তুমি তা জানতে পেরেও তার সেবা-শুশ্রুষা কর নি। তুমি তার শুশ্রূষা করলে তুমি আমাকে তার পাশে পেতে– এটি কি তুমি জানতে না'?

'হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, তুমি দাও নি'। এটি শুনে আদম সন্তান বলবে, 'হে আমার প্রভু! তুমি তো বিশ্বপ্রতিপালক। আমি কীভাবে তোমাকে খাওয়াতে পারি'? আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, 'তোমার কি মনে নেই আমার অমুক বান্দা খাবার চেয়েছিল, তুমি তাকে খাবার খাওয়াও নি। তুমি যদি তাকে খাবার খাওয়াতে তাহলে তুমি আমার কাছে এর প্রতিদান পেতে, তুমি কি এটি জানতে না'?

'হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে পানি পান করাও নি'। আদম সন্তান বলবে, 'হে আমার প্রভু! তুমিই তো সারা বিশ্বের প্রতিপালক। তোমাকে আমি কীভাবে পানি পান করাতে পারি'? এতে আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, 'আমার অমুক পিপাসার্ত বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল কিন্তু তুমি তাকে পানি পান করাও নি। তুমি তাকে পানি পান করালে এর প্রতিদান তুমি আমার কাছে পেতে'।" (মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলা বাবু ফাজলে ইয়াদাতিল মারীযে)

আরেক বর্ণনায়:
হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, "রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'সকল সৃষ্টি-প্রাণীকূল আল্লাহ্র পরিবার-পরিজন। অতএব, আল্লাহ্ তা'লার কাছে তাঁর সৃষ্টজীবের মাঝে সে-ই প্রিয়ভাজন, যে তাঁর অধীনস্ত ও সৃষ্টজীবের সাথে দয়ার্দ্র আচরণ করে এবং তাদের প্রয়োজনের প্রতি যত্নবান থাকে'।" (মিশকাত, বাবুশ শাফকাতে ওয়ার রাহমাতে আলাল খালকে)

আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায়, হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত:
"রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'একজন মুসলমানের কাছে অপর মুসলমানের ৬টি অধিকার প্রাপ্য।

১. তার সাথে সাক্ষাৎ হলে **'আসসালামু আলাইকুম'** বলা।

২. সে হাঁচি দিলে **'ইয়ারহামুকাল্লাহ্'** বলা।

৩. সে অসুস্থ হলে তার শুশ্রূষার জন্য যাওয়া। আল্লাহ্ তা'লার ফজলে অনেকেই নিজে থেকেই এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখেন এবং হাসপাতালে গিয়ে পরিচিত-অপরিচিত রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করেন। তাদের জন্য ফলফলাদি নিয়ে যান, ফুল নিয়ে যান। এটি সত্যিই খুব ভাল অভ্যাস। আর খেদমতে খালকের (সৃষ্টির সেবার) এই পদ্ধতি খুবই ভাল।

৪. সে ডাকলে তার ডাকে সাড়া দেওয়া।

৫. সে মারা গেলে তার জানাযায় শামিল হওয়া।

৬. নিজের জন্য যা পছন্দ কর, অপরের জন্যও তা-ই পছন্দ করা। আর তার অবর্তমানে তার কল্যাণ কামনা করা'।" (সুনান দারেমী, কিতাবুল ইস্তিযান, বাব ফী হাক্কীল মুসলিমে আলাল মুসলিমে)

অপর এক বর্ণনায়ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, "রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'একে অপরকে হিংসা করো না। একে অন্যের ক্ষতি সাধনের জন্য প্রতিযোগিতামূলকভাবে (পণ্যের) অলীক মূল্য বৃদ্ধি করো না। একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ রেখো না। একে অপরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না অর্থাৎ, সম্পর্কহীনতামূলক ব্যবহার করো না। একজনের দামদর করার সময়ে অপরজন দাম করবে না। আল্লাহ্ তা'লার বান্দা হিসেবে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাক। মুসলমান, ভাইয়ের প্রতি অন্যায় করতে পারে না। তাকে হীন-জ্ঞান করতে পারে না, তাকে লজ্জিত করতে পারে না। তিনি (সা.) নিজ বুকের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, **তাক্ওয়া হা হুন্না** অর্থাৎ, 'তাক্ওয়া এখানে'। এ বাক্যটি তিনি তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন। এরপর বলেন, নিজের কোন মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখাটাই কোন মানুষের দুর্ভাগা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্পদ, সম্মান ও সম্ভ্রম অন্য মুসলমানের জন্য হারাম বরং মর্যাদা লাভ-যোগ্য'।" (মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস্ সিলাহ, বাবু তাহরীমে যুলমিল মুসলিমে ওয়া খাযলিহে)

আরেক বর্ণনায় রয়েছেঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের জাগতিক কোন অস্থিরতা ও কষ্ট বা সমস্যা লাঘব করেছে এবং যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্তের সাহায্যের ব্যবস্থা করেছে আর তার জন্য কোন বিষয় সহজসাধ্য করেছে, আল্লাহ্ তা'লা পরকালে তার জন্য স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষত্রুটির গোপনীয়তা রক্ষা করে, আল্লাহ্ তা'লা পরকালে তার দুর্বলতাও ঢেকে রাখবেন। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে, আল্লাহ্ তা'লা তার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকেন। যে ব্যক্তি জ্ঞানের অন্বেষায় বের হয়, আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। যারা মসজিদের কোন কোনায় বসে আল্লাহ্ তা'লার কিতাব পাঠ করে এবং এর পঠন-পাঠনে লেগে থাকে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য সুখ ও প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন, আল্লাহ্ তা'লার রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে রাখে। ফেরেশ্তারা তাদেরকে নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ঘিরে রাখে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্তদের কাছে তাদের কথা উল্লেখ করেন। যে ব্যক্তি আমলের ক্ষেত্রে শিথিলতা দেখায়, তার বংশ ও পরিবার তার

পুণ্যকর্মে গতি সঞ্চার করতে পারে না অর্থাৎ, বংশের জোরে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না'।" (মুসলিম, কিতাবুল যিকর, বাব ফাযলুল ইজতেমায়ে আলা তেলাওয়াতিল কুরআনে ওয়া আলায্ যিকরে)

এতে প্রথম দিকে বর্ণনা করা হয়েছে, তোমরা মানুষের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট থাক এবং নিজ ভাইয়ের অস্থিরতা এবং কষ্ট ও সমস্যাবলী দূর কর; তাহলে পরকালে আল্লাহ্ তোমাদের সাথে অনুরূপ স্নেহের আচরণ করবেন এবং তোমাদের অস্থিরতা এবং সমস্যাবলী দূর করে দিবেন। আমাদের প্রতি এটি মহানবী (সা.)-এর অনেক বড় অনুগ্রহ। তিনি (সা.) বলেন, তোমরা সচেষ্ট হলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমার চাদরে আবৃত করে নিবেন। অস্থিরতা ও দুঃখ-কষ্টে নিপতিত এবং অভাবগ্রস্থদের জন্য তুমি যেভাবে স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেছ, তাদের আরামের ব্যবস্থা করেছ, অনুরূপভাবেই আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের প্রতি স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করবেন। নিজ ভাইয়ের দোষত্রুটি ঢেকে রাখ, তার কোন দোষ ধরে এর প্রচার করো না। কে জানে! তোমার মাঝে কত-সব দুর্বলতা আছে, আরো রয়েছে কত-শত দোষত্রুটি, যার হিসাব পরকালে তোমাকে দিতে হবে। তাই এ দুনিয়াতে তুমি যদি তোমার ভাইয়ের কোন দোষত্রুটি ঢেকে রাখ, কোন দোষ দেখে থাকলে সমালোচনা না করে তার সহমর্মী হয়ে তাকে বুঝানোর চেষ্টা কর, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমার সাথেও দোষত্রুটি গোপন রাখার আচরণ করবেন। এগুলোই হল 'হুকুকুল ইবাদ' বা বান্দার অধিকার। এসব অধিকার আদায় করলে তোমরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের ভাগীদার হবে।

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) বলেছেন, 'সদকা বা দান-খয়রাত করলে সম্পদ কমে না। যে ব্যক্তি অন্যের অপরাধ ক্ষমা করে আল্লাহ্ তা'লা তাকে আরো সম্মান দান করেন। অধিকন্তু কারো অপরাধ ক্ষমা করলে সম্মানের কোন হানি হয় না'।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খণ্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) বর্ণিত হাদীসঃ "মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে দয়া প্রদর্শন করবে রহমান খোদা তার প্রতি দয়া করবেন। তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া কর, তাহলে ঊর্ধ্বালোকবাসীরা তোমাদের প্রতি দয়া করবেন'।" (আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাব ফির রাহ্মাতে)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

"এ কথাটি গুরুত্বের সাথে স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ তা'লার দু'টি বিশেষ নির্দেশ রয়েছে। প্রথমত তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। সত্তার দিক থেকেও নয়, গুণাবলীর দিক থেকেও নয় আর ইবাদতের ক্ষেত্রেও নয়। আর দ্বিতীয়ত সকল মানুষের সাথে সদাচরণ-সহমর্মিতা প্রদর্শন কর। কেবল নিজ ভাই ও আত্মীয়-স্বজনের সাথেই অনুগ্রহের আচরণ করবে– এহসান বা অনুগ্রহ বলতে কেবল এটুকু বুঝায় না। বরং অনুগ্রহ বলতে যা বুঝায় তা হল, যে-ই হোক, যে কোন আদম সন্তান হোক বা আল্লাহ্-সৃষ্ট জীবের যে-ই হোক, তার সাথে অনুগ্রহের আচরণ করতে হবে। সে, হিন্দু নাকি খ্রিষ্টান তা চিন্তা করো না। আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের বিচারের ভার আল্লাহ্ তা'লা নিজ হাতে রেখেছেন। তোমরা নিজেরা, নিজেদের বিচার কর এটি তিনি চান না। নম্রতা ও বিনয় যত বেশি অবলম্বন করবে আল্লাহ্ তা'লা ততই তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। তোমরা তোমাদের শত্রুদের খোদার হাতে ছেড়ে দাও। কিয়ামত সন্নিকট, শত্রু তোমাদেরকে যেসব দুঃখকষ্ট দেয় তাতে তোমাদের বিচলিত হওয়া উচিত নয়। আমি দেখতে পাচ্ছি, এখনও তোমাদের আরো অনেক দুঃখ-যাতনা সইবার আছে। কেননা, ভদ্রতার গণ্ডি থেকে যারা বেরিয়ে যায়, তাদের মুখ সেভাবে চলে, বাঁধ ভেঙ্গে গেলে পানির ঢল যেমন সবেগে প্রবাহিত হয়। অতএব, ধার্মিক ব্যক্তির উচিত, নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখা।" (মলফুযাত, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৪-১৬৫)

তিনি (আ.) আরো বলেন:

"স্মরণ রেখো, অধিকার দু'ধরণের। একটি হল– আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অধিকার, অপরটি বান্দাকে প্রদেয় অধিকার। আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অধিকার প্রদানে ধনী লোকদের সমস্যা হয় কারণ অহংকার ও আত্মম্ভরিতা তাদেরকে বঞ্চিত করে দেয়। যেমন, নামাযের সময় একজন দরিদ্র ব্যক্তির পাশে দাঁড়াতে তার খারাপ লাগে, তাদেরকে নিজের কাছে বসাতে পারে না আর এভাবে আল্লাহ্‌র অধিকার আদায় থেকে বঞ্চিত হয়। কেননা, মসজিদ মূলত 'বাইতুল মাসাকীন' অর্থাৎ, দীনহীনদের ঘর। এখানে যাওয়াকে তারা নিজেদের সম্মানের পরিপন্থী মনে করে। আর একইভাবে এরা বান্দার অধিকার প্রদানে বিশেষ বিশেষ সেবা বা কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না। গরীব ব্যক্তি সব ধরণের খেদমতের জন্য প্রস্তুত থাকে। তারা পা-ও টিপতে পারে, পানি আনতে পারে, কাপড়ও ধুতে

পারে, এমনকি সে যদি মল পরিস্কারের সুযোগও পায় এতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। কিন্তু ধনীরা এমন কাজে দ্বিধা–সংকোচ বোধ করে। আর এভাবে তারা এথেকেও বঞ্চিত থাকে। মোটকথা প্রাচুর্যও অনেক ক্ষেত্রে পুণ্যার্জনে বাধা সৃষ্টি করে। হাদীসে যেমন বর্ণিত হয়েছে, দরিদ্ররা ৫ শত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে, এর মর্ম এটিই।" (মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৮, নব সংস্করণ)

তিনি (আ.) আরো বলেনঃ

"অতএব, সৃষ্টজীবের সাথে সহমর্মিতা এমন একটি বিষয়, মানুষ যদি এটি ছেড়ে দেয় এবং এ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তাহলে সে-ও ক্রমান্বয়ে পশুতে রূপান্তরিত হতে থাকে। মানুষের মনুষ্যত্বের দাবি এটি এবং সে ততক্ষণই মানুষ আখ্যায়িত হতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত অনুগ্রহ ও সদাচরণের সাথে সে মানুষের মাঝে বসবাস করে এবং এই সদ্ব্যবহার করায় কোন ভেদাভেদ করে না। শেখসাদী যেমন বলেছেন, 'আদম সন্তান একে অপরের অঙ্গ'।

মনে রাখবে, আমার দৃষ্টিতে সহনশীলতার পরিধি অনেক ব্যাপক। কোন জাতি বা ব্যক্তিকে এর গণ্ডির বাইরে রাখবে না। বর্তমান যুগের কিছু নির্বোধের মত আমি বলব না যে, তোমরা তোমাদের সহনশীলতার পরিধি কেবল মুসলমানের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখ, বরং আমি বলব, তোমরা হিন্দু-মুসলমান বা যে-ই হোক না কেন আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্টজীবের সাথে সদাচরণ কর। কেবল স্বজাতির মধ্যে যারা সহমর্মিতা বা সদাচরণ সীমাবদ্ধ করে রাখে এমন লোকদের কথা আমি পছন্দ করি না।" (মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৬-২১৭, নব সংস্করণ)

এরপর তিনি (আ.) বলেনঃ

"মোটকথা মানবজাতির প্রতি স্নেহাচরণ ও সহমর্মিতা অনেক বড় ইবাদত এবং এটি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের খুবই কার্যকর একটি উপায়। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি, এক্ষেত্রে অনেক দুর্বলতা দেখানো হয়ে থাকে। অন্যদের হীন জ্ঞান করা হয়, ঠাট্টা ও তামাশার লক্ষ্যস্থল বানানো হয়, তাদের খেয়াল রাখা এবং কারো সমস্যা ও দুঃখকষ্টে সাহায্য করা তো দূরের কথা, গরীবদের সাথে যারা ভাল ব্যবহার করে না তাদের ব্যাপারে আমি শঙ্কিত, পাছে তারা নিজেরাই সেই সমস্যা ও দুঃখকষ্টে নিপতিত হয়। যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা প্রাচুর্য দান করেছেন তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হলো, তাঁর সৃষ্ট জীবের প্রতি অনুগ্রহ করা এবং সদাচরণ করা, খোদা-প্রদত্ত সেই অনুগ্রহ বা সম্পদের

কারণে অহংকার না করা এবং দরিদ্রদেরকে বন্যদের ন্যায় পদপিষ্ট না করা।” (মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৮-৪৩৯, নব সংস্করণ)

তিনি (আ.) আরও বলেন:
“পবিত্র কুরআন পিতামাতা, সন্তানসন্ততি, আত্মীয়স্বজন এবং অভাবীদের অধিকার, যে বিভিন্ন হারে বর্ণনা করেছে, আমার পর্যবেক্ষণে আর কোন ধর্মগ্রন্থে এতটা উল্লেখ নাই।

যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ﴿۳۷﴾

(সূরা আন্ নিসা, ৪:৩৭)

অর্থাৎ, ‘আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে অন্যকিছুকে শরীক করো না, পিতামাতার প্রতি সদয় হও এবং তাদের সাথেও সদ্ব্যবহার কর যারা তোমার নিকটাত্মীয়, (নিকট আত্মীয়ের মাঝে সন্তান, ভাই এবং কাছের ও দূরের সকল আত্মীয় অন্তর্ভুক্ত)। এরপর আরো বলেছেন, এতীমদের সাথেও সদ্ব্যবহার কর, অভাবীদের সাথেও এবং এমন প্রতিবেশীদের সাথেও যারা নিকট আত্মীয় আবার এমন প্রতিবেশীর সাথেও যারা অপরিচিত। আর এমন সঙ্গী যারা কোন কাজে সহকর্মী বা সহযাত্রী, নামাযের সাথী ও সহপাঠী, এছাড়া যারা মুসাফির তাদের সাথেও অধিকন্তু যে সব প্রাণী তোমাদের করায়ত্বে রয়েছে সবার সাথে উত্তম ব্যবহার কর। আর খোদা তা'লা এমন ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব রাখেন না যে অহংকারী ও দাম্ভিক এবং যে অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না’।” (চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, ২৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৮-২০৯)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এ প্রসঙ্গে বলেন:
“খাবার যোগান দেয়ার উদ্দেশ্য এটা হওয়া উচিত,

اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ﴿۱۱﴾

(সূরা আদ্ দাহর, ৭৬:১১)

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (আসন্ন) এক ভীতিপূর্ণ (ও) ভয়ঙ্কর দিনের আশংকা করি।”

আমরা আমাদের প্রভুর কাছে সেই দিনকে ভয় করি যা **আবুস্** ও **কামতারীর**। **'আবুস্'** অর্থ অভাব-অনটন এবং **'কামতারীর'** অর্থ দীর্ঘ। অর্থাৎ, কিয়ামতের দিনটি হবে বড় কষ্টের ও দীর্ঘ। ক্ষুধার্তদের সাহায্য করলে আল্লাহ্ তা'লা দুর্ভিক্ষের অনটন এবং এর দীর্ঘ ব্যাপ্তিকাল থেকে মুক্তি দান করেন। এর ফলশ্রুতিতে যা হয় তা হলো,

فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ﴿۱۲﴾

(সূরা আদ্ দাহ্‌র, ৭৬:১২)

অর্থাৎ, আল্লাহ্ সেদিনের অকল্যাণ থেকে তাদের রক্ষা করেন আর এই রক্ষা করাও আনন্দ ও সজীবতার অংশ।

আমি আবারও বলছি, মনে রাখবে বর্তমান যুগে অভাবগ্রস্থ এবং ক্ষুধার্তদের সাহায্য করার মাধ্যমে দুর্ভিক্ষের যুগের অনটন থেকে রক্ষা পাবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এবং তোমাদেরও তৌফিক দান করুন, আমরা বাহ্যিক সম্মানের জন্য যেভাবে চেষ্টাসাধনা করি পরকালের সম্মান ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্যও যেন সেভাবেই চেষ্টা করতে পারি। আমীন! (হাকায়েকুল ফুরকান, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯০-২৯১)

এটি আহমদীয়া জামা'তের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যে, এ জামা'ত যতটুকু সামর্থ্য আছে সে অনুযায়ী সৃষ্টিসেবার কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করে। যতটুকু সামর্থ্য ও উপকরণ রয়েছে তার মধ্য থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং জামা'তি পর্যায়েও যথাসম্ভব খেদমতে খালক বা মানবতার সেবা করে থাকে। জামা'তের সদস্যরা সামর্থ্য অনুযায়ী ক্ষুধা নিবারণ, গরীবদের চিকিৎসা, তাদের শিক্ষা-সাহায্য এবং গরীবদের বিয়েশাদীর জন্য জামা'তের তত্ত্বাবধানে সাহায্য প্রদানে অংশ নিয়ে বয়আতের অঙ্গীকার পালন করে আর এটি করাও উচিত। আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন কখনও সেসব জাতি ও রাষ্ট্রের মত না হই, যারা নিজেদের উদ্বৃত্ত নষ্ট করে ফেলে কিন্তু দুঃখকষ্টে নিপতিত দেখেও নিরঙ্কুশ মানবসেবায় তাদের জন্য খরচ করে না। কেননা, সেসব দেশের সাথে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত নেই আর সেসব দেশ তাদের সব কথা পরিপূর্ণভাবে মেনে চলা এবং তাদের ডিক্টেশন মেনে নিতে প্রস্তুত নয়, আর এ কারণে শাস্তিমূলক ভাবে তাদের অনাহারে ও উলঙ্গ থাকতে বাধ্য করা হয়। আল্লাহ্

তা'লা আহমদী জামা'তকে পূর্বের তুলনায় আরো বেশি নিঃস্বার্থভাবে আর্ত-মানবতার সেবা করার তৌফিক দান করুন।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই, জামা'তীভাবে এই যে মানবতার সেবা হচ্ছে– জামা'তের নিষ্ঠাবান সদস্যদের আল্লাহ্ তালা সে তৌফিকও দিচ্ছেন। তারা অনেকে বড় অংকের টাকাও দিচ্ছেন যার মাধ্যমে মানব-সেবা করা হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আফ্রিকা, রাবওয়া এবং কাদিয়ানেও জীবন ওয়াকফকারী ডাক্তার এবং শিক্ষকরা সেবা প্রদান করে যাচ্ছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। কিন্তু আমি সকল আহমদী ডাক্তার ও সকল আহমদী শিক্ষক এবং প্রত্যেক আহমদী উকিল আর প্রত্যেক সেই আহমদীকে, যার নিজ ক্ষেত্রে কোন ধরণের মানবসেবা করার সুযোগ আছে অর্থাৎ, গরীব ও অভাবীদের উপকারে আসতে পারে এমন সকলকে বলছি, তারা যেন অবশ্যই গরীব ও অভাবীদের জন্য মঙ্গলজনক সাব্যস্ত হবার চেষ্টা করে। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লা আপনার ধন ও জন-সম্পদে পূর্বের তুলনায় আরো বেশি বরকত দান করবেন, ইনশাআল্লাহ্। আর আপনারা সবাই যদি এসব সেবা এই উদ্দেশ্যে করেন যে, যুগইমামের হাতে বয়আতের এক অঙ্গীকার আমরা করেছি যা পূর্ণ করা আমাদের জন্য আবশ্যক, তাহলে দেখবেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও করুণাবারি কত অসাধারণভাবে বর্ষিত হয়, যা ধারণ করার ক্ষমতা মানুষের নাই!

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং মানবজাতির প্রতি সহমর্মিতা

মানবজাতির প্রতি সহমর্মিতা, বিশেষত নিজ ভাইদের প্রতি সহানুভূতি ও তার পাশে দাড়ানোর বিষয়ে নসীহত করতে গিয়ে এক স্থানে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

"আমার নিজের মনের অবস্থা হলো নামাযরত অবস্থায় কষ্টে নিপতিত কোন ব্যক্তির কাতরানো যদি আমার কানে পৌঁছে যায় নামায ভেঙ্গে হলেও তার কোন উপকার যদি সাধন করা সম্ভব হয় করব, তার প্রতি যতটা সম্ভব আমি সহমর্মিতা প্রদর্শন করব। কোন ভাইয়ের সমস্যা ও বিপদের সময় পাশে না থাকা নৈতিকতা পরিপন্থী। তোমরা যদি তার জন্য কিছু করতে না পার তাহলে কমপক্ষে তার জন্য দোয়া-ই কর। স্বজনদের তো বটেই, আমি বলব, অন্যদের

সাথে এবং হিন্দুদের সাথেও একই নৈতিক আদর্শ দেখাও এবং তাদের সাথেও সদাচরণ কর। ভ্রুক্ষেপহীন প্রকৃতি আদৌ প্রদর্শন করা উচিত নয়।

একবার আমি হাঁটতে বেরিয়েছিলাম, আমার সাথে আব্দুল করিম নামে জনৈক পাটোয়ারী ছিল। সে আমার থেকে কিছুটা এগিয়ে ছিল আর আমি ছিলাম একটু পেছনে। পথিমধ্যে ৭০/৭৫ বছর বয়সের জীর্ন-শীর্ণ এক বৃদ্ধার সাথে সাক্ষাৎ হয়। এই বৃদ্ধা তাকে একটি চিঠি পড়ে শুনাতে বলল, কিন্তু সে তাকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দিল। আমি মর্মাহত হলাম। সেই বৃদ্ধা চিঠিটি আমাকে দিলে আমি তার চিঠিটি নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম আর পুরোটা তাকে পড়ে শুনালাম ও ভালোভাবে ধীরে-সুস্থে বুঝিয়ে দিলাম। এতে আব্দুল করীম খুবই লজ্জিত হল। কেননা, দাঁড়াতে তো তার হলোই অথচ পুণ্য থেকেও বঞ্চিত রয়ে গেল। (মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮২-৮৩, নতুন সংস্করণ)

তিনি (আ.) আরও বলেন:
"তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর আর জিহ্বা, হাত বা অন্য কোন উপায়ে অন্যায় আচরণ করো না এবং সৃষ্টজীবের মঙ্গল সাধনে সচেষ্ট হও। কারো সাথে সে তোমার অধীনস্থ হলেও অহংকার করো না। কেউ গালি দিলেও তুমি তাকে গালি দেবে না। বিনয়ী, সহিষ্ণু, সদুদ্দেশ্যপরায়ণ ও সৃষ্টজীবের প্রতি সহানুভূতিশীল হও, যেন খোদা তা'লার নিকট গ্রহণীয় হতে পার। ...বড় হয়ে ছোটকে অবজ্ঞা করবে না, তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। বিদ্বান হলে আত্মগরিমাবশত বিদ্যাহীনদের অবজ্ঞা না করে সদুপদেশ দিবে। ধনী হলে আত্মশ্লাঘাবশত দরিদ্রের প্রতি অহংকার না করে তাদের সেবা করবে। ধ্বংসের পথসমূহকে ভয় কর।" (কিশতিয়ে নূহ্‌, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১-১২)

তিনি (আ.) আরো বলেন:
"মানুষ তোমাদের দুঃখ দিবে এবং সকল ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করবে, তবুও আমার জামা'তের সদস্যদের উচিত হবে উত্তেজিত না হওয়া আর উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে কষ্টদায়ক কোন শব্দ উচ্চারণ না করা। আল্লাহ্‌ এমন লোকদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদের জামা'তকে একটি উৎকৃষ্ট নমুনা বা আদর্শ বানাতে চান।"

এরপর তিনি (আ.) আরো বলেন:
"আল্লাহ্‌ তা'লা মুত্তাকীকে ভালোবাসেন। আল্লাহ্‌ তা'লার মাহাত্ম্য স্মরণে

রেখে সবাই সচেতন দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে চল, আর মনে রাখবে আল্লাহ্‌র বান্দা সবাই, কারো প্রতি অন্যায় করবে না। কারো প্রতি কঠোর ব্যবহার করবে না আর কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না। জামা'তে যদি একজনও নোংরা লোক থাকে, সে পুরো জামা'তকে কলুষিত করে দেয়। যদি উত্তেজিত বোধ কর তাহলে নিজের হৃদয়কে বিশ্লেষণ কর যে, সেই উষ্মার কারণ বা উৎসমূল কী? এটি খুবই একটি স্পর্শকাতর বিষয়।" (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮-৯)

তিনি (আ.) বলেন:

"তোমরা এমন হয়ে যাও, যেন তোমাদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা এবং বিগলিত আকুতি-মিনতি আকাশে পৌঁছে যায়। খোদা তা'লা যার হৃদয় নিষ্ঠা ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ দেখতে পান, এমন ব্যক্তিকে তিনি নিশ্চিত নিরাপত্তা দান করেন এবং তাকে কল্যাণমণ্ডিত করেন। তিনি অন্তঃকরণ পরখ করেন ও পর্যালোচনা করেন, বাহ্যিক বা মৌখিক দাবিকে দেখেন না। যার অন্তঃকরণকে তিনি সব ধরণের মন্দ ও নোংরামি থেকে মুক্ত ও পবিত্র পান, সেই অন্তরে তিনি অবতরণ করেন এবং সেথায় নিজের ঘর বাঁধেন।" (মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮১, নব সংস্করণ)

তিনি (আ.) বলেন:

"আমি আবারো বলছি, যারা মানবহিতৈষী এবং ঈমান, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় পরিপূর্ণ ও নিটোল, নিশ্চয় তারা রক্ষা পাবে। অতএব, তোমরা নিজেদের মাঝে এসব গুণাবলী সৃষ্টি কর।" (মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৪, নব সংস্করণ)

তিনি (আ.) বলেন:

"তোমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এক না হওয়া পর্যন্ত তোমরা কখনও তাঁর কাছে গ্রহণীয় হবে না। বড় হয়ে ছোটকে অবজ্ঞা করো না, তার প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। জ্ঞানী হলে, আত্মপ্রচার করে বিদ্যাহীনকে তাচ্ছিল্য না করে সদুপদেশ দাও। ধনী হলে, আত্মম্ভরিতায় দরিদ্রের প্রতি অহংকার না করে তাদের সেবা কর। ধ্বংসের পথসমূহকে ভয় কর। সর্বদা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর।... কত হতভাগা সেই ব্যক্তি, যে আমার মাধ্যমে প্রচারিত আল্লাহ্‌র মুখনিঃসৃত বাণী মানে না। তোমরা যদি চাও আকাশে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তাহলে তোমরা দুই সহোদরের মত হয়ে যাও। তোমাদের মধ্যে সেই অধিক মহৎ, যে নিজ ভাইয়ের অপরাধ অধিক

ক্ষমা করে এবং হতভাগা সে, হঠকারিতা দেখিয়ে যে ক্ষমা করে না।” (কিশতিয়ে নূহ্, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২-১৩)

তিনি (আ.) বলেন:

“মূলত খোদা তা’লার সৃষ্টজীবের সাথে সহমর্মিতা দেখানো অনেক বড় বিষয় আর আল্লাহ্ তা’লা এটিকে গভীরভাবে ভালোবাসেন তাই তার প্রতি তিনি সহমর্মিতা দেখাবেন- এর চেয়ে বড় পাওয়া তার জন্য আর কি হতে পারে! সাধারণত পার্থিব জগতেও এটি দেখা যায়, কোন ব্যক্তির কোন সেবক বা চাকর যদি তার বন্ধুর কাছে যায় আর তার বন্ধু যদি তার চাকরের কোন যত্ন-আত্তির খেয়াল না করে তাহলে সেকি তার বন্ধুর প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারে? কখনও নয়, অথচ সে তাকে প্রত্যক্ষভাবে কোন কষ্ট দেয় নি, তবুও সেই চাকরের সেবা করা হলে ও তার সাথে সদাচরণ করা হলে মূলত সেই সদাচরণ হতো মালিকেরই সাথে। ঠিক একইভাবে, আল্লাহ্ তা’লার সৃষ্টজীবের সেবায় শিথিলতা দেখালে তিনিও কষ্ট পান। কেননা, তার কাছে তার সৃষ্ট সকল কিছু খুবই প্রিয়। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সৃষ্টজীবের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করে, মূলত সে তার খোদাকে সন্তুষ্ট করে।” (মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৫-২১৬, নব সংস্করণ)

আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এসব উপদেশ কার্যে রূপ দেয়ার শক্তিসামর্থ দান করুন। আর আমরা তার সাথে বয়আতে যে অঙ্গীকার করেছি তা তিনি পূর্ণ করারও তৌফিক দান করুন।

(জুমুআর খুতবা, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৩, মসজিদ ফজল, লন্ডন)

১০ বয়আতের দশম শর্ত

শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মা'রুফ বা ধর্মানুমোদিত সকল আজ্ঞা পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমৃত্যু এতে অটল থাকবে। আর এই ভ্রাতৃত্ববন্ধনে এমন মহান পর্যায়ে উপনীত থাকবে যার দৃষ্টান্ত জাগতিক কোন সম্পর্ক ও বন্ধনে এবং তাবৎ সেবক সুলভ অবস্থার মাঝে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং যুগখলীফার সাথে ভ্রাতৃত্বের নিবিড় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা জরুরী

বয়আতের এই শর্তে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নিচ্ছেন– এই ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমার সাথে যেন এক নিবিড় ভ্রাতৃত্ববন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। কিন্তু এখানে ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের যে বন্ধন সৃষ্টি হবে তা হবে, এর চেয়েও গভীরতর। কেননা, এখানে সম্পর্ক সমতার ভিত্তিতে সৃষ্টিই হচ্ছে না বরং তোমরা স্বীকারোক্তি দিচ্ছ যে, আগমনকারী মসীহ্‌কে মান্য করা খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ আর এজন্য আল্লাহ্‌র খাতিরে এ সম্পর্ক আমরা প্রতিষ্ঠা করছি। আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত ধর্মকে সমুন্নত রাখতে এবং ইসলামকে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানোর জন্য ও বিস্তৃতি দানের জন্য এই সম্পর্ক গড়ছি। ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া আর এই অঙ্গীকারকে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লালনপালন করলেই এই সম্পর্ক এই স্বীকারোক্তি সফল ও ফলপ্রসূ হতে পারে। এর পর, এটাও খেয়াল রাখতে হবে, এই সম্পর্ক যেন এখানেই এসে থেমে না যায় বরং প্রতিদিন যেন এতে আরো দৃঢ়তা আসে। এর দৃঢ়তা এত বেশি হওয়া উচিত, এর মান এতো উন্নত হওয়া উচিত যেন এর মোকাবেলায় জগতের সমস্ত আত্মীয়তা ও অন্যান্য সব

সম্পর্ক, বন্ধুত্ব তুচ্ছ সাব্যস্ত হয়। এমন অতুলনীয় ও দৃঢ় সম্পর্ক যেন সৃষ্টি হয় যার মোকাবেলায় অন্য সমস্ত আত্মীয়তা অসার-অর্থহীন দেখায়।

তিনি (আ.) আরো বলেন, হৃদয়ে এই ধারণা আসতে পারে, আত্মীয়তার গণ্ডিতে কখনও কিছু দেয়ার আর কখনো কিছু নেয়ার, কখনও কিছু মানার এবং কখনও মানানোর রীতি থাকে। তবে এখানে একথা স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, তোমাদের এই সম্পর্ক ভৃত্য ও সেবসের সম্পর্কও বরং এর চেয়েও অধিক। টু-শব্দ না করে তোমাদের এ আনুগত্য করা উচিত। তোমরা এটা বলতে শুরু করবে যে, এ কাজ এখন হবে না অথবা একাজ করা যাবে না– এই অধিকার কখনও তোমাদের নেই। যেহেতু তোমরা বয়আত করেছ আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তে শামিল হয়েছ, তাই তোমরা নিজেদের সব কিছু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দিয়ে দিয়েছ। এখন তোমাদের কাজ শুধুমাত্র তাঁর আদেশ-নিষেধের আনুগত্য করা। তাঁর শিক্ষার অনুসরণ করা। আর তাঁর (আ.) পরে যেহেতু খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাই যুগখলীফার আদেশ-নিষেধের ও নির্দেশনার অনুসরণ করাও তোমাদের কর্তব্য। তাই বলে এখানে এমনটা ভাবা উচিত নয় যে, সেবক বা চাকরের কাজ তো বাধ্য-বাধকতার কাজ, সেবা তাকে করতেই হয়। সেবক কখনও কখনও বিড়বিড় করে নিজের উস্মা প্রকাশও করে থাকে। এ জন্য সর্বদা মস্তিষ্কে এ কথা রাখা উচিত, এটা সেবক সুলভ একটা অবস্থা বটে, তবে এর চেয়েও বড় কিছু। কেননা, আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন, আবার আল্লাহ্ তা'লারই খাতিরে আনুগত্যের অঙ্গীকার আর এজন্যই ত্যাগ স্বীকারেরও অঙ্গীকার। কুরবানীর পুণ্য তখনই লাভ হয়, মানুষ যখন স্বেচ্ছায় কুরবানী করে। এটা এমন একটা শর্ত যা নিয়ে যতই ভাববেন হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভালোবাসায় ততই বিভোর হতে থাকবেন, আর জামা'তের ব্যবস্থাপনার জোয়াল তত আন্তরিকতার সাথে আপনি স্বীয় কাঁদে তুলে নিবেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا
وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ
بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ
اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۳﴾

(সূরা আল মুমতাহানা, ৬০:১৩)

অর্থাৎ, হে নবী! মু'মিন মহিলারা যখন তোমার কাছে আসে (এবং এ বলে) তোমার কাছে বয়আত করে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, তারা নিজেদের হাত ও পায়ের মাধ্যমে মিথ্যা কথা বানিয়ে (তা) কারো প্রতি আরোপ করবে না এবং ন্যায়সঙ্গত (বিষয়ে) তোমার অবাধ্যতা করবে না, তাহলে তুমি তাদের বয়আত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চেয়ো। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী।

এই আয়াতে মহিলাদের নিকট থেকে এই অঙ্গীকারের শর্তে বয়আত নেয়ার তাগিদ দেয়া হয়েছে যে, তারা শির্‌ক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, সন্তানদের হত্যা করবে না (সন্তানের সুশিক্ষার খেয়াল রাখবে), কারো ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে না আর ন্যায়সংগত বিষয়ে অবাধ্যতা করবে না। এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, নবী– যিনি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত, তিনি কি এমন আদেশনিষেধ দিতে পারেন যা অন্যায়? আর নবী যদি দিতে পারেন তাহলে খলীফাও এমন অন্যায় শিক্ষা বা নির্দেশ দিতে পারেন! এ বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, নবী কখনও এমন শিক্ষা বা নির্দেশ দিতেই পারেন না। নবী যা বলবেন তা ন্যায়সঙ্গতই বলবেন, এছাড়া তিনি কিছুই বলবেন না।

এজন্য পবিত্র কুরআনের কয়েকটি স্থানে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, 'তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশের আনুগত্য কর, তা পালন কর'। কোথায়ও এটা লেখা হয় নি– 'যে নির্দেশ ন্যায়সংগত তার আনুগত্য কর'। ফলে আবার এই প্রশ্নের অবতারণা হয়, দু'টি ভিন্ন নির্দেশ কেন? আসল বিষয় হলো– এগুলো দু'টি ভিন্ন নির্দেশ নয় এটি বুঝবার ভুল। যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি– নবীর যে নির্দেশই হবে তা ন্যায়সংগত হবে আর নবী কখনো আল্লাহ্ তা'লার বিধানের পরিপন্থি, শরীয়তের বিধিনিষেধের উল্টো কাজ করতেই পারেন না। তাঁকে তো এ কাজের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে। যে কাজের জন্য পাঠানো হয়েছে এর বিপরীত তিনি কিভাবে বলতে পারেন? এটা আমাদের জন্য সুসংবাদ- তোমরা নবীকে মান্য করে, মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্টকে মান্য করে, তাঁর জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে সুরক্ষিত হয়েছো। তোমাদের জন্য এখন কোন অন্যায় নির্দেশের প্রশ্নই ওঠে না। যে নির্দেশই রয়েছে এটা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে পছন্দনীয়।

ন্যায্য ও অন্যায্য-এর সংজ্ঞা ('মা'রুফ ও গয়ের মা'রুফ'-এর সংজ্ঞা)

অনেক সময় অনেক লোক ন্যায়সংগত সিদ্ধান্ত বা ন্যায্য বিষয়ের আনুগত্যের চক্করে পড়ে নিজেই ব্যবস্থাপনা থেকে বেরিয়ে যায়। অন্যদেরকেও নষ্ট করে, আর পরিবেশেকে কোন কোন ক্ষেত্রে দুষিত করে। তাদের সামনে স্পষ্ট হওয়া উচিত, নিজেরাই **'মা'রুফ ও গয়ের মা'রুফ' (অর্থাৎ, ধর্মানুমোদিত ও এর বিপরীত)-ফয়সালা**'র সংজ্ঞা নিরূপন করতে যাবেন না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.), এর ব্যাখ্যায় বলেছেন–

"আরেকটি ভ্রান্তি 'মা'রুফ' নির্দেশের আনুগত্য করা সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে অর্থাৎ, যেসব কাজকে আমরা ন্যায্য বা মা'রুফ মনে করছি না, আমরা এর আনুগত্য করবো না। লক্ষণীয় হলো নবী করীম (সা.) সম্পর্কেও একই শব্দ অবতীর্ণ হয়েছে– **'ওয়ালা ইয়াসিনাকা ফি মা'রুফিন'**। প্রশ্ন হলো এরা কি হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দোষত্রুটির কোন তালিকা প্রস্তুত করে রেখেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও বয়আতের শর্তে মারুফ বিষয়ে 'আনুগত্য শব্দটি ব্যবহার করেছেন আর এতে একটি নিগূঢ় রহস্য অন্তর্নিহিত আছে। তোমাদের কারো সম্পর্কে আমি কোন কুধারণা পোষণ করি না তাই আমি এ বিষয়টি পরিষ্কার করতে চাচ্ছি, তোমরা কেউ যেন আত্মপ্রতারণায় নিমগ্ন হয়ো না। (খুতবাতে নূর, পৃষ্ঠা ৪২০-৪২১)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) **"ইয়ামুরুহুম বিল মা'রুফ"**-এর তফসীরে লিখেন "এই নবী (সা.) সেসব বিষয়েরই আদেশ করেন যা কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত নয়। আর ঐসব বিষয়ে নিষেধ করেন যেগুলোর বিষয়ে বিবেক নিষেধ করে। পবিত্র জিনিসকে বৈধ আর অপবিত্র জিনিসকে অবৈধ আখ্যায়িত করেন। জাতিসমূহের মাথা থেকে সেই বোঝা নামিয়ে দেন যার তলায় তারা চাপা পড়ে রয়েছে। তিনি সে সকল ঘাড়কে বেড়ীমুক্ত করেন যার কারণে ঘাড় সোজা হতে পারে না। তাই, যারা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং নিজেরা তার সাথী হয়ে তাকে শক্তি যোগাবে, তাকে সাহায্য করবে, সেই নূরের আনুগত্য করবে, যা তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে, সে ইহকাল ও পরকালের সব সমস্যাদি থেকে মুক্তি লাভ করবে। (বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, ২১তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২০)

তাই, মহানবী (সা.) স্বয়ং যখন আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হন না, তা

হলে খলীফা- যিনি নবীর পরে নবীর মিশনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে মু'মিনদের এক জামা'তের মাধ্যমে নিযুক্ত হন, তিনি কিভাবে বিচ্যুত হতে পারেন! তিনিও সেই শিক্ষাকে, সেসব বিধি-বিধানকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যান, যা আল্লাহ্ তা'লা নবী করীম (সা.)-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। এ যুগে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্পষ্ট করে তা আমাদেরকে জানিয়েও দিয়েছেন।

এখন এই খেলাফত-ব্যবস্থাপনা, যা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে জামা'তে আহমদীয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ্ কিয়ামত পর্যন্ত তা প্রতিষ্ঠিত থাকবে– এতে শরীয়ত ও বুদ্ধিবিবেক অনুযায়ীই সিদ্ধান্ত চলে আসছে আর ইনশাআল্লাহ্ হতে থাকবে আর এটাই ন্যায়সংগত সিদ্ধান্ত। যদি কোন সময় যুগখলীফা কোন ভুল করেন বা ভুলক্রমে এমন কোন সিদ্ধান্ত দেন যাতে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা নিজেই এমন উপকরণ সৃষ্টি করবেন যার ফলে এর অশুভ পরিণাম প্রকাশ পাবে না।

এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন– "ব্যক্তিগত কোন বিষয়ে যুগখলীফা দ্বারা কোন ভুলের ঘটনা ঘটতে পারে, কিন্তু ঐ সব বিষয় যার উপর নির্ভর করে জামা'তের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতি তাতে যদি তাঁর দ্বারা এমন কোন ভুল হয়েও যায় তাহলে খোদা তা'লা এ ক্ষেত্রে নিজের জামা'তের সুরক্ষা করে থাকেন। আর কোন না কোন ভাবে ভুল সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। সুফিদের পরিভাষায় একে **ইসমতে সুগরা** (Lesser Protection) বলা হয় আর কোন না কোন ভাবে তার ভুল তাকে বাতলে দিবেন। অর্থাৎ, নবীদের লাভ হয় **ইসমতে কুবরা** (Greater Protection) কিন্তু খলীফাদের ক্ষেত্রে ইসমতে সুগরা লাভ হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর দ্বারা এমন কোন গুরুতর ভুল হতে দেন না, যা জামা'তের জন্য ধ্বংসের কারণ হতে পারে। তাঁর সিদ্ধান্তে আংশিক ও সামান্য ভুল মনে হতে পারে কিন্তু পরিণামে ফলাফল তাই হবে, যার ফলে ইসলামের বিজয় অর্জিত হবে, তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা হবে পরাজিত। অর্থাৎ, তাঁর ইসমতে সুগরা অর্জিত হওয়ার সুবাদে খোদা তা'লার নীতিও হবে তাই, যা তার রীতি। যদিও তিনিই বলবেন, তারই জিহ্বা নড়বে, চলবে তারই হাত, তার মস্তিষ্কই কাজ করবে, কিন্তু এ সব কিছুর আড়ালে থাকবে খোদা তা'লারই হাত। গৌণ বিষয়ে তার দ্বারা

সামান্য ভুল হতে পারে। অনেক সময় তার পরামর্শদাতা তাকে ভুল পরামর্শ দিতে পারে। কিন্তু এর মধ্যবর্তী সব বাধাবিপত্তি পেরিয়ে বিজয় হবে তারই। আর সমস্ত কড়া মিলে যখন পূর্ণ শিকলে পরিণত হবে, তখন সঠিক সাব্যস্ত হবেন তিনিই আর তা এমন সুদৃঢ় হবে যে, কোন শক্তি একে ভাঙ্গতে বা ছিঁড়ে ফেলতে সক্ষম হবে না।" (তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৬-৩৭৭)

তাই এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেল, অন্যায্য বা গয়ের মারুফ হলো সেটা, যা আল্লাহ্ তা'লার বিধিবিধানের এবং শরিয়তের বিধিবিধানের পরিপন্থি। যেমনটি নিম্নবর্ণিত এ হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) একবার এক বাহিনী প্রেরণ করেন। তাদের একজনকে নেতা মনোনীত করেন, যেন লোকেরা তার কথামত চলে এবং তার আনুগত্য করে। এই ব্যক্তি আগুন জ্বালালেন। আর নিজের সাথীদের নির্দেশ দিলেন, 'আগুনে ঝাঁপ দাও'। অনেকে তাঁর কথা মান্য না করে বরং বলল, 'আগুন থেকে বাঁচার জন্য মুসলমান হয়েছি'। কিন্তু কিছু লোক আগুনে ঝাঁপ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। মহানবী (সা.) যখন এ বিষয়টি জানতে পারেন তখন বললেন, ও'ই লোকেরা আগুনে ঝাঁপ দিলে সর্বদা আগুনেই পড়ে থাকতো'। এছাড়া তিনি (সা.) আরো বললেন, 'আল্লাহ্ তা'লার অবাধ্যতার আদলে কোন আনুগত্য বৈধ নয়। আনুগত্য শুধুমাত্র ন্যায়সংগত বিষয়েই আবশ্যকীয়'।" (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ)

এই হাদীসের আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণ হযরত আবু সাইয়িদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণনায় পাওয়া যায়। হযরত আবু সাইয়িদ খুদরী (রা.) বললেন, "রসূল করীম (সা.) আলকামা বিন মুজায্যেযকে (রা.)-কে একটি যুদ্ধে পাঠান। যখন তিনি তাঁর যুদ্ধের নির্ধারিত জায়গার নিকটবর্তী হন অথবা তখনও পথেই ছিলেন এই অবস্থায় সেনাদলের একটি অংশ তাঁর কাছে যাত্রা বিরতির অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দেন। আর আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফা বিন কায়েস আল সাহ্মী-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করে দেন। আমি তাঁর সাথে এ যুদ্ধের অভিযানে শামিল ছিলাম। তখনও তিনি রাস্তায়ই ছিলেন, এমন সময় ঐ লোকেরা আগুন পোহাতে বা খাবার রান্নার জন্য আগুন জ্বালাল। তখন আব্দুল্লাহ্ (যার স্বভাবে ছিল রসিকতা) বল্লেন, 'আমার কথা শুনে মান্য করা তোমাদের জন্য আবশ্যক নয় কী'? তারা বললো, 'কেন নয়'? এতে আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফা বললেন, 'আমি তোমাদেরকে যে আদেশ দিব তোমরা কি তাই করবে'? তারা

বললো, 'হ্যাঁ, তাই করবো'? এতে আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফা বললেন, 'তোমরা এ আগুনে ঝাঁপ দাও'। এতে কিছু লোক দাঁড়িয়ে আগুনে ঝাঁপ দেয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগলো। আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফা যখন দেখলেন সত্যি সত্যিই এরা আগুনে ঝাপ দিতে যাচ্ছে তখন তিনি বারণ করলেন, 'তোমরা থাম'।

পরে যখন যুদ্ধ থেকে আমরা ফিরে আসি, সাহাবাগণ (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ঘটনাটি জানালেন। এতে রসূল (সা.) বলেন, 'আমীরদের মধ্যে যে তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার অবাধ্যতার আদেশ দেয়, তোমরা তার আনুগত্য করবে না'।" (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল জিহাদ, বাব লে ইতায়াতে ফি মা'সিয়াতিল্লাহ্)

এ হাদীস থেকে এটাও স্পষ্ট হলো, না মানার বিষয়টি কোন ব্যক্তির একক সিদ্ধান্ত ছিল না। কিছু লোক আগুনে ঝাঁপ দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল, তারা শুনেছিল সর্বাবস্থায় আমীরের আনুগত্য করতে হবে। আর তারা মনে করেছিল সর্বাবস্থায়ই এটা ইসলামী শিক্ষা। সব ক্ষেত্রেই আমীরের অনুগত্য করতে হবে। কিন্তু কিছু সাহাবী, শরীয়তের বিধিবিধানে যারা অধিকতর ব্যুৎপত্তি রাখতেন, মহানবী (সা.)-এর সংসর্গে বেশি কল্যাণমণ্ডিত হয়েছিলেন, তারা অস্বীকার করলেন। ফলশ্রুতিতে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের পর, সেই নির্দেশ বাস্তবায়ন করেন নি। কেননা, এমনটা করা হলে তা হবে আত্মহত্যা। আর ইসলামে আত্মহত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অপরদিকে আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফা যিনি তাদের নেতা ছিলেন, তিনি তাদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা যখন দেখলেন, তো তার চিন্তা হলো আর তিনি তাদের বাধা দেন এবং তাদের এটি করতে বারণ করে (বললেন) এটাতো শুধু শুধু রসিকতা করা হয়েছে মাত্র।

তবে এই ঘটনার পর, মহানবী (সা.) ব্যাখ্যা প্রদান করে মারুফ বা ন্যায়সংগত বিষয় কোনটি আর গয়ের মারুফ বা অন্যায্য বিষয় কোনটি তা স্পষ্ট করলেন। স্পষ্ট হওয়া উচিত যে নবী অথবা যুগখলীফা হাসিঠাট্টার ছলেও এমন কথা বলতে পারেন না। এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন– 'তোমরা যদি আমীরের পক্ষ থেকে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশের পরিপন্থি কিছু দেখতে পাও, তাহলে আল্লাহ্ ও রসূলের (সা.) দিকে প্রত্যাবর্তন কর'। এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পরে খেলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই তোমরা খেলাফতের দ্বারস্থ হও, তাঁর সিদ্ধান্ত সর্বদা ন্যায়সংগত বা মারুফ হবে। আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর বিধান অনুসারেই হবে। তাই যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি,

তোমাদের জন্য শুভ সংবাদ যে, এখন সদাসর্বদা তোমরা ন্যায়সংগত বিষয় বা মারুফের আওতায়ই থাকবে।

বর্তমানেও কখনও কখনও আপত্তি উত্থাপিত হয়, এক কর্মকর্তা ভালোই কাজ করছিল, অথচ তাকে সরিয়ে অন্যকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যুগখলীফা কিংবা জামা'তের ব্যবস্থাপনা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এটা অন্যায় সিদ্ধান্ত ছিল। তাদের জন্য অন্য কিছু করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না, এজন্য এটাকে অন্যায়ের আওতাভুক্ত মনে করে (নিজেই একটা সংজ্ঞা বানিয়ে নেয়), একারণে তারা ভাবে যে, আমাদেরও বলার অধিকার আছে, এসব কথা যেখানে সেখানে বলার অধিকার আছে। প্রথম কথা হলো, যত্রতত্র বসে জামা'তের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কোন কথা বলার অধিকার কারো নেই। এ বিষয়ে আমি পূর্বেও আলোকপাত করেছি। তোমাদের কাজ শুধুমাত্র আনুগত্য করা। আর আনুগত্যের মানদণ্ড কি? পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন–

وَاَقۡسَمُوۡا بِاللّٰہِ جَہۡدَ اَیۡمَانِہِمۡ لَئِنۡ اَمَرۡتَہُمۡ لَیَخۡرُجُنَّ ؕ قُلۡ لَّا تُقۡسِمُوۡا ۚ طَاعَۃٌ مَّعۡرُوۡفَۃٌ ؕ اِنَّ اللّٰہَ خَبِیۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۵۴﴾

(সূরা আন্ নূর, ২৪:৫৪)

অর্থাৎ, আর তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র কসম খায় যে, তুমি তাদের আদেশ করলে তারা অবশ্যই (ঘর থেকে) বেরিয়ে পড়বে। তুমি বল, তোমরা কসম খেয়ো না। ন্যায়সঙ্গতভাবে আনুগত্য (কর)। তোমরা যা-ই কর সে সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালোভাবে অবহিত।

এই আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াত থেকেই আনুগত্যের বিষয়টি আলোচিত হয়ে আসছে। মু'মিনরা সর্বদা এটিই বলে যে, আমরা শুনলাম আর মানলাম। আর এই মানের তাক্ওয়ার কারণে তারা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যভাজন হয় এবং ইহজাগতিক চাওয়া পাওয়ার ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়। এ আয়াতেও সে কথাই বলা হয়েছে। মু'মিনদের মতই শুন আর আনুগত্যের দৃষ্টান্ত দেখাও। কসম খেয়ো না যে, আমরা এটা করব সেটা করব। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তফসিরে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন– "দাবি তো মুনাফেকরাও অনেক করে থাকে। আসল বিষয় হলো কার্যত আনুগত্য করা।" এখানে আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের ক্ষেত্রে বলেছেন– আনুগত্যের যে ন্যায়সংগত পন্থা, যে আনুগত্য নিয়মতান্ত্রিক, সেই আনুগত্য অবশ্যই কর। নবী তোমাদেরকে শরীয়ত ও কাণ্ডজ্ঞানহীন কোন

আদেশ দিতে পারেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমাকে মান্য করেছ, তাহলে পাঁচ বেলার নামাযে অভ্যস্ত হও, মিথ্যা বলা ছেড়ে দাও, অহংকার পরিত্যাগ কর, লোকদের অধিকার হরণ করা ছেড়ে দাও, পরস্পর সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে জীবনযাপন কর– এসবই ন্যায়সংগত বা ধর্মানুমোদিত আনুগত্যের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো না করে যদি শুধু বলে বেড়াও, আমরা কসম খাচ্ছি আপনি আমাদের যে আদেশ দিবেন তাই আমরা পালন করবো। বিভিন্ন সময় আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য খলীফাদের পক্ষ থেকে এভাবে বিভিন্ন ধরণের তাহ্‌রিক করা হয়ে থাকে। যেমন– মসজিদকে আবাদ রাখা, সন্তানের তরবিয়ত বা সুশিক্ষার বিধান করা, মন বড় করা, তবলীগ করা অথবা বিভিন্ন ধরণের আর্থিক কুরবানী-সংক্রান্ত তাহ্‌রীকও রয়েছে। এগুলো এমন বিষয়, যার আনুগত্য করা আবশ্যকীয়। অন্য কথায়, এগুলো মা'রুফ বা ন্যায়সংগত বিষয়ে আনুগত্যের গণ্ডিভুক্ত বিষয়। তাই কোন নবী অথবা কোন খলীফা তোমাদের দ্বারা আল্লাহ্ তা'লার বিধিবিধান বা বুদ্ধিবিবেক পরিপন্থি কোন কাজ করাতে পারেন না। এটা বলবেন না, 'তোমরা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড় অথবা সমুদ্রে লাফ দাও'। তারা তোমাদেরকে সর্বদা শরীয়ত সম্মত পথেই পরিচালিত করবেন।

আনুগত্যের মহান দৃষ্টান্ত

আনুগত্যের মহান দৃষ্টান্ত, আমরা প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মাঝে এভাবে দেখতে পাই, এক যুদ্ধ চলাকালে হযরত উমর (রা.) যুদ্ধের সেনাপতির দায়িত্ব হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ থেকে নিয়ে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে প্রদান করলে হযরত আবু উবায়দা ভাবলেন খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) পরম দক্ষতার সাথে কাজ করছেন, তাই তিনি তার কাছ থেকে দায়িত্ব নেন নি। কিন্তু খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) যখন জানতে পারলেন, হযরত উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে এ নির্দেশ এসেছে, তৎক্ষণাৎ তিনি হযরত আবু উবায়দার নিকট যান এবং বলেন, যেহেতু যুগখলীফার এটা নির্দেশ, তাই আপনি দ্রুত এই নির্দেশ শিরোধার্য করুন। আমার কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। আমি আপনার অধিনস্থ থেকেই নির্দেশ পালন করবো। আমি আপনার অধীনে থেকে সেভাবেই কাজ করতে থাকবো যেভাবে কমান্ডারের অধিনস্ত এক সৈনিক কাজ করে। মূলতঃ এটাই হলো আনুগত্যের মানদণ্ড। কেউ আপত্তি করে বলতে পারে, হযরত উমর (রা.)-এর সিদ্ধান্ত ঐ সময়ে ন্যায়সংগত ছিল না। এটাও

ভুল চিন্তা-ভাবনা। আমরা আসল অবস্থা জানি না, কি কারণে হযরত উমর (রা.) এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এটা তিনিই ভালো জানেন। বস্তুত এই সিদ্ধান্তের মাঝে এমন কোন বিষয় বাহ্যিকভাবে ছিল না যা শরীয়তের পরিপন্থী। তবে দেখুন, আল্লাহ্ তা'লাও হযরত উমর (রা.) প্রদত্ত এই সিদ্ধান্তের সম্মান রেখেছেন। এই যুদ্ধে বিজয় লাভ হয়েছে। এই যুদ্ধে কোন কোন সময় এমন অবস্থা হয়েছে যে, একেক জন মুসলমানকে শত শত শত্রুর সাথে লড়তে হয়েছে, তা সত্ত্বেও বিজয় লাভ হয়েছে।

স্বীয় মনিব ও নেতা মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ আলাইহিস্ সালামের হাকাম (মীমাংসাকারী) ও আদাল (ন্যায়বিচারক) হওয়ার পদমর্যাদা লাভ হয়েছে, তিনি তাঁর (সা.)-এর এমন দাসত্ব করেছেন, যার দৃষ্টান্ত কোথাও পাওয়া যায় না। এজন্য এখন, এ যুগে হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.)-এর আনুগত্যে ও তাঁকে ভালোবাসার কল্যাণেই হযরত আকদাস মুহাম্মদ (সা.)-কে ভালোবাসার দাবি সত্য প্রমাণিত হতে পারে। আর মহানবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'লার প্রতি প্রেমানুরাগের সেই দাবি সত্য সাব্যস্ত হতে পারে। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٣٢

(সূরা আলে ইমরান, ৩:৩২)

অর্থাৎ, তুমি বল, "তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালোবেসে থাক তাহলে তোমরা আমাকে অনুসরণ কর। (এমনটি হলে) আল্লাহ্ও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।"

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যা কিছু লাভ করেছেন তা মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের মাধ্যমেই পেয়েছেন

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

"এই নেয়ামত যা আমার পূর্বে নবীদের, রসূলদের এবং খোদার প্রিয় বান্দাদের দান করা হয়েছে, তা হতে যে এক উৎকর্ষ অংশ আমি লাভ করেছি তা শুধুমাত্র

খোদার অনুকম্পায় লাভ করেছি, নিজের কোন যোগ্যতায় তা লাভ করি নি। আর আমার পক্ষে এ নিয়ামত লাভ করা সম্ভব হতো না, যদি আমি আমার নেতা ও অভিভাবক, নবীদের গর্ব ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পথের পূর্ণ অনুগামী না হতাম। তাই আমি যা কিছু পেয়েছি তা সেই আনুগত্যের কল্যাণে লাভ করেছি। আমি আমার সত্য ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে জানি, কোন মানুষ মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য ছাড়া খোদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না এবং পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে না। সেটি কী যা মহানবী (সা.)-এর সত্য ও পরিপূর্ণ আনুগত্যের কারণে হৃদয়ে সর্বাগ্রে সৃষ্টি হয়– এখানে আমি তাও উল্লেখ করছি। সুতরাং স্মরণ রাখা উচিত, তা হলো এক সুস্থ হৃদয় অর্থাৎ, ঐ হৃদয় যা থেকে ইহ-জাগতিক ভালোবাসা উবে যায় আর হৃদয় এক ধরণের চিরস্থায়ী ও অনন্ত স্বাদের সন্ধানে রত হয়। এরপর এই সুস্থ-স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী হওয়ার কল্যাণে এক ধরণের নিখাঁদ ও পরিপূর্ণ ঐশী ভালোবাসা লাভ হয়। এইসব নেয়ামত মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের কল্যাণে উত্তরাধিকারস্বরূপ লাভ হয়ে থাকে। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা নিজে বলেছেন–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

(সূরা আলে ইমরান, ৩:৩২)

অর্থাৎ- তাদেরকে বলে দাও, যদি তোমরা খোদা তা'লাকে ভালোবাস তাহলে আমার আনুগত্য কর। খোদা তা'লা তোমাদের ভালোবাসবেন। বরং একপেশে ভালোবাসার দাবি সম্পূর্ণরূপে একটি মিথ্যা ও বুলিসর্বস্ব বিষয় মাত্র। যখন মানুষ সত্যিকার অর্থে খোদা তা'লাকে ভালোবাসে তখন খোদাও তাকে ভালোবাসেন। পৃথিবীতে তার একটা গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে দেয়া হয়। ...সহস্র সহস্র মানুষের হৃদয়ে তার জন্য এক সত্যিকার ভালোবাসা সৃষ্টি করা হয়, তাকে এক আকর্ষণী শক্তি দান করা হয়। তাকে এক জ্যোতি দান করা হয় যা সর্বদা তার সাথে সম্পৃক্তাবস্থায় থাকে। যখন কোন মানুষ আন্তরিকতার সাথে খোদা তা'লাকে ভালোবাসে সব কিছুর ঊর্ধ্বে তাঁকে প্রাধান্য দেয় আর তার হৃদয়ে আল্লাহ্ ব্যতীত কারো সম্মান অবশিষ্ট থাকে না এমনকি সবাইকে সে মৃত এক কীটের চেয়েও নগণ্য মনে করে তখন খোদা, যিনি তার হৃদয়কে অবলোকন করে থাকেন, তিনি এক মহান জ্যোতির সাথে তার মাঝে অবতীর্ণ

হন। যেভাবে স্বচ্ছ পরিষ্কার এক আয়নাকে যদি সূর্যের বিপরীতে রাখা হয়, তাহলে সূর্যের প্রতিকৃতি এর মাঝে এমনভাবে প্রতিবিম্বিত হয় মনে হয় সত্যিকার অর্থে আলোকময় সূর্যই যেন আয়নাতে বিদ্যমান। তেমনি ভাবেই এমন লোকদের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লা অবতরণ করেন আর এই হৃদয়গুলোকে নিজের আসন বানিয়ে নেন। এটিই সে বিষয় যে উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৪, ৬৫)

অতএব, হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি এমনই গভীর প্রেমানুরাগ ও ভালোবাসার কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পবিত্র হৃদয়কে নিজের আরশ হিসেবে পছন্দ করেছেন, যোগ্যাতানুসারে ভবিষ্যতেও আল্লাহ্ তা'লা অনুরূপ হৃদয়ের মাঝে অবতীর্ণ হতে থাকবেন। কিন্তু এখন মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা, তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্যের দাবি তখনই সত্য প্রমাণিত হবে যখন তাঁর (সা.) আধ্যাত্মিক সন্তানের সাথে ভালোবাসা ও আনুগত্যের সম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত হবে। একারণেই তিনি বলছেন, সকল আত্মীয়দের চেয়ে বেশি ভালোবাসা ও আনুগত্যের সম্পর্ক আমার সাথে স্থাপন কর। এর মাধ্যমেই তোমরা মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য করতে সক্ষম হবে এবং আল্লাহ্র ভালোবাসা লাভ করবে। শুধু তিনিই আমাদের একথা বলেন নি বরং আল্লাহ্র রসূল (সা.) নিজে আমাদেরকে এ কথা বলেছেন। যেমন বলেছেন, "তোমরা যদি মসীহ্ ও মাহ্দীর সংবাদ পাও, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হলেও তার কাছে গিয়ে আমার সালাম পৌঁছাও।" এতো তাগিদ কেন করা হলো, এতো কষ্ট করে এই সালাম পৌঁছানোর মাঝে রহস্য কী? এটাই যে, সে আমার প্রিয় আর আমিও তার প্রিয়। আর এটা নিয়মের কথা, প্রেমিক পর্যন্ত প্রেমিকের মাধ্যমে পৌঁছা যায়। এ জন্য তোমরা যদি আমার অনুসরণকারী হতে চাও তাহলে তোমরা মসীহ্ মাওউদের অনুসরণ কর। তাঁকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ কর। তাঁর জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হও। এজন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– সাবধান থাক! ঈসা ইবনে মরিয়ম (মসীহ্ মওউদ) এবং আমার মাঝে কোন নবী অথবা রসূল হবে না। ভালোভাবে শুনে রেখো! তিনি আমার পরে উম্মতের মাঝে আমার খলীফা হবেন। তিনি অবশ্যই দাজ্জালকে বধ করবেন। ক্রুশকে ধুলিসাৎ করবেন অর্থাৎ, ক্রুশীয় মতবাদকে নস্যাৎ করবেন। 'জিযিয়া কর' রহিত করবেন। (তার যুগে এর প্রচলন থাকবে না। কেননা, সে যুগে ধর্মের কারণে যুদ্ধ হবে না।) স্মরণ রাখবে! যে-ই তার

সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য পাবে তার উচিত হবে তাকে আমার সালাম পৌঁছানো। (তিবরানী, আওসাত ওয়াস সাগীর)

এই হাদীস নিয়ে চিন্তাভাবনা না করে অথবা যারা চিন্তাভাবনা করেছে এবং এর গভীরে অবগাহন করেছে তাদের কথা বুঝার চেষ্টা না করে বর্তমান কালের আলেমরা এর বাহ্যিক অর্থের পিছনেই ছুটে চলছে। আর সাধারণ ও সহজ-সরল মুসলমানদেরকে ভুল রাস্তায় পরিচালিত করছে এবং ভয়াবহ নৈরাজ্য সৃষ্টি করে রেখেছে। আমরা এর থেকে খোদা তা'লার আশ্রয় যাচনা করছি। তিনি এদের শাস্তি দিচ্ছেনও আর ভবিষ্যতেও ইনশাআল্লাহ্ তিনি তাদের সাথে বোঝাপড়া করতে থাকবেন। এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ন্যায়পরায়ণ বিচারক হবেন, যিনি ন্যায় ছাড়া ভিন্ন কোন কথা বলবেনই না। আর তিনি এমন ইমাম, যিনি জগতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। এজন্য তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। তাঁর আদেশ অনুসারে চলতে হবে। তাঁর শিক্ষা মেনে চলতে হবে।

কেননা, তিনি ন্যায় ও সুবিচারের শিক্ষাই দিবেন যা কুরআনের শিক্ষা ছাড়া অন্য কোন শিক্ষা নয়। বর্তমান কালের লোকেরা ক্রুশকে এমনভাবে ভাঙ্গার দিকে ছুটছে যে, তারা মনে করছে হাতুড়ি-শাবল নিয়ে মসীহ্ আসবেন আর তিনি ক্রুশ ভাঙ্গবেন। এগুলো সব বৃথা কথাবার্তা। বিষয়টি পরিস্কার, আগমনকারী মসীহ্ তার নেতা ও গুরুর অনুসরণে দলিলপ্রমাণ দ্বারা তাদেরকে পরাজিত করবেন আর দলিলপ্রমাণ দ্বারাই ক্রুশীয় মতবাদকে নস্যাৎ করবেন, এর যবনিকা টানবেন। দাজ্জালকে হত্যার অর্থ এটাই যে, দাজ্জালী ফিৎনা থেকে তিনি উম্মতকে রক্ষা করবেন। আবার যেহেতু ধর্মীয় যুদ্ধের প্রচলন থাকবে না এজন্য জিযিয়া করের প্রচলনও থাকবে না। এই হাদীসে এছাড়াও সালাম পৌঁছানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা সালাম পৌঁছানোর পরিবর্তে আগমনকারী মসীহ্র বিরোধিতায় লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে শুভবুদ্ধি দিন।

অন্য একটি হাদীসও রয়েছে, যাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পদমর্যাদার বিষয়টি সহজেই বুঝা যায় যে, কেন তাঁর সাথে আনুগত্যের সম্পর্ক স্থাপন করা আমাদের জন্য আবশ্যক। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন– "যতক্ষণ পর্যন্ত ন্যায় বিচারক ঈসা ইবনে

মরিয়ম আবির্ভূত না হবেন ততক্ষণ কিয়ামত হবে না। (যখন তিনি আবির্ভূত হবেন তখন) তিনি ক্রুশ ভঙ্গ করবেন। শুকর বধ করবেন। জিযিয়া কর রহিত করবেন। আর এমনভাবে ধন সম্পদ বিতরণ করবেন লোকেরা যা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে।” (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল ফিতান, বাব ফিতনাতুদ দাজ্জালে ওয়া খুরুজে ঈসা ইবনে মরিয়ম ওয়া খুরুজে ইয়াজুজ ওয়া মাজুজ)

এই হাদীসটি বুঝা আবশ্যক ছিল কিন্তু স্থূল বুদ্ধির লোকেরা বুঝে নি। তারা বাহ্যিক অর্থের দিকে ছুটেছে। অদ্ভুত ও হাস্যকর ব্যাখ্যা তারা (এর) করে থাকে। স্পষ্ট বুঝা যায়, শুকর হত্যার অর্থ হলো শুকর স্বভাবসম্পন্ন লোকদের হত্যা করা। শুকরের মাঝে অন্যান্য পশুর তুলনায় ঘৃণ্য কী-কী মন্দ অভ্যাস রয়েছে তা আজ জানা ও প্রমাণিত বিষয়। এই মন্দ যখন মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয়ে যায় তখন তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা আবশ্যক হয়ে যায়। আবার এ বিষয়টিও রয়েছে যে তিনি সম্পদ দান করবেন, সম্পদ বন্টন করবেন। এবিষয়টিও এরা বুঝে না। কয়েকদিন পূর্বে পাকিস্তানে উলামারা এক জলসা করেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ও জামা'তের বিরুদ্ধে অত্যন্ত নোংরা ভাষা ব্যবহার করে তারা এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছে– মসীহ্ এসে তো সম্পদ বন্টন করার কথা ছিল, লোকদের কাছে চাওয়ার কথা নয়। দেখ আহমদীরা (তারা তো কাদিয়ানী বলে) চাঁদা সংগ্রহ করে। এতে প্রমাণিত হয় তারা মিথ্যাবাদী। এখন বিবেক বুদ্ধিহীন এই অন্ধদেরকে কোন বুদ্ধিমান বুঝাতে পারবে না– মসীহ্ যে আধ্যাত্মিক ধনভাণ্ডার বিতরণ করেছেন তোমরা সেটা নিতে অস্বীকার করে বসে আছ। আসল কথা হলো, এদের শুধুমাত্র জাগতিক চোখই রয়েছে। এর বেশি তারা চিন্তাও করতে পারে না। এদের কাজই এটা, এদের তা করতে দাও। পাকিস্তানের আহমদীদের বেশি অস্থির হওয়ার প্রয়োজন নেই। এদের এসব নোংরা কথাবার্তা ও মিথ্যাচার শুনে ধৈর্য ধারণ করে, সৎসাহসের সাথে সসম্মানে নিজের রাস্তায় এগিয়ে চলুন। আমরা স্বীকার করছি, এদের নোংরামীর বিপরীতে আমরা নিজেদের পরাজয় এক্ষেত্রে মেনে নিচ্ছি। আমরা তাদের নোংরামীর মোকাবেলায় কখনও নোংরামী ছড়াতে পারবো না। কিন্তু একটি বিষয় আমি স্পষ্ট করছি, যখন বান্দা নীরব থাকে খোদা কথা বলেন। যখন খোদা বলেন তখন বিরুদ্ধবাদীদের টুকরো টুকরো হয়ে বাতাসে আমরা ভাসতে দেখেছি আর ভবিষ্যতেও দেখবো, ইনশাআল্লাহ্। তাই আহমদীদের মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সত্যিকার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত

রাখা উচিত, দোয়ার ওপর জোর দিন, সর্বদা দোয়ায় লেগে থাকুন। এইসব হাদীস থেকে এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয়েছে, আগমনকারী মসীহ্ ইমামও হবেন, ন্যায়বিচারকও হবেন আর ন্যায়বিচারের রাজপুত্র হবেন তিনি। তাই তাঁর সাথে অবশ্যই সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। একজন ন্যায়বিচারক ইমাম হিসেবে তাঁর আনুগত্য করাও তোমাদের জন্য আবশ্যকীয়। এজন্য লোকদের কল্যাণার্থে, তোমাদের তরবিয়তের জন্য যে বিষয়গুলো বলা হয়েছে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হও। যেন তোমরা মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসা প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হও ও খোদা তা'লার নৈকট্য লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।

সর্বাবস্থায় আনুগত্য আবশ্যকীয়

আনুগত্য সম্পর্কে আমি কিছু হাদীস উপস্থাপন করছি। এখেকে আনুগত্যের গুরুত্ব বুঝা যায়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, স্বাচ্ছন্দ্য-অস্বাচ্ছন্দ্য, সুখে-দুঃখে, অধিকার-বঞ্চিত হও বা পক্ষপাতমূলক ব্যবহারের সম্মুখীন হও না কেন মোট কথা সর্বাবস্থায় যুগের শাসকের নির্দেশ শোনা ও আনুগত্য করা আবশ্যক। (মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ্)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন। রসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের সর্দার এবং আমীরের মাঝে এমন কোন কিছু দেখে যা তার পছন্দনীয় নয় তার উচিত হবে ধৈর্য ধারণ করা। কেননা, যে ব্যক্তি জামা'ত থেকে এক বিঘত পরিমান বিচ্যুত হয় সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে। (বুখারী, কিতাবুল ফিতান, বাব কাওলে নবীয়ে সাতারুনা বাদী উমুরা)

আবার হযরত আরফাজাহ (রা.) বলেন, "আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি– 'যখন তোমরা এক হাতে একত্রিত হও, অর্থাৎ তোমাদের মাঝে একজন আমীর থাকেন, তখন কোন ব্যক্তি এসে তোমাদের মাঝে যদি বিভেদ সৃষ্টি করতে প্রয়াশ চালায় তাহলে তাকে হত্যা কর, অর্থাৎ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর। তার কথা মান্য করবে না'।" (মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ইমারাহ্, বাবু হুকমে মিন ফারকি আমারিল মুসলিমিনা ওয়া হুয়া মুজতামা)

হযরত উবায়দা বিন সামেত (রা.) বর্ণনা করেন। "আমরা রসূল (সা.)-এর বয়আত এই গুরুত্বপূর্ণ কথার ওপর করেছি– 'শুনবো আর আনুগত্য করবো,

তা আমাদের পছন্দ হোক আর না হোক। আর আমরা যেখানেই থাকবো কোন বিষয় সম্পর্কে কর্তৃত্ববান কোন ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করবো না। সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকব বা সত্য কথাই বলবো। আল্লাহ্ তা'লার বিষয়ে তিরস্কার কারীর তিরস্কারকে ভয় করবো না'।" (মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ইমারাহ্, বাবু ওয়ুদে তায়াতুল ইমরায়ে)

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি– আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্য থেকে কেউ বেরিয়ে গেলে কিয়ামতের দিন সে আল্লাহ্ তা'লার সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তখন তার কাছে কোন যুক্তিও থাকবে না, না কোন ওজুহাতের সে সুযোগ পাবে। আর যুগ-ইমামের বয়আত না করে যে মারা যাবে সে অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার মৃত্যু বরণ করবে। (মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ইমারাহ্, বাবুল আমরে বেলুযুমিল জামা'তে ইনদা যহুরিল ফিতান)

অতএব আপনারা সৌভাগ্যবান, যুগইমামকে আপনারা মান্য করেছেন। তাঁর বয়আতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এখন বিশুদ্ধচিত্তে শুধুমাত্র আল্লাহ্রই সন্তুষ্টির জন্য তাঁর আনুগত্য করতে হবে। তাঁর প্রদত্ত সমস্ত নির্দেশাবলী পালন করতে হবে, নতুবা খোদা তা'লার আনুগত্যের গণ্ডির বাইরে চলে যাবে। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে আনুগত্যের উন্নত মানে অধিষ্ঠিত রাখুন। এই উন্নত মান কিভাবে অর্জন করা সম্ভব? এই মান হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই অর্জন করা সম্ভব।

কে জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়?

তিনি (আ.) বলেন:

"আমাদের জামা'তে সেই প্রবেশ করে যে আমাদের শিক্ষাকে নিজের কর্মপন্থা হিসেবে অবলম্বন করে। নিজের সংকল্প ও চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে কাজে লাগিয়ে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি শুধুমাত্র নাম লিখিয়েছে শিক্ষানুসারে কাজ করে না, স্মরণ রাখবে! খোদা তা'লা এ জামাত'কে এক নিষ্ঠাবান জামা'ত বানানোর সংকল্প করেছেন। এ জন্য কোন ব্যক্তি, প্রকৃতপক্ষেই জামা'তে যে অন্তর্ভুক্ত নয়, শুধুমাত্র নাম লিখিয়ে সে জামা'তে থাকতে পারে না। তার ক্ষেত্রে কোন না কোন সময় এমন আসবে যখন সে পৃথক হয়ে যাবে। এজন্য যে শিক্ষা দেয়া হয় যতটা সম্ভব নিজের কর্মকে সে শিক্ষানুসারে ঢেলে সাজাও।

এই শিক্ষা কী? তিনি (আ.) বলেন, "নৈরাজ্যের কথা বলো না। দুষ্কৃতি ছড়াবে না। গালি শুনে ধৈর্য ধর। কারো সাথে ঝগড়া করো না। যে ঝগড়া করতে চায় তার সাথে উত্তম ব্যবহার কর এবং পুণ্য কর। সুমিষ্ট ব্যবহারের উত্তম নমুনা প্রদর্শন কর। নিষ্ঠার সাথে প্রত্যেক নির্দেশের আনুগত্য কর। খোদা তা'লার প্রতি সন্তুষ্ট থাক। শত্রুরাও যেন জানতে পারে, বুঝতে পারে, পূর্বে যেমন ছিল বয়আতের পর এখন এই ব্যক্তি আর সেই ব্যক্তি নেই। মামলায় সাক্ষ্য প্রদানকালে সত্য সাক্ষ্য দাও। এই জামা'তে যারা অন্তর্ভুক্ত হয় তাদের উচিত পূর্ণ আন্তরিকতা, পূর্ণ দৃঢ়চিত্ততার সাথে ও মনেপ্রাণে সততা অবলম্বন করা। জগৎ ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত।" (মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬২০-৬২১, নব সংস্করণ)

এখানে তিনি (আ.) যেভাবে বলেছেন, 'নৈরাজ্যকর কথা বলো না'। কিছু লোকের এটা স্বভাব, শুধুমাত্র আনন্দ করার জন্য অভ্যাসবশত এক জায়গার কথা অন্য জায়গায় বলে বেড়ায়। এতে ফিৎনা সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়। বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ থেকে থাকে। যার সামনে বিষয়টি বর্ণনা করা হয় বিষয়টি যদি তার সম্পর্কে হয়ে থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবে ঐ ব্যক্তির হৃদয়ে অপর ব্যক্তি সম্পর্কে ভুল ধারণা হবে বা মনোমালিন্য হবে, যার প্রতি সে কথা আরোপ করা হয়ে থাকে; যদিও আমার দৃষ্টিতে এমন মনোমালিন্য সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। এমন বিশৃংখলা নিরসনের পদ্ধতিও হলো– যার প্রতি আরোপ করে কথা বলা হয়েছে তার কাছে গিয়ে এই বিষয়টি পরিষ্কার করা যে, 'তুমি এসব কথা বলেছ-কি'? এই বিষয়টি আমার কাছে এভাবে পৌঁছেছে। সেখানেই বিষয়টির সমাধান হয়ে যাবে। এমন নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী লোকদেরও সংশোধন হয়ে যাবে। আবার কখনও কখনও এমনও হয়ে থাকে, এমন নৈরাজ্যবাদীরা এক বংশের সাথে অন্য বংশকে বিবাদে লাগিয়ে দেয়। এমন ফিৎনার বিষয় নিজেরাও এড়িয়ে চল আর ফিৎনা সৃষ্টিকারীদেরও এড়িয়ে চল। আর সম্ভব হলে তাদের সংশোধনের চেষ্টাও কর।

এছাড়া প্রধানত ঝগড়াবিবাদ, গালিগালাজ থেকে সরাসরি অশান্তি সৃষ্টি হয়, আর এতে বিশৃংখলারও সূচনা হয়। তাই বলেছেন, তোমাদের যদি আমার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে থাকে আর তোমরা আমার আনুগত্যের দাবি কর তাহলে আমার শিক্ষা হলো– প্রত্যেক প্রকার ফিৎনা ও অশান্তির পথ এড়িয়ে চল। তোমাদের ধৈর্য ও সহনশীলতার মান এমন হওয়া উচিত যে,

তোমাদেরকে কেউ গালি দিলেও তোমরা ধৈর্য হাতছাড়া করো না। আর এ শিক্ষার ওপর আমল করেই তোমাদের মুক্তির পথ সুগম হবে। তোমরা খোদার নৈকট্যপ্রাপ্তদের শ্রেণিভূক্ত হবে। কোন বিষয়েই বিবাদ-বিতন্ডায় জড়ানো উচিত নয়। সত্যবাদী হয়েও মিথ্যাবাদীর ন্যায় বিনয় অবলম্বন কর। তোমাদেরকে যে যা-ই বলুক তোমরা তাদের সাথে ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার কর। পবিত্র ও মিষ্ট এমন ভাষা ব্যবহার কর, এমন উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তোমাদের মাঝে গড়ে তোল যেন লোকেরা তোমাদের দিকে আসার প্রবল আকর্ষণ বোধ করে। তোমাদের আশপাশের পরিবেশে সবাই যেন জানে যে, এ ব্যক্তি আহমদী। এর কাছে উত্তম চরিত্র ছাড়া অন্য কিছুর আশা করা যায় না। তোমাদের এই চারিত্রিক গুণ অন্যদেরকে টেনে আনার ও মনোযোগ আকর্ষণ করার কারণ হবে।

আরেকটি বিষয় যা ঘটে তাহলো ব্যক্তিস্বার্থের বশবর্তী হয়ে কেউ কেউ মামলা মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্যও দিয়ে থাকে। মিথ্যা কেইস করে থাকে। তিনি বলেন তোমাদের ব্যক্তিস্বার্থও যেন তোমাদেরকে সত্য-সাক্ষ্য প্রদান করা থেকে বিরত রাখতে না পারে। অনেক লোক, এখানেও আর অন্যান্য দেশেও অনেক সময় অভিবাসন লাভের চক্করে পড়ে মিথ্যা কথা বলে থাকে। এগুলোও এড়িয়ে চল। যা সঠিক ও বাস্তব অবস্থা সে অনুসারে নিজের কেইস উপস্থাপন করাও। এভাবে যদি কেইস গৃহীত হয় ভালো কথা নতুবা ফেরৎ যাও। কেননা, মিথ্যা তথ্য দেয়ার পরও অনেকের কেইস প্রত্যাখাত হয়। তাই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে পরীক্ষা দিয়ে দেখুন, ইনশাআল্লাহ্ এতেই লাভ হবে। আর যদি গৃহীত নাও হয় তাহলে কমপক্ষে আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির কারণ তো হবে না।

পরস্পর ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসা সৃষ্টি কর আল্লাহ্ তা'লার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক গড়

নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দিতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, "পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা সৃষ্টি কর আর পাশবিকতা ও মতভেদ পরিহার কর। সকল প্রকার খেলা-তামাশা ও উপহাস সম্পূর্ণভাবে বর্জন কর। কেননা, উপহাস ও বিদ্রূপ মানুষের হৃদয়কে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। পরস্পর একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও,

প্রত্যেকে নিজের আরামের ওপর ভাইয়ের আরামকে প্রাধান্য দাও, আল্লাহ্ তা'লার সাথে সত্যিকার মিমাংসা কর। তাঁর আনুগত্যের গণ্ডিতে ফিরে আস। ...পারস্পরিক সকল ঝগড়াবিবাদ এবং রাগ ও শত্রুতা পরিহার কর। কেননা, এখন ঐ সময় এসে গেছে যখন তোমাদের নগণ্য বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় বড় কাজে নিয়োজিত হওয়া উচিত।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৬-২৬৮)

তিনি (আ.) আরও বলেন:

খোদা তা'লার সাথে আমাদের জামা'তের সত্যিকার সম্পর্ক বন্ধন রচিত হওয়া উচিত আর তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত যে, খোদা তা'লা তাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেন নি। বরং তাদের ঈমানী শক্তিকে সুদৃঢ় পর্যায়ে উপনীত করার জন্য নিজের শক্তিমত্তার শত শত নিদর্শন দেখিয়েছেন। তোমাদের মাঝে এমন কেউ কি আছে যে বলতে পারবে আমি কোন নিদর্শন দেখি নি? আমি দাবির সাথে বলছি, একজন মানুষও এমন নেই, আমাদের সংস্পর্শে থাকার সৌভাগ্য যার হয়েছে, অথচ সে খোদা তা'লার জলজ্যান্ত নিদর্শন নিজ চোখে দেখে নি।

আমাদের জামা'তের সদস্যদের জন্য এটি আবশ্যকীয় যে, তাদের ঈমান যেন বৃদ্ধি পায়, খোদা তা'লার ওপর যেন সত্যিকার বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানও দৃঢ়তা লাভ করে। পুণ্যকর্মে শিথিলতা ও অলসতা যেন সৃষ্টি না হয়। কেননা, শিথিলতা সৃষ্টি হলে ওযু করাও একটা আপদ মনে হয়, তাহাজ্জুদ নামায তো অনেক পরের বিষয়। যদি সৎকর্মের শক্তি সৃষ্টি না হয় আর পুণ্যের কাজে অগ্রগামী হওয়ার প্রেরণা না থাকে তাহলে আমাদের সাথে সম্পর্ক গড়া নিরর্থক। (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭১০-৭১১, নব সংস্করণ)

বয়আতের এই শর্ত অর্থাৎ, দশ নম্বর শর্তের আলোচনা চলছে। এতে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর নিজের সাথে এমন নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলেছেন যার নমুনা জগতের অন্য কোন আত্মীয়তার সম্পর্কে পাওয়া যাবে না– এর কারণও শুধুমাত্র আমাদের জন্য তাঁর (আ.) সহমর্মিতা। আমাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি (আ.) তা বলেছেন। কেননা, সত্যিকার ইসলাম শুধুমাত্র তাঁকে (আ.) মান্য করার মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব। আমরা যদি নিজেদেরকে তলিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে চাই

তাহলে আমাদের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নৌকায় আরোহণ করা আবশ্যক।

তিনি (আ.) বলেন, "এখন আমার পানে ছুটে আস। কেননা, এটাই সময়। যে ব্যক্তি এখন আমার পানে ছুটবে আমি তাকে ঐ ব্যক্তির সাথে তুলনা করি, যে তুফানের সময়ে জাহাজে উঠে নিরাপদ আসন গ্রহণ করেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমাকে মান্য করে না, আমি দেখছি যে– সে তুফানের মুখে নিজেকে ঠেলে দিচ্ছে আর তার কাছে বাঁচার কোন উপকরণ নেই। সত্যিকার শাফায়াতকারী আমি যে সেই মহাসম্মানিত শাফায়াতকারীর ছায়া ও প্রতিচ্ছবি, যাকে এ যুগের অন্ধরা গ্রহণ করে নি আর তাঁকে চরমভাবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে অর্থাৎ, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে।" (দাফেউল বালা, রূহানী খাযায়েন, ১৮তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৩)

এটি বলার কারণ হলো, মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী-ই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দাবি করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার দুটি সুফল

আবার তিনি (আ.) বলেন:
"মূলতঃ আমার হাতে বয়আত করার দুটি উপকারিতা রয়েছে। একটি হলো পাপের ক্ষমা লাভ হয়। আর মানুষ খোদা তা'লার সাথে প্রতিশ্রুতি অনুসারে জীবনযাপন করায় ক্ষমা লাভের যোগ্য হয়। দ্বিতীয়ত প্রত্যাদিষ্টের সামনে তওবা করার কারণে শক্তি লাভ হয় আর এতে মানুষ শয়তানী আক্রমণ থেকে রেহাই পায়। স্মরণ রেখো! এ জামা'তে শামিল হওয়ার উদ্দেশ্য যেন বস্তুজগত না হয়। খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভই যেন উদ্দেশ্য হয়। কেননা, এই ইহজগৎ ছেড়ে একদিন যেতেই হবে। এটা কোন না কোনভাবে অতিবাহিত হয়েই যাবে।

'কষ্টদায়ক রাত হোক বা বিলাসিতাপূর্ণ রাত, তা কেটেই যাবে'।

ইহজগৎ আর এই ইহজাগতিক উদ্দেশ্যাবলীকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক রেখো। সেসবকে ঈমান বা ধর্মবিশ্বাসের সাথে কখনো গুলিয়ে ফেলো না। কেননা, জগত নশ্বর কিন্তু ধর্ম ও ধর্মের ফলাফল নিঃশেষ হওয়ার নয়। (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৫)

এই যুগের সুরক্ষিত দুর্গ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)

তিনি (আ.) আরো বলেন:

"আর তোমরা হে আমার বন্ধুগণ! আমার প্রিয়রা! আমার বৃক্ষরূপ অস্তিত্বের সবুজ শাখারা! তোমাদের ওপর বর্ষিত খোদা তা'লার অনুগ্রহে তোমরা আমার বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছ এবং নিজেদের জীবন, নিজেদের আরাম ও নিজেদের ধনসম্পদ এ পথে বিলিয়ে দিচ্ছ। যদিও আমি জানি, আমি যা-ই বলবো তা স্বীকার করে নেয়াকে তোমরা নিজেদের সৌভাগ্য মনে করবে এবং তোমাদের শক্তি অনুযায়ী তা করতে কুণ্ঠিত হবে না, তথাপি এ সেবার জন্য আমি নিজের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কোন কিছু তোমাদের ওপর ধার্য করতে চাই না, যেন তোমাদের খেদমত আমার বলার দরুন বাধ্যতামূলক না হয়ে তোমাদের নিজেদের অনুপ্রেরণা থেকে হয়। আমার বন্ধু কে? আর আমার প্রিয়ই বা কে? সে-ই, যে আমাকে চিনে। আমাকে কে চিনে? কেবল সে-ই, যে আমার সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আমি (খোদা কর্তৃক) প্রেরিত হয়েছি এবং আমাকে সেভাবেই গ্রহণ করে যেভাবে প্রেরিত পুরুষগণকে গ্রহণ করা হয়। পৃথিবী আমাকে গ্রহণ করতে পারে না কেননা, আমি পৃথিবী হতে নই। কিন্তু যাদের প্রকৃতিকে সে জগতের অংশ দেয়া হয়েছে তারা আমাকে গ্রহণ করে এবং করবে। যে আমাকে পরিত্যাগ করে, সে তাঁকে পরিত্যাগ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন। আর যে আমার সাথে সম্পর্ক-বন্ধন রচনা করে, আসলে সে তাঁর সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করে, যাঁর পক্ষ থেকে আমি এসেছি। আমার হাতে একটি প্রদীপ আছে; যে আমার কাছে আসে সে অবশ্যই সে আলো থেকে জ্যোতি লাভ করবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সন্দেহ ও কুধারণার বশবর্তী হয়ে দূরে সরে যায়, সে ঘোর অমানিশায় নিক্ষিপ্ত হবে!

এ যুগের দুর্ভেদ্য দুর্গ আমি। যে ব্যক্তি আমাতে প্রবেশ করে সে চোর, দস্যু ও হিংস্র জন্তু থেকে নিজ প্রাণ রক্ষা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার প্রাচীর থেকে দূরে থাকতে চায়, তার চারদিকে মৃত্যু বিরাজমান এবং তার লাশও নিরাপদ নয়। আমাতে কে প্রবেশ করে? সে-ই, যে পাপ বর্জন করে ও পুণ্য অবলম্বন করে এবং বক্রতা ছেড়ে সাধুতার দিকে অগ্রসর হয় ও শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে খোদা তা'লার এক অনুগত দাসে পরিণত হয়। যে-ই এরূপ করবে সে আমার এবং আমি তার। কিন্তু এরূপ করতে কেবল সে-ই সক্ষম হয়, যাকে খোদা তা'লা পবিত্রতা সাধনকারী ব্যক্তির ছায়াতলে আশ্রয় দেন। তখন

তিনি সেই ব্যক্তির অবাধ্য প্রবৃত্তির দোযখে নিজের পা রেখে দেন। তখন তা এরূপ ঠান্ডা হয়ে যায়, যেন তাতে কখনো আগুন ছিলই না। তখন সে উন্নতির পর উন্নতি করতে থাকে। এমনকি খোদা তা'লার রূহ বা প্রেরণা তার মাঝে ঘর বাঁধে এবং এক বিশেষ জ্যোতির্বিকাশসহ তার হৃদয়ে বিশ্বজগতের প্রভু প্রতিপালকের অধিষ্ঠান হয়। (অর্থাৎ, খোদা তার হৃদয়ে স্বীয় আরশ প্রতিষ্ঠিত করেন) তখন তার পুরাতন মনুষ্যত্ব জ্বলে ছাই হয়ে যায় এবং এক নতুন ও পবিত্র মনুষ্যত্ব তাকে দান করা হয়। খোদা তা'লাও এক নতুন খোদা হয়ে তার সাথে এক নতুন ও বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেন। তার স্বর্গীয় জীবনের সব পবিত্র উপকরণ এ জগতেই সে পেয়ে যায়।" (ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত সকল অঙ্গীকার রক্ষা করার তৌফিক দান করুন। আমরা যেন তাঁর সাথে কৃত বয়আতের অঙ্গীকারে দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি। তাঁর শিক্ষার ওপর আমল করে আমরা যেন আমাদের জীবনকে জান্নাতপ্রতিম করতে পারি। আর পরকালের জান্নাতেরও যেন আমরা উত্তরাধিকারী গণ্য হই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সাহায্য করুন। আমীন! (খুতবা জুমুআ, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩, মসজিদ ফজল লন্ডন, ইংল্যান্ড)

দ্বিতীয় অংশ

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন আধ্যাত্মিক বিপ্লব সংক্রান্ত কতিপয় ঈমান উদ্দীপক ঘটনা

১

[লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমুআর খুতবা, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৩]

তোমাদের জন্য শুভ সংবাদ এখন থেকে সর্বদা তোমরা ন্যায়সংগত নির্দেশনার আওতাধীন থাকবে

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰۤى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۳﴾

(সূরা মুমতাহানা, ৬০:১৩)

অনুবাদ: হে নবী! মু'মিন মহিলারা যখন তোমার কাছে আসে (এবং এ বলে) তোমার কাছে বয়আত করে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, তারা নিজেদের হাত ও পায়ের মাধ্যমে মিথ্যা কথা বানিয়ে (তা) কারো প্রতি আরোপ করবে না এবং ন্যায়সংগত (বিষয়ে) তোমার অবাধ্যতা করবে না, তাহলে তুমি তাদের বয়আত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা চেয়ো। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল বার বার কৃপাকারী।

গত খুৎবায় আমি বয়আতের শর্তাবলীর ১০ম তথা শেষ শর্তের ওপর বর্ণনা করেছি। তবে ন্যায়সংগত নির্দেশনার সাথে আনুগত্যের যে সম্পর্ক সেই প্রসঙ্গে আজ কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করতে চাই।

মা'রুফ বা 'ন্যায়সংগত কথার আনুগত্য'-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যাখ্যা

এই আয়াতে মহিলাদের নিকট থেকে এই অঙ্গীকারের শর্তে বয়আত নেয়ার তাগিদ দেয়া হয়েছে– তারা শির্ক করবে না। চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না। সন্তানদের হত্যা করবে না (সন্তানের সুশিক্ষা লাভের প্রতি দৃষ্টি রাখবে)।

কারো ওপর মিথ্যা অপবাদ লাগাবে না। আর ন্যায়সংগত বিষয়ে অবাধ্যতা করবে না। এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, নবী– যিনি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত, তিনি কি এমন আদেশ-নিষেধ দিতে পারেন যা অন্যায়? আর নবী যদি দিতে পারেন তাহলে খলীফাও এমন অন্যায় শিক্ষা বা নির্দেশ দিতে পারেন! এ প্রসঙ্গ স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, নবী কখনও এমন শিক্ষা বা নির্দেশ দিতেই পারেন না। নবী যা বলবেন তা ন্যায়সংগতই বলবেন, এছাড়া তিনি আর কিছুই বলবেন না। এজন্য পবিত্র কুরআনের কয়েকটি স্থানে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশের আনুগত্য কর, এটা পালন কর। কোথায়ও এটা লেখা হয় নি– যে নির্দেশ ন্যায়সংগত তার আনুগত্য কর। ফলে আবার এই প্রশ্নেরও অবতারণা হয়, দু'টি ভিন্ন নির্দেশ তবে কেন? আসল বিষয় হলো- এগুলো দু'টি ভিন্ন নির্দেশ নয়। এটি অনেকের বুঝবার ভুল। যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি– নবীর যে নির্দেশই হবে তা ন্যায়সংগত হবে আর নবী কখনো আল্লাহ্ তা'লার বিধান পরিপন্থি, শরীয়তের বিধি-নিষেধের বিপরীত কাজ করতেই পারেন না। তাঁকে তো এ কাজের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে। যে কাজের জন্য পাঠানো হয়েছে এর বিপরীত তিনি কীভাবে বলতে পারেন? এটা আমাদের জন্য সুসংবাদ- তোমরা নবীকে মেনে, মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্টকে মেনে, তাঁর জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে সুরক্ষিত হয়েছো। তোমাদের জন্য এখন কোন অন্যায় নির্দেশের প্রশ্নই ওঠে না। যে নির্দেশই রয়েছে এটা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে পছন্দনীয়। "আরেকটি ভ্রান্তি হল, মা'রুফ বিষয়ে আনুগত্য করা সংক্রান্ত। যেসব কাজকে আমরা ন্যায়সংগত মনে করছি না, আমরা এর আনুগত্য করবো না। লক্ষ্যণীয় হলো, মহানবী (সা.) সম্পর্কে একই শব্দ অবতীর্ণ হয়েছে– **'ওয়ালা ইয়াসিনাকা ফি মা'রুফিন'**।

তবে কি এরা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দোষত্রুটির কোন তালিকা তৈরী করেছে? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও বয়আতের শর্তে মা'রুফ বিষয়ে আনুগত্য নির্দেশটি ব্যবহার করেছেন আর এতে একটি নিগূঢ় রহস্য নিহিত রয়েছে। তোমাদের কারো সম্পর্কে আমি কোন কুধারণা পোষণ করি না। এজন্য আমি এ বিষয়টি পরিষ্কার করতে চাচ্ছি, তোমরা কেউ যেন আত্মপ্রতারণার শিকার না হও।" (খুতবাতে নূর, পৃষ্ঠা ৪২০-৪২১)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) **"ইয়ামুরুহুম বিল মা'রফ"** এর তফসীরে লিখেন, "এই নবী (সা.) সেসব বিষয়েরই আদেশ করেন যা কান্ডজ্ঞান বিবর্জিত নয়। আর ঐসব বিষয়ে বারণ করেন যেগুলো সম্পর্কে বিবেক নিষেধ করে। পবিত্র জিনিসকে বৈধ আর অপবিত্র জিনিসকে অবৈধ করেন। জাতিসমূহের মাথা

থেকে সেই বোঝা নামিয়ে দেন যার নিচে তারা চাপা পড়ে রয়েছে। তিনি সেসব ঘাড়কে বেড়িমুক্ত করেন যার কারণে গর্দান সোজা হতে পারে না। তাই, যারা এতে ঈমান আনবে এবং নিজে অন্তর্ভুক্ত হয়ে একে শক্তিশালী করবে, একে সাহায্য করবে আর এই নূরের আনুগত্য করবে যা তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে, সে ইহকাল ও পরকালের সব সমস্যা থেকে মুক্তি লাভ করবে। (বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, ২১তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২০)

তাই, মহানবী (সা.) স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা থেকে বিচ্যুত নন, তাহলে খলীফা– যিনি নবীর পরে নবীর মিশনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে মু'মিনদের এক জামা'তের মাধ্যমে নিযুক্ত হন, তিনি কীভাবে বিচ্যুত হতে পারেন! তিনিও সেই শিক্ষাকে, সেসব বিধিবিধানকে অগ্রগামী করেন যা আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। এ যুগে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্পষ্ট করে তা আমাদেরকে জানিয়েও দিয়েছেন। কাজেই এখন এই খিলাফতের ব্যবস্থাপনা, যা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে আহমদীয়া জামা'তে প্রবর্তিত হয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ্ কিয়ামত পর্যন্ত তা প্রতিষ্ঠিত থাকবে– এখানে শরীয়ত ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ীই সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় আর ইনশাআল্লাহ্ হতে থাকবে আর এটাই ন্যায়সংগত সিদ্ধান্ত। যদি কোন সময় যুগখলীফা কোন ভুল করেন বা ভুলক্রমে এমন কোন সিদ্ধান্ত দেন যাতে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এমন উপকরণ সৃষ্টি করবেন যার ফলে এর অশুভ পরিণাম প্রকাশ পাবে না।

এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "ব্যক্তিগত কোন বিষয়ে যুগখলীফা দ্বারা কোন ভুলের ঘটনা ঘটতে পারে, কিন্তু ঐ সব বিষয় যার উপর জামা'তের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতি নির্ভর করে সেক্ষেত্রে যদি তাঁর দ্বারা এমন কোন ভুল হয়েও যায় তাহলে খোদা তা'লা এক্ষেত্রে নিজ জামা'তের সুরক্ষা বিধান করেন। আর কোন না কোন ভাবে ভুল সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। সুফিদের পরিভাষায় একে **ইসমতে সুগরা** (lesser protection) বলা হয়। অর্থাৎ, নবীদের লাভ হয় **ইসমতে কুবরা** (greater protection) কিন্তু খলীফাদের ইসমতে সুগরা লাভ হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর দ্বারা এমন কোন গুরুতর ভুল হতে দেন না, যা জামা'তের জন্য ধ্বংসের কারণ হতে

পারে। তাঁর সিদ্ধান্তে আংশিক ও সামান্য ভুল হতে পারে কিন্তু পরিণামে ফলাফল তাই হবে, যার ফলে ইসলামের বিজয় অর্জিত হবে, তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা পরাজিত হবে। অর্থাৎ, তাঁর ইসমতে সুগরা (lesser protection) অর্জিত হলেও খোদা তা'লার নীতি তাই হবে যা তাঁর নীতি। যদিও তিনিই বলবেন, তারই জিহ্বা নড়বে, তারই হাত চলবে এবং তার মস্তিষ্কই কাজ করবে, কিন্তু এ সব কিছুর আড়ালে থাকবে খোদা তা'লার হাত। গৌণ বিষয়ে তার দ্বারা সামান্য ভুল হতে পারে। অনেক সময় তার পরামর্শদাতা তাকে ভুল পরামর্শ দিতে পারে। কিন্তু এর মধ্যবর্তী সব বাধাবিপত্তি পেরিয়ে বিজয় হবে তারই। আর সবগুলো কড়া বা আংটা মিলে যখন পূর্ণ শিকলে পরিণত হবে, তখন সঠিক সাব্যস্ত হবেন তিনিই আর এমন সুদৃঢ় হবেন যে, কোন শক্তি তাঁকে ভাঙতে বা ছিঁড়ে ফেলতে সক্ষম হবে না।" (তফসীরে কবীর, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৩৭৬-৩৭৭)

পবিত্র কুরআনে আরও বর্ণিত হয়েছে-

وَاَقۡسَمُوۡا بِاللّٰهِ جَهۡدَ اَيۡمَانِهِمۡ لَئِنۡ اَمَرۡتَهُمۡ لَيَخۡرُجُنَّ ؕ قُلۡ لَّا تُقۡسِمُوۡا ۚ
طَاعَةٌ مَّعۡرُوۡفَةٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ ۝

(সূরা আন্ নূর, ২৪:৫৪)

অর্থাৎ, আর তারা আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ় শপথ করেছে যে, যদি তুমি তাদের নির্দেশ দাও তাহলে তারা অবশ্যই বেরিয়ে পড়বে। তুমি বল! কসম খেয়ো না বরং ন্যায়সংগত আনুগত্য কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতেও ইতায়াত বা আনুগত্যের বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে আর মু'মিনগণ সর্বদা এ কথাই বলে থাকেন যে, 'আমরা শুনলাম আর মানলাম' আর এই তাকওয়ার কারণেই তারা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভকারী আখ্যায়িত হন এবং সাফল্য অর্জন করে থাকেন। অতএব, এ আয়াতে এটাও বলা হয়েছে যে, মু'মিনদের ন্যায় 'শোন ও আনুগত্য কর'-এর দৃষ্টান্ত দেখাও। অযথা কসম খেয়ো না যে, 'আমরা হেন করবো, তেন করবো'।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তফসীরে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন- মুনাফিকরাও অনেক দাবি করে থাকে। আসল বিষয় হলো, কার্যত আনুগত্য প্রদর্শন করা

আর মুনাফিকদের মত বড় বড় দাবি না করা। এখানে আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের ক্ষেত্রে বলেছেন, আনুগত্যের যে ন্যায়সংগত পন্থা রয়েছে, যে আনুগত্য নিয়মতান্ত্রিক, সেই আনুগত্য অবশ্যই কর। নবী তোমাদেরকে শরীয়তবিরোধী ও কাণ্ডজ্ঞানহীন কোন আদেশ দিতে পারেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার হাতে বয়আত করেছ এবং আমাকে মান্য করেছ, তাহলে পাঁচ বেলার নামাযে অভ্যস্ত হও, মিথ্যা বলা ছেড়ে দাও, অহংকার পরিত্যাগ কর, লোকদের অধিকার হরণ করা ছেড়ে দাও এবং পরস্পর সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার কর– এসবই ন্যায়সংগত আনুগত্যের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো না করে যদি কেউ শুধু বলে বেড়ায়, আমরা কসম খাচ্ছি, আপনি আমাদের যে আদেশই দিবেন তা আমরা পালন করবো এবং শিরোধার্য করবো, তাহলে এটি ন্যায়সংগত আনুগত্য নয়।

এছাড়া বিভিন্ন সময় আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য খলীফাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরণের তাহ্রীক (বা বিশেষ কাজে উদ্বুদ্ধ) করা হয়ে থাকে। যেমন– মসজিদ আবাদ রাখা, নামায প্রতিষ্ঠা করা, সন্তানদের তরবীয়ত করা, নিজ নৈতিকতার মান উন্নত করা, চিন্তাধারার উন্নতি সাধন, তবলীগ করা অথবা বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কুরবানীর বিষয়ে তাহ্রীক (বা বিশেষ কাজে উদ্বুদ্ধকরণ)। এগুলো এমন বিষয়, যার আনুগত্য করা আবশ্যকীয়। অন্য কথায়, এগুলো মা'রুফ বা ন্যায়সংগত বিষয়ে আনুগত্যের গণ্ডিভুক্ত বিষয়। তাই কোন নবী অথবা কোন খলীফা তোমাদের দ্বারা আল্লাহ্ তা'লার বিধিবিধান বা বুদ্ধিবিবেক পরিপন্থি কোন কাজ করাতে পারেন না।

এটা বলবেন না, 'তোমরা আগুনে ঝাঁপ দাও অথবা সমুদ্রে লাফিয়ে পড়'। তারা তোমাদেরকে সর্বদা শরীয়তসম্মত পথেই পরিচালিত করবেন। গত খুতবায় আমীরের নির্দেশে আগুনে ঝাঁপ দেয়া প্রসঙ্গে আমি একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছিলাম। সে সম্পর্কে আরো হাদীস রয়েছে যাতে বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আলকামা বিন মুজাযযেয্ (রা.)-কে একটি যুদ্ধে পাঠান। যখন তিনি তাঁর যুদ্ধের নির্ধারিত জায়গার নিকটবর্তী হন অথবা তখনও পথেই ছিলেন এ অবস্থায় সেনাদলের একটি অংশ তাঁর কাছে যাত্রা বিরতির অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দেন।

আর আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফা বিন কায়েস আল সাহ্মী-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করে দেন। আমি তাঁর সাথে এ যুদ্ধাভিযানে অংশ নিয়েছিলাম। তখনও তিনি পথিমধ্যেই ছিলেন এমন সময় ঐ লোকেরা আগুন পোহাতে বা খাবার রান্নার জন্য আগুন জ্বালাল। তখন আব্দুল্লাহ্ (যিনি আমীর নিযুক্ত হয়েছিলেন আর যার স্বভাব ছিল রসিকতাসূলভ) বললেন, আমার কথা শুনে মান্য করা তোমাদের জন্য আবশ্যক নয় কী? তারা বললো, কেন নয়? এতে আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফা (রা.) বললেন, আমি তোমাদেরকে যে আদেশ দিব তোমরা কি তাই করবে? তারা বললো, হ্যাঁ, তাই করবো? তখন আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফা (রা.) বললেন, আমি তোমাদের জোর নির্দেশ দিচ্ছি, তোমরা এ আগুনে ঝাঁপ দাও। এতে কয়েকজন দাঁড়িয়ে আগুনে ঝাঁপ দেয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগলো। আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফা (রা.) যখন দেখলেন সত্যি সত্যিই এরা আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে তখন তিনি বারণ করে বললেন, 'তোমরা থাম'। (যখন তিনি দেখেন যে, মানুষ নির্দেশ পালনে উদ্যত তখন তিনি নিজেই বারণ করেন)

বর্ণনাকারী বলেন, পরে যখন যুদ্ধ থেকে আমরা ফিরে আসি, সাহাবীগণ (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ঘটনাটি অবহিত করেন। এতে রসূল (সা.) বলেন, "আমীরদের মধ্যে যে তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার অবাধ্যতার আদেশ দেয়, তোমরা তার আনুগত্য করবে না।" (সুনান ইবনে মাজাহ্, কিতাবুল জিহাদ, বাব লে ইতায়াতে ফি মা'সিয়াতিল্লাহ্)

অতএব, বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়া উচিত, নবী অথবা যুগখলীফা হাসি-ঠাট্টাচ্ছলেও এমন কথা বলতে পারেন না। এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন− তোমরা যদি আমীরের পক্ষ থেকে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশের পরিপন্থি কিছু দেখতে পাও, তাহলে আল্লাহ্ ও রসূলের (সা.) দিকে প্রত্যাবর্তন কর। এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পরে খিলাফতে রাশেদা প্রবর্তিত হয়েছে। তাই তোমরা খিলাফতের দ্বারস্থ হও, তাঁর সিদ্ধান্ত সর্বদা ন্যায়সংগত বা মা'রুফ হবে। আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর বিধান অনুসারেই হবে। তাই যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, তোমাদের জন্য শুভসংবাদ যে, এখন সদাসর্বদা তোমরা ন্যায়সংগত বিষয় বা মা'রুফের আওতায় থাকবে। কোন সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ ইনশাআল্লাহ্ এমনটা হবেই না, যা 'গয়ের মা'রুফ' বা অন্যায্য অর্থাৎ, ন্যায়সংগত নয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে সাধিত আধ্যাত্মিক বিপ্লব

এটুকু উল্লেখের পর আমি স্মরণ করাতে চাই, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়া, তার (আ.) হাতে বয়আত গ্রহণ করা, তার (আ.) সাথে বয়আতের সেই দশটি শর্তে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে সেই শর্তাবলী প্রতিপালন করা হয়েছে কি, আনুগত্যের নমুনা দেখানো হয়েছে কি? নাকি এসব কেবলই বুলিসর্বস্ব কথা যে, 'আমরা তাঁর হাতে বয়আত করছি।' এজন্য আমি কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি, যা থেকে পরিদৃষ্ট হয়, বয়আত গ্রহণকারীরা নিজেদের মাঝে কী অসাধারণ পরিবর্তন এনেছেন আর তাদের ভেতর কী আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধিত হয়েছে। অসাধারণ সেই পরিবর্তন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে যেমন ঘটেছে এ যুগেও আমরা তেমনটিই প্রত্যক্ষ করছি।

"আমি হলফ করে বলতে পারি, কম করে হলেও অন্তত এক লাখ মানুষ আমার জামা'তে এমন রয়েছে, যারা মন থেকে সত্যিকারেই আমার আবির্ভাবের প্রতি ঈমান এনেছে, আমাকে গ্রহণ করে নিয়েছে আর সৎকর্ম সম্পাদন করে চলছে, এমনকি আমার কথা মনোনিবেশসহ শ্রবণকালে কান্নায় তারা এমনভাবে ভেঙ্গে পড়েন যে, চোখের পানিতে তাদের বুক পর্যন্ত ভেসে যায়"। (সিরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৬)

শির্ক পরিহার করা

বয়আতের একটি শর্ত ছিল শির্ক্ থেকে আত্মরক্ষা করবে। এক্ষেত্রে কেবল আমাদের পুরুষরাই নয় বরং মহিলারাও এমন উন্নত মান প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর এমন অসাধারণ আদর্শ দেখিয়েছেন যে, তাদের দেখে হৃদয় আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসায় ভরে যায় যে, কীরূপ অসাধারণ বিপ্লব সাধিত হয়েছে! আর এতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য আপনা থেকেই উদ্‌বেলিত দোয়া নির্গত হতে থাকে।

হযরত চৌধুরী জাফরউল্লাহ্ খান সাহেবের মায়ের শিরকের প্রতি জীবনভর কতটা ঘৃণা ছিল, এর দৃষ্টান্তমূলক একটা বাস্তব ঘটনা রয়েছে। তিনি (রা.) বলেছেন, তাঁর সন্তানদের বেশিরভাগ জন্মের পর মারা যেতো। এমনই

অবস্থায় একবার তাঁর এক শিশুসন্তান অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থ সেই শিশুর চিকিৎসা আরম্ভ করা হয়। একজন একটি তাবিজ দিয়ে যায় আর এক মহিলা সেই তাবিজটি শিশুর গলায় পরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু শিশুটির মা তাবিজটি টেনে নিয়ে যান আর চুলার জলন্ত আগুনে ফেলে দিয়ে বলেন 'আমার নির্ভরতা হলো আমার (খালেক ও মালেক)-স্রষ্টা ও মালিকের ওপর। আমি ওসব তাবিজ-কবজকে কোন বিশেষত্ব দিব না'। পরবর্তিতে শিশুটি ভাল হয়ে দু'মাস বয়সে উপনীত হওয়ার পর শিশুকে নিয়ে তিনি 'ডেস্কা'-য় তার শ্বশুরালয়ে যান এবং সেখানে ছয় মাস অবস্থান করেন। তখন শিশুর বয়স ৮মাসে পৌঁছালে তিনি তাকে নিয়ে বাপের বাড়ি আসেন। এর ৬দিন পর সেই মহিলা অর্থাৎ, জয়দেবী পুনরায় এই বাড়িতে আসে, শিশু বালকটিকে চুমু দিয়ে শিশুর মায়ের কাছে কিছু কাপড়চোপড় আর খাদ্যশস্য এমন ভাবে চাইলো যা থেকে এই ধারণা পাওয়া যায় যে, এসব জিনিস জাফরকে বিপদমুক্ত করার জন্য। জবাবে তিনি (চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের মা) বললেন, তুমি এক কাঙ্গাল বিধবা, সদকা-খয়রাতস্বরূপ কিছু চাইলে যতটা আমি দিতে পারি, তা দেয়ার জন্য আমি প্রস্তুত, কিন্তু আমি ভুতপ্রেত ও ডাইনীতে বিশ্বাসী নই। মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ই আমার একমাত্র প্রভু-প্রতিপালক, জীবনমরণের মালিক একমাত্র তিনিই। এমন বিষয়ে অন্য কারো হাত থাকতে পারে, তা আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। আমার দৃষ্টিতে এমনটি ভাবা অংশীবাদিতার নামান্তর আর এমন বিষয়কে অবশ্যই ঘৃণা করি। এই বিশেষ কারণে আমি তোমাকে কিছু দিতে মোটেই প্রস্তুত নই। এতে জয়দেবী বলে উঠে, ভালো করে ভেবে দেখ, তোমার ছেলের জীবন বাঁচাতে চাইলে তোমার কাছে আমি যা চেয়েছি, সেই দাবি তোমাকে পুরণ করতেই হবে।

কয়েকদিন পর শিশু জাফরকে তিনি গোসল করাচ্ছিলেন, জয়দেবী পুনরায় এসে উপস্থিত হয় আর শিশুটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কৌতুহলের সাথে বলে, 'এই কি সেই শাহাজাদা' শিশুর মা 'হ্যাঁ' সূচক জবাব দিয়ে বললেন হ্যাঁ, এ সেই শিশুই। জয়দেবী আবারো সেই একই রূপ ভিক্ষা চাইলে তিনি (শিশুর মা) দৃঢ়তার সাথে তাকে কোন কিছু দিতে অস্বীকৃতি জানান। এতে জয়দেবী ক্ষুব্ধ হয়ে বললো, 'ঠিক আছে, তুমি যদি তোমার এই সন্তানকে জীবিত অবস্থায় সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারো কেবল তবেই বলতে পারবে যে, আমি মিথ্যা বলছি'। শিশুর মা বললেন, 'যা ঘটার খোদার ইচ্ছাতে-ই ঘটবে'।

জয়দেবী ফিরতি পথ ধরে আর তখনও দেউড়িতেও পৌঁছেনি, শিশুকে তখনও গোসল করানো হচ্ছে, এরই মধ্যে শিশু জাফর রক্তবমি করে এবং রক্ত পায়খানা করে। কয়েক মিনিটের ভেতর শিশুর অবস্থার চরম অবনতি ঘটে আর কয়েক ঘন্টার মধ্যে শিশুটি পরলোক গমন করে। তিনি আল্লাহ্র প্রতি নিবেদিত হয়ে স্বগতোক্তি করেন, 'হে আমার প্রভু প্রতিপালক! তুমিই সন্তান দান করেছিলে আর তুমিই তাকে ফিরিয়ে নিলে! তোমার সন্তুষ্টিতে আমি সন্তুষ্ট! তুমিই এখন আমাকে ধৈর্য ধারণের শক্তি দাও।' এরপর শূন্য কোলে তিনি 'ডেস্কা' শহরে তার নিজ স্বামীগৃহে ফেরত যান। (আসহাবে আহমদ, ১১তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫-১৬)

লক্ষ্য করুন! এরপর আল্লাহ্ তা'লা কীরূপ পুরস্কাররাজিতে ধন্য করেছেন, 'চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব'-এর মত সুপুত্র তাঁকে দান করেছেন। যিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করে বিশ্বজুড়ে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন।

রিপুর তাড়নার শিকার হবে না

বয়আত করার পর মানুষ রিপুর তাড়না থেকে কীভাবে সুরক্ষা লাভ করছে সে প্রসঙ্গে কেবল সে যুগের কথাই নয় বরং আমি এ যুগের দৃষ্টান্তও তুলে ধরছি, আর তা-ও আফ্রিকার লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখে।

আফ্রিকার pagan-দের মাঝে অনেক নোংরা আচারঅনুষ্ঠান ও কদাচার বিদ্যমান। কিন্তু আহমদীয়াত গ্রহণ করার সাথে সাথেই তারা সেসব নোংরা আচার-আচরণ পরিহার করে নিজেদের মাঝে এমন পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেছে যে, সেসব নোংরামি যেন তাদের মাঝে কখনও ছিলই না। এমন রিপোর্টও আসে, মদ্যপানে অভ্যস্তরা মদ পান করাকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করে আর এতে অন্যদের ওপরও প্রভাব পড়ে। আর তাদের মাঝে ঘটে যাওয়া পবিত্র পরিবর্তনের এসব কথা যখন তারা তুলে ধরে, মোল্লারা বলে– আহমদীয়াত তাদের ওপরে যাদুটোনা করেছে আর এ কারণে তারা মদ পান করা ছেড়ে দিয়েছে।

একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে গেল। একজন মুরব্বী সাহেব আমাকে বলেছেন, ঘানার এক ব্যক্তি আহমদীয়াত গ্রহণ করে, যার মাঝে সর্বপ্রকার বদঅভ্যাস ছিল। মদপান, ব্যাভিচার সবই। সেখানকার রীতি হলো, দারিদ্রের কারণে কিংবা রুজি-রোজগারের অভাবে থাকার জন্য বৃহদায়তন বাসগৃহের

কোন কোন কক্ষ ভাড়া নেয়, তাদের বসবাসের ধরণ এমনই। এই ব্যক্তি এমনই এক পরিবেশে বসবাস করতো। মহিলাদের সাথে তার অবাধ মেলামেশা ছিল। কিন্তু আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর সবাইকে বলে দিল, কোন অপকর্মের জন্য আমার কাছে কেউ আসবে না। তবে এক মহিলা ছিল নাছোড়বান্দা। তাই, সেব্যক্তি যে পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহলো, দূর থেকে তাকে দেখলেই দরজা বন্ধ করে নফল নামায পড়া আরম্ভ করে দিত। কুরআন তিলাওয়াত আরম্ভ করে দিত, এভাবেই সে নিজেকে নিরাপদ রাখে। অতএব, এটাই হলো বিপ্লব, আহমদীয়াত যা নিয়ে এসেছে।

মওলানা বশীর আহমদ কমর সাহেব নামে আমাদের একজন মুবাল্লেগ আছেন। তিনি বর্ণনা করেন, এই অধম আহমদীয়া জামা'ত ঘানার সদস্যদের সাথে একবার ঈদের নামায পড়ার পর 'প্যারামাউন্ট চীফ'-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য যায়। সেই চীফ তার গোত্রের গণ্যমান্য লোকদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন, আমরা সেখানে প্রবেশ করতেই আহমদী বন্ধুরা চীফ ও তার সঙ্গীসাথীদের সামনে অত্যন্ত আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে এমনভাবে তারানা গাইতে আরম্ভ করে যে, একজন বৃদ্ধ আহমদী যে চীফের ঠিক সামনেই দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল, সে-ও উচ্ছাসভরে তারানা গাওয়ার সাথে সাথে নিজের লাঠিটি বাতাসে শুন্যে নাচিয়ে গান গাইছিল। অন্য বন্ধুরা তার সাথে সাথে সেই তারানার পুনারাবৃত্তি করতে শুরু করে, যাদের সংখ্যা হবে প্রায় তিনশ'। অনুবাদককে জিজ্ঞেস করলাম এরা কী বলছে, সে আমাকে জানালো, এরা মহান আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে আর ইসলামের কল্যাণরাজির কথা বলছে। তারা বলছে, 'আমরা মূর্তি-পুজারী ও মুশরিক ছিলাম। হালাল ও হারাম আর পাপপুণ্যের কোন জ্ঞানই ছিল না আমাদের। পশুর ন্যায়ই আমরা জীবনযাপন করতাম, বন্য ছিলাম আমরা আর পানির মতই মদ পান করতাম। আহমদীয়াত আমাদেরকে সহজসরল পথ দেখিয়েছে আর আমাদের অপকর্মগুলো আমাদের থেকে বিদূরিত হয়েছে, মানুষ হয়েছি আমরা'।

এসব মানুষ পরিপূর্ণ আস্থার সাথে নিজেদের শহরের 'প্যারামাউন্ট চীফ' ও অন্যান্য গণ্যমান্যদের সামনে, যারা তাদের স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, নিজেদের পবিত্র পরিবর্তনের কথা নির্বিকচিত্তে অবলীলায় বর্ণনা করে চলছে আর আহমদীয়াতেরই সত্যতার সাক্ষ্য হিসেবে তা উপস্থাপন করছে।" (মাসিক আনসারুল্লাহ্, জানুয়ারি ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ৩০-৩১)

নামাযে নিয়মিত আর তাহাজ্জুদেও গভীর একাগ্রতা আবশ্যকীয়

নিয়মিত পাঁচবেলার নামায পড়া ও তাহাজ্জুদ নামায পড়ার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ভাবে বয়আতের শর্তে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমি লক্ষ্য করছি, আমার বয়আতকারীদের মধ্যে প্রতিনিয়ত সৎকর্ম আর তাকওয়ার মান উন্নত হচ্ছে। মুবাহালার দিনগুলো অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমাদের জামা'তের মধ্যে যেন এক অভাবনীয় নতুন রং ফুটে উঠেছে। অধিকাংশ সময় আমি লক্ষ্য করি, সেজদারত অবস্থায় তারা কাঁদছেন আর তাহাজ্জুদে তারা বিনয়ে বিগলিত হচ্ছেন। অপবিত্র হৃদয়ের লোকেরা তাদেরকে কাফির বলে অথচ তারাই ইসলামের জীবন, ইসলামের প্রাণ।" (জামিমা আনজামে আথম, রূহানী খাজায়েন, ১১তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৫)

এখানে আমি পুনরায় ঘানার একটি উদাহরণ দিচ্ছি, লোকেরা নিজেদের মাঝে এরূপ পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে যা স্বয়ং আমার পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে। দীর্ঘপথ সফর করে এসেছে আর অনেক রাতে পৌঁছেছে। রাত ১২টার দিকে শোবার সুযোগ পেয়েছে। এরপরও রাতে জেগে উঠে দেখি দেড়টা বা দু'টা হবে, অতিথি মসজিদেই আছেন আর সিজদারত অবস্থায় আছেন।

হযরত মুন্সি মুহাম্মদ ইসমাইল (রা.) বর্ণিত এক বর্ণনা রয়েছে, তিনি বলতেন "কেবল একটি নামাযের কথা আমার স্মরণ রয়েছে, যা আমি বাজামা'ত পড়তে পারি নি, (একান্ত অপারগতা ছাড়া), এর কারণ হলো জরুরি কাজে আমাকে মসজিদ থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল"। (আসহাবে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৬)

হযরত মুন্সি মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব (রা.) প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, "হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আত গ্রহণের পর তিনি নিজ শহর শিয়ালকোটে ফেরত যান। লোকেরা লক্ষ্য করলো, তিনি তার পুরনো বদঅভ্যাস অর্থ্যাৎ, তাস খেলা, বাজারে বসে অযথা গালগল্প করা, আড্ডা দেওয়া ইত্যাদি ছেড়ে দিয়েছেন এবং নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তে শুরু করেছেন। তার অবস্থার এই অসাধারণ পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করে সবাই হতবাক"। (আসহাবে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০০)

কাদিয়ানে তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য নামায সযত্নে আদায় করা সম্পর্কে হযরত নবাব মুহাম্মদ আলী খান সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, "কাদিয়ানে সূর্যগ্রহণের

দিনের নামাযে আমি উপস্থিত ছিলাম। মৌলবী মুহাম্মদ আহসান সাহেব আমরোহী নামায পড়িয়েছেন। নামাযে যোগদানকারীরা বেদমভাবে কাঁদছিলেন। রমযানের ঐ দিনগুলোতে অবস্থা এমন ছিল যে, ভোর রাত দু'টো বাজতেই 'বাজার আহমদীচক' সরব হয়ে উঠত। বেশিরভাগ মানুষ গৃহে আর কেউ কেউ মসজিদ মুবারকে উপস্থিত হতো যেখানে তাহাজ্জুদ নামায পড়া হতো। এরপর সেহরী খাওয়া হতো আর ফজরের নামায পড়া হতো ওয়াক্তের প্রথমভাগে। এমনি ভাবে নামায আদায় করা হতো। এরপর কিছু সময় ধরে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা হতো আর প্রায় ৮টার দিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ভ্রমণের জন্য বেরিয়ে পড়তেন। সেবকেরা সবাই সাথে থাকতেন। ১১/১২টার দিকে এই ভ্রমণ শেষ হতো। এরপর যোহরের আযান হতো আর ১টা বাজার আগেই যোহরের নামায শেষ হয়ে যেতো। এরপর আসরের নামাযও নির্ধারিত সময়ের প্রথম ভাগেই পড়া হতো। এভাবে আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্রাম গ্রহণের অবকাশ লাভ হতো। মাগরিবের নামাযের পর খাওয়াদাওয়া শেষ করে রাত ৮/৮.৩০টায় ইশার নামায শেষ হয়ে যেতো। আর পরিবেশ পরিস্থিতি এমন নীরব ও শুন-শান হয়ে যেতো, যেন এখানে কোন জনবসতিই নেই, তবে রাত দু'টো বাজতেই সবাই সজাগ হয়ে যেতো আর প্রাণ-চাঞ্চল্য ফিরে আসতো''। (আসহাবে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৭)

নবাব মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) একটি ঘটনা লিখেছেন, তিনি (রা.) নামায-প্রেমিক ছিলেন। বিশেষ করে বাজামা'ত নামায প্রতিষ্ঠিত রাখার ক্ষেত্রে তাঁর (রা.) উচ্ছাস-উদ্দীপনা আর সাধ্যসাধনা ছিল স্বতন্ত্রধারায় বৈশিষ্টমণ্ডিত। পাঁচবেলার নামায মসজিদে গিয়ে বাজামাত পড়ার বিষয়ে তিনি খুবই যত্নবান ছিলেন। যখন তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন, তখনও আযানের ধ্বনি তিনি সেই ভালোবাসাপূর্ণ আবেগ নিয়েই শুনতেন যেমনটি প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের ডাক শোনার জন্য কান পেতে রাখে। এরপর আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব যখন কিছুটা চলাফেরার শক্তি লাভ করেন তখন মাঝে মধ্যেই তিনি তাঁর ঘরের ছেলেদের মধ্য থেকে কাউকে ধরে বাজামা'ত নামায পড়ানোর জন্য ইমামের জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিতেন আর এভাবে জামা'তবদ্ধ হয়ে নামায পড়ার পিপাসা নিবারণ করতেন। রতনবাগের নির্ধারিত নামায ঘরের পাশে নিজের চেয়ার টেনে নিয়ে তিনি বাজামা'ত নামাযে অংশগ্রহণ করতেন। মডেল টাউনে কুঠি ক্রয় করার পর সেখানেই তিনি বাজামা'ত পাঁচবেলার নামাযের

ব্যবস্থা করে নিজের ঘরকেই যেন মসজিদে রূপান্তরিত করে নিলেন। সেখানে তিনি পাঁচবেলা আযান দেয়ার ব্যবস্থা করিয়েছেন। আবহাওয়া অনুসারে কখনও বাড়ির আঙ্গিনায় অথবা কক্ষের ভেতরে নামাযের পাটি বিছিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতেন আবার কখনও মসজিদে বসে এক ওয়াক্ত নামায পড়ার পর পরবর্তী ওয়াক্তের নামাযের জন্য অপেক্ষারত থাকতেন। বিভিন্ন ধরণের লোকদের নিজ আবাসগৃহে পাঁচওয়াক্ত নামায পড়ার জন্য আসাযাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়াটা সাধারণ কোন পুণ্য নয়। বিশেষ করে যখন গৃহস্বামীর জীবনযাত্রার মান থাকে অনেক উন্নত এবং তার সামাজিক যোগাযোগের পরিধিও থাকে ব্যাপক, এমন পরিস্থিতিতে তার এই পুণ্যের মূল্যমান আরো অনেক গুণই বেড়ে যায়। (আসহাবে আহমদ, ১২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫২-১৫৩)

সযত্নে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শেখ হামেদ আলী সাহেব (রা.)-এর নিষ্ঠা সম্পর্কে বলেন, শেখ হামেদ আলী (আমি তাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র জন্যই ভালবাসি)! এক ধার্মিক পরিবারের ধর্মভীরু যুবক। ৭/৮ বছর ধরে আমার সেবায় নিয়োজিত আছে। আমি নিশ্চিত জানি, আমার প্রতি তার নিষ্ঠামাখা গভীর অনুরাগ রয়েছে। যদিও তাকওয়ার সূক্ষ্মতাকে রপ্ত করা গভীর তত্ত্বজ্ঞানী এবং পুণ্যবানদের কাজ, তবুও যতটা সে বুঝে মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের অনুসরণ ও তাকওয়ার বিষয়ে যত্নবানই বটে। আমি তাকে দেখেছি, কঠিন রোগে আক্রান্ত যা মরণব্যাধিই মনে হতো, এত শীর্ণকায় ও দুর্বল হয়ে পড়ে যে, দেখে মনে হত যেন জিন্দা এক লাশ, তখনও সে একনিষ্ঠভাবে পাঁচবেলার নামায নিয়মিত পড়ত। পাঁচ বেলার নামায পড়ার ক্ষেত্রে সে এরূপ আন্তরিক উদ্দীপনা রাখত যে, সেই নাজুক পরিস্থিতি ও প্রায়-বেহু'শ অবস্থায়ও যেমন করেই হোক নামায পড়েই নিত। আমি জানি, মানুষের খোদাভীরুতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে নামায পড়ার ক্ষেত্রে তার মনোযোগিতা কতটুকু, তা পর্যবেক্ষণ করাই যথেষ্ট। আর আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে পুরো মনোযোগের সাথে নামায আদায় করে, ভয়ভীতি, রোগ-ব্যাধি, অসুখ-বিসুখ আর বিপদ-আপদ যাকে নামায থেকে বিরত রাখতে পারে না, সে অবশ্যই খোদা তা'লার প্রতি সত্যিকার ঈমান পোষণকারী। তবে এরূপ ঈমান গরীবদের দেয়া হয়েছে। এই নিয়ামত লাভকারীদের সংখ্যা বিত্তশালীদের মধ্যে অতি অল্পই হয়ে থাকে"। (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪০)

"বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর আদেশ অনুযায়ী পাঁচবেলা নামায

আদায়ে রত থাকবো।”– এ প্রসঙ্গে হযরত মির্যা আইয়ুব বেগ সাহেব (রা.)-এর ব্যবহারিক নমুনা কেমন ছিল তা বর্ণনা করেছেন, একজন পূণ্যবান ব্যক্তি মৌলভী ফযলে ইলাহী (রা.)। মির্যা আইয়ুব বেগের প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বড়ই ভালোবাসা ছিল। আমি মির্যা আইয়ুব বেগ সাহেবের গৃহে একদিন মাগরিবের নামায পড়েছিলাম। হযরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.)ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মির্যা আইয়ুব বেগ সাহেবের নামায **‘আসসালাতু মে’রাজুল মু’মিনীন’** (অর্থাৎ, নামায মু’মিনের মি’রাজ)-এর বৈশিষ্ট্যে শোভামন্ডিত ছিল। তিনি নামায আদায় কালে জাগতিক ধ্যান-ধারণার প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন থাকতেন এবং তার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পরতো। সেদিন তিনি অসাধারণভাবে নামায দীর্ঘ করেন। নামাযের পর সবার বসা থাকা অবস্থায় মির্যা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আজকের নামায তো আপনি অনেক লম্বা করে পড়ালেন, এর কারণ কী? প্রথমে তো তিনি কিছুই বলতে চাচ্ছিলেন না, তবে অনুরোধ-উপরোধের পর বললেন, “আমি যখন দরূদ পাঠে রত ছিলাম, আমার ‘কাশ্‌ফ’ (দিব্যদর্শন লাভ) হয়, আমি দেখলাম মহানবী (সা.) রেলওয়ের এক প্ল্যাটফর্মে পায়চারী করছেন এবং আল্লাহ্ তা’লার কাছে দোয়া করছেন। মির্যা সাহেব সেই আরবী দোয়া এবং এর অনুবাদও বললেন, এর ভাবার্থ যা দাঁড়ায় তা হল– হে খোদা! আমার উম্মতকে পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা কর আর তাদের তরী তটে ভিড়িয়ে দাও, আমি সেই দোয়ার সাথে সাথে ‘আমীন’ বলছিলাম। পরবর্তীতে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখি, তিনিও দোয়া যাচনা করছিলেন, হে খোদা! মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দোয়াগুলো গ্রহণ কর আর তাঁর উম্মতকে লাঞ্ছিত হওয়া থেকে রক্ষা করো। অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দোয়া শেষ করলে আমিও নামাযের সমাপ্তি টানলাম”। (আসহাবে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৪-১৯৫)

এই হলো আধ্যাত্মিক বিপ্লব, জাগ্রত অবস্থাতেও মহানবী (সা.)-এর দর্শন লাভ হয়ে থাকে। হযরত ডাক্তার মির্যা ইয়াকুব বেগ সাহেব (রা.) এবং হযরত মির্যা আইয়ুব বেগ সাহেবদ্বয়ের প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রভাব কেমন আর কতটা গভীর ছিলো সে প্রসঙ্গে এক বর্ণনায় রয়েছে বরং তারা নিজেরাই বলেন, আমাদের পিতা তার এক বন্ধুকে বলেছেন, “আমার এই দুই পুত্র ১৮৯২ ও ১৮৯৩-এ গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে আমার কাছে, মুলতান জেলার ‘কাকড়-হাটে’ নিজ বাড়ীতে আসে। আমি তাদের মাঝে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ্য করি, যা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই আর বিস্ময়ের সাথে দোয়া করি– হে খোদা! তুমি তাদেরকে কি এমন উপকরণ দান করেছো, যার

জন্য তাদের অন্তরে এরূপ অসাধারণ পরিবর্তন ঘটেছে যে, তারা "নূরুন আলা নূর" হয়ে গেছে। এরা সকল নামাযই পড়ে আর সঠিক সময়ে অত্যন্ত আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে, একনিষ্ঠ প্রেমানুরাগের সাথে এবং আন্তরিকতাপূর্ণ চেতনা নিয়ে এতটা আকুতি-মিনতির সাথে পড়ে যে, তাদের প্রাণবায়ুই বুঝি বেরিয়ে যায়। অধিকাংশ সময়ই তাদেরকে অশ্রুসজল অবস্থায় দেখতে পাই আর তাদের চেহারাতেও আল্লাহ্‌র ভয়ের চিহ্ন দৃশ্যমান। ঐকালে এই দুই সন্তানের বয়সও ছিল খুবই কম, সবেমাত্র দাঁড়ি গজাচ্ছিল, উঠতি বয়সে তাদের ঐ অবস্থা দেখে আমি কৃতজ্ঞতা ভরে সেজদারত থাকায় কখনও ক্লান্ত হতাম না। কেননা, নবযৌবনে উপনীত হওয়াকালে, তাদের আধ্যাত্মিক দুর্বলতার আশঙ্কার যে বোঝা আমার অন্তরে ছিল, তা উবে গেছে।

পিতা মহোদয়, তার সেই বন্ধুকে বলেন, তাদের এই উঁচু মানের পবিত্র পরিবর্তনের রহস্য আমার কাছে উন্মোচিত হয় নি যে, এত ছোট বয়সে তাদের এই আশিস ও আধ্যাত্মিকতার কল্যাণধারা কোথা থেকে লাভ হলো! কিছুকাল পর এটা জানতে পারলাম যে, তাদের এই পবিত্র সুধা হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করা থেকে অর্জিত হয়েছে। অতএব, পিতা মহোদয়ের হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের পরিবর্তনটারই মূখ্য ভূমিকা ছিল (অর্থাৎ, সন্তানদের পবিত্র পরিবর্তন দেখে পিতা আহমদী হয়েছিলেন), যা তাকে হযরত আকদাস (আ.)-এর পাকপবিত্র অন্তঃকরণের বিষয়ে ধারণা লাভের উত্তম সুযোগ এনে দিয়েছে। (আসহাবে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৬)

হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব (রা.)-এর পিতা হযরত চৌধুরী নাসরুল্লাহ্ খান সাহেব (রা.)-এর একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাঁর এক পুত্র বলেন,

আমার পিতা (অর্থাৎ, হযরত চৌধুরী নাসরুল্লাহ্ খান সাহেব) পরম নিয়ম-নিষ্ঠা এবং গভীর যত্ন ও একাগ্রতার সাথে নামায পড়তেন আবার তাহাজ্জুদের প্রতিও গভীর আকর্ষণ রাখতেন। আমার প্রকৃতিতে শৈশব থেকেই আমার পিতার গভীর প্রভাব ছিল। আমি কল্পনার চোখে প্রায়শই তাঁকে নামায পড়তে কিংবা পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখি। বয়আত গ্রহণের পর কবুতর ওয়ালী মসজিদে তিনি ফজরের নামায নিয়মিতভাবে জামা'তের সাথে পড়তেন। মসজিদ আমাদের বাড়ি থেকে দূরে হওয়ায় বাবা আধারকালেই গৃহ থেকে রওয়ানা হয়ে যেতেন"। (আসহাবে আহমদ, ১১তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৩)

এরপর, নিষ্ঠার সাথে যথাসময়ে নিয়মিতভাবে নামায পড়া সম্পর্কে হযরত বাবু ফকির আলী সাহেব (রা.)-এর একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি। "তিনি ছিলেন, '*দিল বাহ্ ইয়ার দস্ত বাহ্ কার*' (অর্থাৎ, অন্তর প্রেমাস্পদের ভালোবাসায় বিভোর আর হস্ত কর্মে নিয়োজিত)-এর ব্যবহারিক প্রতিচ্ছবি। এম. বশীর আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন, সে যুগে ইংরেজদের দাপট ছিল খুবই বেশি। ইংরেজ কর্মকর্তা তাকে উদ্দেশ্য করে বলতো, মৌলভী সাহেব! সবসময় নামায পড়তে থাকেন, কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসবেন। তার এরূপ কথায় তিনি খুবই অস্বস্তিতে ছিলেন। একদিন তিনি (অফিসের) দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে তার সন্নিকটে দাঁড়িয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলতে আরম্ভ করলে ইংরেজ অফিসার এতে ভয় পেয়ে যায় যে, কোথাও না তার ওপর হামলা করে বসে। এমতাবস্থায় তিনি তাকে আশ্বস্ত করেন যে, আমার এমন কোন দুরভিসন্ধি নেই, আমি পৃথকভাবে একান্তে কিছু কথা বলতে চাই। আর তা হলো– আপনি অফিস পায়খানা-প্রস্রাবের জন্য সময় নষ্ট করেন, অনুরূপভাবে চা ও ধুমপানেও সময় নষ্ট করেন, তবুও আমার বেলায় আপত্তি কেন? উত্তরে সে বলতে আরম্ভ করে যে, এসব তো প্রকৃতির ডাক। তিনি বলেন, আমি আপনার অধস্তন, আমি আপনার আনুগত্য করব, তবে সেসব নির্দেশই পালন করব যা দায়িত্বের সাথে সম্পর্ক রাখে। অন্যান্য ব্যাপারে আপনার নির্দেশের আনুগত্য করা আমার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তাই আপনার কথায় আমি নামায ছাড়তে পারি না। আমার অবজ্ঞার কারণে কিংবা অবহেলায় দুর্ঘটনা ঘটলে বা রেলগাড়ি বিলম্বের মুখে পড়লে আপনি আমার সাথে কঠোর হতে পারেন। একথা বলেই তিনি দরজা-জানালা খুলে দিলেন। সেই কর্মকর্তা তাঁর এই আলোচনায় খুবই বিস্মিত হয়।... এই আলোচনা তার ওপর এমন গভীর প্রভাব ফেলে যে, এরপর থেকে ওযু করার জন্য তিনি পানির বদনায় হাত দিতেই সেই রেলকর্মকর্তা বলতো, মৌলভী সাহেব! আপনি নিশ্চিন্ত মনে আপনার নামায আদায় করুন, আমি আপনার কাজের প্রতি খেয়াল রাখব। একদিন তাঁর শুষ্ক ও অতি সাধারণ খাবার খাওয়া দেখতে পেয়ে, সে যারপর নাই বিস্মিত হয় আর ভাবে তাঁর জীবনযাপন এতটাই সাদাসিধা অবস্থা তাঁর।" (আসহাবে আহমদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১)

এখানে এই ইংল্যাণ্ডেও আমাদের একজন প্রবীণ আহমদী বেলাল নাট্টাল সাহেব যখন আহমদীয়াত গ্রহণ করেন, নিজের জন্য 'বেলাল' নামটি তিনি বেছে নেন আর হযরত বেলাল (রা.)-এর অনুকরণে তিনি নামাযের উদ্দেশ্যে

আহ্বান করার অর্থাৎ, আযান দেয়ার ক্ষেত্রে এক বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। সত্যিই নামাযের জন্য ডাকার গভীর আগ্রহ ও অনুরাগ তার ছিল। (মাসিক আনসারুল্লাহ্, জুন ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ৩৬)

প্রবৃত্তির উত্তেজনা দমন কর

আর একটি শর্ত হলো **প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে দমন করা**। এতে শিক্ষনীয় কী রয়েছে? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি উত্তম নৈতিক গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। হিন্দুদের সাথে এক আলোচনা অনুষ্ঠান ছিল, মতবিরোধের কারণে ঝগড়া বাঁধে, এতে জামা'ত আত্মসংবরণের উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। তিনি (আ.) বলেন, "পবিত্র প্রকৃতির মুসলমানরা যদি সভ্যতা-ভব্যতার দাবি মেনে না চলত আর কুরআনের শিক্ষার দাবি অনুসারে ধৈর্যশীল না হতো এবং ক্রোধ সংবরণ না করত, তাহলে এসব দুরভিসন্ধিবাজরা এমন এমন উস্কানীমূলক আচরণ করেছে যে, সে সভাস্থল রক্তে রঞ্জিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সহস্র সাধুবাদের যোগ্য আমাদের জামা'ত, যারা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অতি উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করেছে আর আর্যদের সেসব কটুক্তি যা ছিল বুলেটের চেয়েও মারাত্মক, তা শুনেও ধৈর্য ধারন করে সম্পূর্ণরূপে নীরব থাকে।

তিনি (আ.) আরও বলেন, আমার জামা'তের জন্য আমার পক্ষ থেকে যদি ধৈর্য ধারণের নসীহত না থাকতো আর পূর্ব থেকেই নিজের এই জামাতকে যদি এভাবে প্রস্তুত না করতাম যে, তারা যেন সর্বাবস্থায় কটুক্তি ও অপলাপের প্রত্যুত্তরে ধৈর্য ধারণ করে, তাহলে এই ময়দান রক্তে রঞ্জিত হয়ে যেতো। কিন্তু, এটা ছিল ধৈর্য ধারণের সেই শিক্ষা যা তাদের ক্রোধ ও উত্তেজনাকে প্রশমিত করেছে। (চশমায়ে মা'রেফাত, রূহানী খাযায়েন, ২৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০)

ক্রোধ দমনের আরেকটি উদাহরণ হযরত সৈয়দ আব্দুস সাত্তার শাহ্ সাহেবের সাথে সম্পর্ক রাখে। আশ্চর্যজনক এক আদর্শ। বর্ণিত আছে, "একদিন হযরত শাহ্ সাহেব নামায পড়ার জন্য নিকটস্থ মসজিদে যান। সে সময় আহমদীয়াতের এক ঘোর বিরোধী চৌধুরী রহিম বক্স ওযু করার জন্য মাটির বদনা হাতে নিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিল। হযরত ডাক্তার সাহেবকে দেখতেই (ডাক্তার সাহেব সরকারী ডাক্তার ছিলেন, সরকারী হাসপাতালে তিনি কর্তব্যরত ছিলেন) ধর্মীয় আলোচনা শুরু করে দেয়। হযরত ডাক্তার সাহেবের কোন কথায় চৌধুরী রহিম বক্স প্রচণ্ড রাগান্বিত হয়ে মাটির বদনা তার মাথায়

ছুড়ে মারে। বদনা মাথায় লাগতেই ভেঙ্গে যায় আর মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। ডাক্তার সাহেবের কাপড় রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। তিনি ক্ষতস্থান হাত দিয়ে চেপে ধরেন আর ব্যান্ডেজ করানোর জন্য দ্রুত হাসপাতালের দিকে ছুটে যান। তার চলে যাওয়ার পর রহীম বক্স অত্যন্ত ঘাবড়ে গেলেন যে, এখন কী হবে! তিনি তো সরকারী ডাক্তার। সরকারী কর্মকর্তাও তারই কথা গ্রহণ করবে। এখন আমার বাঁচার কোন উপায় নেই। আমি এখন কোথায় যাই আর কী করি? এই ভেবে সে অস্থির হয়ে ভীতত্রস্ত অবস্থায় মসজিদেই পড়ে থাকে। ওদিকে ডাক্তার সাহেব হাসপাতালে গিয়ে মাথার ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে এবং রক্তাক্ত কাপড়চোপড় পাল্টে আবার নামাযের জন্য সেই মসজিদেই আসেন। ডাক্তার সৈয়দ আব্দুস সাত্তার শাহ্ সাহেব পুনর্বার মসজিদে প্রবেশ করলে সেখানে চৌধুরী রহিম বক্স সাহেবকে দেখতে পান, আর তাকে দেখা মাত্রই তিনি মৃদু হাসেন আর মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করেন 'চৌধুরী রহীম বক্স সাহেব! এখন আপনার রাগ ঠান্ডা হয়েছে কি?'

একথা শোনামাত্রই চৌধুরী রহীম বক্স এর অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তৎক্ষণাৎ করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থী হন আর বলতে থাকেন, শাহ্ সাহেব! আমার পক্ষে বয়আতের পত্র লিখে দিন। ধৈর্যের এই মহান দৃষ্টান্ত আর কোমলতা ও মার্জনার ব্যবহার, ঐশী জামা'তের সদস্যদের ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকেই প্রকাশ পেতে পারে না। সুতরাং চৌধুরী সাহেব আহমদী হয়ে গেলেন আর কিছুকাল পর তার অন্যান্য সঙ্গীসাথীরাও আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। (সীরাত হযরত ডাক্তার আব্দুস সাত্তার শাহ্ সাহেব, পৃষ্ঠা ৬৩, প্রকাশক: মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া পাকিস্তান)

এই হচ্ছে কয়েকটি দৃষ্টান্ত যা আমি উপস্থাপন করলাম। এগুলো বয়আতের প্রথম দিকের তৃতীয় বা চতুর্থ শর্তের সাথে সম্পর্ক রাখে। বয়আত গ্রহণ করার পর লোকদের মাঝে কীরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা স্পষ্ট করার জন্য পরবর্তীতে আরো কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরার চেষ্টা করব যেন নবাগত ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানতে পারে এবং তারাও নিজেদের মাঝে অনুরূপ পবিত্র পরিবর্তন সাধন করতে পারে আর তাদের ওপর কখনও যেন দাজ্জালের প্রভাব না পড়ে।

২

[লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমুআর খুতবা, ১০ অক্টোবর, ২০০৩]

গত জুমুআর পূর্বের জুমুআয় প্রদত্ত খুতবায় আমি হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তে বয়আতের সেই দশটি শর্ত মেনে চলার অঙ্গীকার নিয়ে প্রবেশের পর আহমদীদের মধ্যে কি অসাধারণ পরিবর্তন এসেছে সে সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনাও উপস্থাপন করেছিলাম। এখন একই বিষয়বস্তু আরো সম্প্রসারিত করছি।

সুখ-দুঃখ বা কাঠিন্য-স্বাচ্ছন্দ্য সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বস্ত থেকো

পঞ্চম শর্তে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এই অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, "সুখে-দুঃখে কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এক কথায় পরিস্থিতি যাই হোক না কেন কখনও খোদার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে না। অবশ্য তাঁর কৃপা ভিক্ষায় রত থাকবে, তবে এই প্রতিশ্রুতি সাপেক্ষে যে সর্বাবস্থায় তাঁর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকবে।"– এর কয়েকটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি:

সর্বপ্রথম থাকছে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত। ১৯০৫ সনের আগষ্ট মাসে তাঁর (রা.) পুত্র সাহেবযাদা আব্দুল কাইয়ূম হাম জ্বরে কয়েক দিন আক্রান্ত থেকে মৃত্যু বরণ করে। সেই সময়ে তার বয়স ছিল মাত্র দু'বছর। হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন তাহলো– তিনি মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের অনুকরণে শিশু বাচ্চাটিকে চুমু খান এরপর তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় আর তিনি বলেন, "আমি শিশুসন্তানের মুখ দেখতে এ কারণে খুলি নাই যে, আমার মধ্যে কোন অস্থিরতা ছিল বরং প্রকৃত কারণ হলো, মহানবী (সা.)-এর পুত্র ইব্রাহিম যখন মারা যান মহানবী (সা.) তখন তার কপালে চুমু খেয়েছিলেন আর তাঁরও অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল এবং তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা করেছেন আর বলেছেন, বিচ্ছিন্নতা তো স্বল্পকালের জন্যও পছন্দ হয় না তথাপি আমরা খোদা

তা'লার অনুগ্রহে সন্তুষ্ট। সেই একই সুন্নত পালন করার জন্য আমিও তার মুখের কাপড় খুলেছি আর চুমু দিয়েছি। এটা খোদা তা'লারই অনুগ্রহ আর আনন্দের বিষয় হল, তিনি আমাকে মহানবী (সা.)-এর একটি সুন্নত পালনের সুযোগ দান করেছেন।

এটি অবশ্য সেই মহান ব্যক্তির ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত যার সম্পর্কে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন,

'চে খুশ বূদে আগার হার ইয়াক যে উম্মত নূরে দীঁ বূদে
হামি বুদে আগার হার দিল পুর আয নূরে ইয়াকিন বুদে'

অর্থাৎ কতইনা ভালো হতো উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নূরউদ্দীন হয়ে যেতো। তবে এটা কেবল তখনই সম্ভব যদি প্রতিটি অন্তর দৃঢ়বিশ্বাসের জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

আরেকটি দৃষ্টান্ত মুকাররম হযরত চৌধুরী নাসরুল্লাহ খান সাহেবের সাথে সম্পর্ক রাখে। চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব (রা.) বলেন, "আমাদের এক ছোট ভাই স্নেহের চৌধুরী শুকরুল্লাহ খান সাহেব (রা.) যে স্নেহের মরহুম চৌধুরী আব্দুল্লাহ্ খান সাহেবের বড় ছিল, যার নাম ছিল হামিদুল্লাহ খান। ৮/৯ বছর বয়সে কয়েকদিন রোগে ভুগে মারা যায়, ফজরের সময় তার মৃত্যু হয়। বাবা সারা রাত তার সেবা-শুশ্রূশায় নিয়োজিত ছিলেন। তার মৃত্যুর পর, বাবা তার জানাযা, দাফন-কাফন ইত্যাদি সম্পন্ন করে আদালত খোলার পর যথারীতি নিজের কর্মস্থলে বা আদালতে যোগদান করেন। মক্কেলদের মধ্যেও কেউ বুঝতে পারে নি আর আদালতের কোন কর্মকর্তা বা তার সহকর্মীদের মাঝেও কেউ আঁচ করতে পারে নি যে, তিনি তার হৃদয়ের এক টুকরোকে সমাহিত করে মনিবের সন্তুষ্টিতেই সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ থেকে দায়িত্ব পালনের জন্য যথারীতি কোমর বেঁধে উপস্থিত হয়েছেন।" (আসহাবে আহমদ, ১১তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৫-১৬৬)

হযরত কাজী জিয়া উদ্দিন সাহেব (রা.) লিপিবদ্ধ করেছেন, (তার স্ত্রী আর তিন সন্তানের ইন্তেকাল হয়) বিরুদ্ধবাদীদের হই-হট্টগোল ছিল চরমে। সম্মানহানী করার আর অর্থসম্পদের ক্ষতি করার কোন প্রচেষ্টাই তারা হাতছাড়া করে নি। বাসস্থানে সিঁদ কাটার মামলাও করা হয়। যাবতীয় সমস্যা একসাথে সামনে রাখলে খুব ভালভাবেই বুঝা যেতে পারে যে, এই অধম লেখকের অন্তরাত্মা কত ভয়াবহ ব্যথা-বেদনায় জর্জরিত ছিল। এ সবই ছিল ঐশী বিপদাবলী ও

সঙ্কটের প্রকাশ, যে সম্পর্কে হুযূর (আ.) আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছিলেন। এই সঙ্কটকালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ কৃপা ও ভালোবাসার টানে শান্তনামূলক একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন। সেই পত্রও এক ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত ছিল যা পূর্ণ হয়েছে আর এখনও পূর্ণতা লাভ করে চলছে। হুযূর (আ.) লিখেছিলেন, সত্যিকার অর্থেই আপনার ওপর কঠিন পরীক্ষা আপতিত হয়েছে। এটি আল্লাহ্ তা'লার রীতি, উদ্দেশ্য হলো, তাঁর অবিচল বান্দাদের ঈমানের দৃঢ়তা লোকদের নিকট প্রকাশ করে দেয়া আর সেই সাথে ধৈর্য ধারণের প্রতিদানে বড় বড় পুরস্কারে ভূষিত করা। আল্লাহ্ তা'লা এই যাবতীয় সঙ্কট থেকে পরিপূর্ণ মুক্তি দেবেন। শত্রুরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে যেমনটা হয়েছিল সাহাবীদের (রা.) যুগে, খোদা তা'লা তাঁদের (সাহাবীদের) 'ডুবন্ত তরী' তীরে ভিড়িয়েছেন। এ ক্ষেত্রেও তেমনটাই ঘটবে। তাদের অভিশাপ তাদের বিরুদ্ধেই বর্তাবে। অশুভ পরিনাম শেষ পর্যন্ত তাদের ওপরই বর্তাবে।

আলহামদুলিল্লাহ্! শত শত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, হুযূর (আ.)-এর দোয়াতে এমনটাই হয়েছে। এই অধম সর্বাবস্থায় অবিচলতা ও ধৈর্যে সব সময় সম্মুখ পানেই এগিয়েছে। (আসহাবে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২-১৩)

হযরত মৌলভী বুরহানুদ্দীন সাহেব (রা.)-এর অনুপম এক দৃষ্টান্ত

প্রাথমিক যুগে শিয়ালকোটে অবস্থান কালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার ভাষণ দেয়ার জন্য একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাচ্ছিলেন আর অন্যান্য সদস্যগণও হুযূরের সাথে ছিলেন। গলি পথে হেঁটে যাওয়ার সময় উপর থেকে কেউ দুষ্টামী করে টুকরিপূর্ণ এক গাদা ছাই ছুড়ে ফেলে। হুযূর (আ.) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এ থেকে বেঁচে যান। কেননা, তিনি রাস্তা পার হয়ে গিয়েছিলেন। তবে টুকরির ময়লা গিয়ে পরে শ্রদ্ধেয় পিতার মাথার ওপর (এই বিবরণ তার পুত্র দিচ্ছেন)। এরপর কি হলো? তিনি তো এক বৃদ্ধ মানুষ, সাদা শ্মশ্রুমণ্ডিত, মানুষের জন্য এটা এক তামাশায় পরিণত হলো। যেহেতু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তার প্রেমিকসুলভ ভালোবাসা ছিল। অতএব, এরপর কী ঘটলো দেখুন! সে স্থানেই তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন আর একটি বিশেষ ভাবাবেগপূর্ণ অবস্থা তাকে আচ্ছাদিত করে ফেলে এবং একান্ত উৎফুল্লতার সাথে বলেন, **"পা মাইয়ে পা, পা মাইয়ে পা"**। অর্থাৎ, নিজের দিকে দৃষ্টি

আকর্ষণ করে বলতে থাকেন, এখানে ঢালো! এইখানে ফেলো। তিনি বলতেন, আমি খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরই কল্যাণে আমি এই পুরস্কার পেয়েছি।

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা রয়েছে। হযরত সাহেব (আ.) যখন শিয়ালকোট থেকে ফেরত আসেন, সেবকেরা তাঁকে (আ.) গাড়িতে তুলে দেয়ার পর নিজেদের বাড়ি ফিরছিলেন। কোন কারণে তিনি (বর্ণনাকারীর বাবা) পিছনে একা রয়ে গেলেন, বিরুদ্ধবাদীরা তাকে ধরে ফেলে আর তার সাথে অত্যন্ত অসম্মানজনক ব্যবহার করে। এমনকী তাঁর মুখে গোবর পুরে দিল। পিতাজী এই লাঞ্ছনার মাঝে আর দুঃখে সুখ-বোধ করতেন আর বার বার বলতেন **"বুরহানেয়া এ নে'মাতা কিথ্থোঁ"** অর্থাৎ, হে বুরহানুদ্দিন! এই পুরস্কার (তুই) কোথায় পাবি! অর্থাৎ, ধর্মের কারণে প্রদত্ত দুঃখ, দুঃখই নয় এটা তো সৌভাগ্যজনক প্রাপ্তি। (মাসিক আনসারুল্লাহ, রাবওয়া, সেপ্টেম্বর ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ১৪-১৫)

হযরত মৌলভী বুরহানুদ্দিন সাহেব (রা.) সম্পর্কে হযরত মৌলভী আব্দুল মুগনী সাহেব (অর্থাৎ, তার পুত্র) লিখেছেন, "আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর আর্থিক অবস্থা এত শোচনীয় ছিলো যে, অভাব-ক্লিষ্টতার ঐ দিনগুলোতে আমরা গৃহবাসীরা মাসের পর মাস কখনই 'ঘি'-এর চেহারাও দেখতাম না। জ্বালানি কেনার পরিবর্তে শিশম (উন্নত কাঠ rosewood) বৃক্ষের ঝড়ে পড়া শুকনো পাতা চুলায় জ্বালানো হত। কিন্তু শুকনো পাতায় জ্বালানো উনুনে খাবার রান্না হতো না। এ জন্য প্রথমে ডাল ভেজে নেয়া হতো এরপর সেগুলো পিষে নিয়ে হাড়িতে পানি, লবন, মরিচ মিশিয়ে তা চুলায় চাপিয়ে নীচে পাতা জ্বালিয়ে দেয়া হতো। পানি ফুটতে শুরু করলে ভাজা ও পিষা শৈস্যদানা এতে ঢেলে দেয়া হত, এটাই ছিল আমাদের তরকারী যা দিয়ে আমরা রুটি খেতাম।

সাধারণত জোয়ার, বাজরা ও গমের রুটি খেতাম, কখনও-সখনো অর্থাৎ মাঝে-মধ্যে ঘি এর পরিবর্তে তিলের তেল ব্যবহার করা হতো। শাক-এর পরিবর্তে গাছের কচি কুঁড়ি রান্না করে খাওয়া হতো। জমকালো পোশাক ছিল ভূস্বামীদের, মৌলভীদের জন্য নয়। বলা হয়ে থাকে, হুযূর (আ.)-এর সান্নিধ্যে এসে প্রকৃতপক্ষেই বাবার মাঝে এক অসাধারণ প্রেম-ভালোবাসা আর আগ্রহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, আর সেই প্রেমানুরাগ আর আত্মবিলীনতার কারণে তার (পিতার) নিজের আরাম-আয়েশ আর খোরাকের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ ছিল না। ধ্যান ছিল একটাই, প্রেমের যে আগুন তার অভ্যন্তরে ছিল,

সেই ঐশী প্রেম রসূল (সা.)-এর ভালোবাসা আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেমানুরাগের আগুন মানুষের অন্তরে জ্বালিয়ে দেয়ার ধ্যান। সর্বদাই এই চিন্তা-ভাবনা এই উদ্দীপনা, এই প্রেম আর এই উৎকণ্ঠা, আর এই প্রচেষ্টা ছিল– 'আহমদীয়াতের বিস্তার কীভাবে ঘটানো যায়'। না খাদ্যের, না পানীয়ের আর না কাপড়চোপড়ের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ ছিল। আমি এবং আমার মা, তখন কীভাবে যে দিনাতিপাত করেছি আল্লাহ্ তা'লাই তা ভালো জানেন। এতো অভাব-অনটন ও দৈন্যতা সত্ত্বেও আত্মমর্যাদা, ধৈর্য ও দৃঢ়তার এক পাহাড় ছিলেন। আর ধর্মীয় বিষয়াদিতে এমন আত্ম-গুণাভিমানী যে, কোন লোভ-লালসা বা কোন ধরণের বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার এমন কোন সম্পর্ক মাঝখানে বাদ সাধতে পারে নাই, আলহামদুলিল্লাহ্, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ্! সব প্রশংসা আল্লাহ্র, আবারও প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লারই। আর আমরাও এমন পরিবেশে বেড়ে উঠেছি যে, ইহজগত ও এর সবকিছু আমাদের দৃষ্টিতে সবটাই তুচ্ছ্য। আর জগতের প্রতি এই ঔদাসীন্য দেখে শেষ পর্যন্ত লোকেরা বলা শুরু করে দেয় যে, মির্যা সাহেব (আ.) মৌলভী সাহেবকে মাসিক ভাতা দেন"। (মাসিক আনসারুল্লাহ্, রাবওয়া, সেপ্টেম্বর ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ১১-১২)

ধৈর্যের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত

উম্মুল মু'মিনীন হযরত নূসরত জাঁহা বেগম (রা.)-এর ধৈর্যের দৃষ্টান্ত এমনই, যার তুলনা পাওয়া ভার। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনের অন্তিম মুহূর্তে হযরত উম্মুল মু'মিনীন (রা.) দুনিয়াদার নারীদের ন্যায় অযথা কান্নাকাটি করে এবং অধৈর্যপূর্ণ কথাবার্তা উচ্চারণ করার পরিবর্তে কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সমীপে সেজদাপ্রণত হয়ে অত্যন্ত বিগলিত চিত্তে ও বিনয়ের সাথে দোয়া যাচনা করার পুণ্যময় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন। শেষ সময়ে যখন সূরা ইয়াসিন পাঠ করা হয় আর হুযূর (আ.)-এর পবিত্র আত্মা উত্থিত হয়ে নিজ পবিত্রতম প্রকৃত প্রেমাস্পদ সত্তার সমীপে উপস্থিত হয়ে যায় তখন হযরত উম্মুল মু'মিনীন *'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন'* পাঠ করে নিশ্চুপ হয়ে যান। কোন ধরণের হা-হুতাশ করেন নাই। অন্দর মহলে কয়েকজন মহিলা কান্নাকাটি করতে শুরু করলে তিনি (রাযিআল্লাহু আনহা) ঐ মহিলাদেরকে জোরে ধমক দিয়ে বলেন, আমার তো স্বামী ছিলেন, আমি কাঁদছি না, তবে তোমরা কান্নাকাটি করার কে? যে নারী প্রতিপালিত হয়েছেন

ঐশ্বর্যের মাঝে আর যার এমন এক আধ্যাত্মিক বাদশাহ্ ও পরম মূল্যায়নকারী স্বামীবিয়োগ ঘটেছে তার পক্ষ থেকে এমন ধৈর্য ও দৃঢ়তা প্রকাশিত হওয়া একটি নিদর্শন বৈ-কী। (তারিখে আহমদীয়াত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪৭)

আবার সন্তানদেরকেও এই উপদেশই দিয়েছেন, **"এটা ভেবো না যে, তোমাদের বাবা তোমাদের জন্য কিছুই রেখে যান নি বরং তিনি দোয়ার এক বিশাল ভাণ্ডার রেখে গিয়েছেন, নির্ধারিত সময়ে যা তোমাদের কাজে আসতেই থাকবে"**।

কদাচার পরিহার কর

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) চাইতেন যে, তাঁর (আ.) জামা'তে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলীর মান্যকারী হোক, অথবা নিদেনপক্ষে আমল করা বা অনুশীলনের চেষ্টা করুক। কেউ যদি কোন একটি হুকুমও মান্য না করে, তবে তিনি (আ.) বলেছেন, আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তিনি (আ.) চাইতেন, তাঁকে অনুসারীরা জাগতিক কুপ্রথার ঊর্ধ্বে থাকবে, পার্থিব লোভ-লালসা আর নিরর্থক কাজকর্ম থেকে মুক্ত থাকবে। আর সেসব নির্দেশ প্রতিপালনে প্রচেষ্টাকারী হবে যার নির্দেশ খোদা তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.) প্রদান করেছেন। খোদার রসূল (সা.)-ও সেই নির্দেশই দিয়েছেন যা খোদার বাণী পবিত্র কুরআনে নির্দেশ করা হয়েছে। এজন্যই তো হযরত আয়েশা (রা.)-কে কেউ যখন জিজ্ঞাসা করলো, আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর জীবনাচার প্রসঙ্গে অবহিত করুন। উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, কেন? তুমি কি কুরআন শরীফ পাঠ কর না, পবিত্র কুরআনে যে জীবনাচার বর্ণিত হয়েছে সেটাই মহানবী (সা.)-এর জীবন চরিত। এজন্যই হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, আমি তো আমার নেতা ও মনিবের অনুবর্তিতা করি আর পবিত্র কুরআনের প্রতিটি নির্দেশ প্রতিপালন করাকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিয়েছি, তোমরাও যদি এমনই অনুসরণ করতে চেষ্টা কর তাহলে তোমরা আমার জামা'তভুক্ত বলে বিবেচিত হবে, আর বয়আত গ্রহণ করার পর সেই দৃষ্টান্তই জামাত প্রদর্শন করে চলছে।

সর্বপ্রথম একজন মহিলার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি, তিনি ছিলেন হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব (রা.)-এর মা। তাঁর ভাগ্নে চৌধুরী বশীর আহমদ সাহেব বর্ণনা করেছেন, তিনি চৌধুরী সাহেবকে বলেছেন আর চৌধুরী সাহেব

(রা.) একথা লিখেছেন, আমার শ্রদ্ধেয়া মায়ের কদাচার ও কুপ্রথার প্রতি কত বেশি ঘৃণা ছিল, এর ধারণা এই ঘটনা থেকে লাভ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, আমার বিয়ের সময়ের ঘটনা (চৌধুরী বশীর সাহেবের বর্ণনা), বিয়ের পর আমাকে মেয়ে মহলে ডাকা হয়, আমি দেখি গ্রামাঞ্চলের প্রথা অনুযায়ী দু'টি আসন মুখো-মুখি করে পাতা রয়েছে আর আমার কাছে আশা করা হচ্ছে, এক আসনে বসব আমি আর অপরটিতে কনেকে বসানো হবে, এরপর প্রথাগত কিছু রীতি-নীতি পালন করা হবে। পাঞ্জাবী ভাষায় যাকে বলা হয়, **'বের অওড় ঘোড়ী খেলনা'** আমার মনে ভয় ঢুকে গেল, কিন্তু আমি ভাবলাম এই সময়ে মহিলাদের সাথে তর্কবিতর্ক করা বা জিদ ধরে থাকা ঠিক হবে না। তাই আমি সেই আসন যা আমার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল তাতে বসে পড়লাম আর সেই প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠানের জন্য যে সকল বস্তু প্রস্তুত রাখা হয়েছে সেদিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। এটুকু করতেই মামি সাহেবা (চৌধুরী সাহেবের মা) আমার হাতের কবজি দৃঢ়ভাবে ধরে পিছনে সরিয়ে দেন আর বলেন, ভাগনে! এমনটি করবে না, এটাতো শির্‌ক। এতে আমার সাহস বৃদ্ধি পায় আর নিজ হাতে সেসব জিনিস এলোমেলো করে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম আর বললাম, 'আমি এসব কদাচারে জড়াবো না'। আর এভাবে আমি এসব থেকে মুক্তি পাই।

মহিলাদের এসব বিষয়ে এখনো সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত, কেবলমাত্র নিজস্ব এলাকার বা দেশীয় আচার-অনুষ্ঠানের অন্ধ অনুকরণ করবেন না বরং যেখানেই এমন কুপ্রথা চোখে পড়ে আর তাতে যৎসামান্য শির্‌কও যদি পরিলক্ষিত হয়, তা থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করা উচিত। সব আহমদী নারী এই প্রেরণার সাথে নিজেদের আর নিজ বংশধরদের তরবীয়ত করবেন, আল্লাহ্‌র কাছে এই দোয়াই আমার থাকবে।

আমাদের দেশে, পাকিস্তান, ভারত ইত্যাদি দেশের মুসলমানদের মধ্যেও এই কুপ্রথা রয়েছে যে, মেয়েদেরকে সম্পত্তির প্রাপ্য পুরো অংশ দেয়া হয় না। পুরো অংশ তো দূরের কথা, মোটেই দেয় না, বিশেষভাবে গ্রামের লোকেরা, কৃষিজমির মালিকেরা। চৌধুরী নাসরুল্লাহ খান সাহেবের পরিবারে এর একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রয়েছে। চৌধুরী সাহেব লিখেন, আমার মরহুমা বোনকে সেই যুগের প্রথা অনুযায়ী বিবাহকালে পিতাজী প্রচুর উপঢৌকন দেন আর পরবর্তিতে তিনি এই ওসীয়্যতও করেন যে, তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি

উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যেন ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী ভাগবণ্টন করা হয়, অর্থাৎ পুত্র-কন্যা উভয়ের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন করতে হবে। অতএব, সে অনুযায়ী তার মৃত্যুর পর কন্যাকেও শরীয়ত অনুযায়ী প্রাপ্য-অংশ যথারীতি দেয়া হয়েছে।

আনুগত্যের বিরল দৃষ্টান্ত
ধুমপানের ক্ষতিকর পরিণাম

একবার, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ১৮৯৬ সনে জলন্ধর সফরে যান, হুযূর (আ.)-এর অবস্থান স্থল ছিল উপরের তলায়। কোন মহিলা গৃহকর্মী ঘরে হুক্কা রেখে কাজে বেরিয়ে যায়, আর সেই সময়ে হুক্কা মাদুরে পড়ে গেলে মাদুরের কিছু অংশ পুড়ে যায়। নামায শেষে সে আগুন চোখে পড়ে এবং নিভিয়ে দেয়া হয়। এতে হুযূর (আ.) হুক্কা পানকারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হোন আর হুক্কা পানের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন। নিচে অবস্থানরত আহমদীদের কাছে এই খবর পৌঁছায়, যাদের বেশ কয়েকজন হুক্কা পান করতো আর তাদের হুক্কাও ঘরেই রাখা ছিল, তারাও হুযূরের অসন্তুষ্টির কথা যখন জানতে পেল তখন সব হুক্কা পানকারীরা হুক্কা ভেঙ্গে ফেলে ও হুক্কা পান করা ছেড়ে দেয়। সেদিন থেকে জামা'ত জানতে পেরেছে যে, হুযূর (আ.) হুক্কা অপছন্দ করেন, এতে অনেক দৃঢ়প্রত্যয়ী আহমদী তাৎক্ষণিকভাবে হুক্কা-পান বর্জন করেন। (আসহাবে আহমদ, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৭)

মির্যা আহমদ বেগ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) একবার আমার মামা মির্যা গোলামুল্লাহ্ সাহেবকে বলেন, মির্যা সাহেব, বন্ধুদেরকে হুক্কা সেবন পরিত্যাগ করার তাগিদ করুন। মামু সাহেব নিজেই হুক্কা পান করতেন, তিনি হুযূরকে আশ্বস্ত করেন, খুবই ভাল কথা হুযূর। ঘরে এসে নিজের যে হুক্কাটি দেয়ালের সাথে হেলান দেয়া অবস্থায় রাখা ছিল তা নিজ হাতে ভেঙ্গে ফেলেন। মামিজান ভাবলেন, সম্ভবত হুক্কা আজ হয়ত বাহিরে রোদে পড়ে ছিল এ কারণে অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশে এই ঘটনা। কিন্তু মামুজান যখন কাউকে কিছুই বললেন না, মামি সাহেবা তখন জিজ্ঞাসা করলেন, আজ হুক্কার প্রতি এই অসন্তোষ কেন আসলো। উত্তরে বললেন, আজ আমাকে হযরত সাহেব লোকদেরকে হুক্কা পান করতে বারণ করার তাগাদা দিতে বলেছেন। অথচ আমি নিজেই হুক্কা পান করি, তাই প্রথমে আমি নিজের হুক্কাটি

ভাঙলাম। মামুজান শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আর কখনও হুক্কায় হাত লাগান নি আর অন্যদেরকেও হুক্কা ছেড়ে দিতে তাগাদা দিতেন। (সওয়ানে ফযলে ওমর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪)

এখনও কারো কারো হুক্কাপানের এই বদ-অভ্যাস, ধুমপান হিসেবে (সিগারেট খাওয়া) চালু আছে। অতএব, যারা ধুমপায়ী রয়েছে, তাদের ধুমপান ছেড়ে দেয়ার চেষ্টা করা উচিত। কেননা, বিশেষভাবে অল্প বয়সে ধুমপানের অভ্যাস যার রয়েছে পরবর্তীতে সিগারেট পানের কারণে তা নানান ধরণের রোগে রূপ নেয়। এতে নেশাদ্রব্য ও মাদক জাতীয় দ্রব্যাদী মিশিয়ে পান করা হয়ে থাকে। অতএব, এটা হল যুবকদের জীবন ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার এক পদক্ষেপ, যা ছড়িয়ে দিয়েছে দাজ্জাল। আর দুর্ভাগ্যবশত মুসলমান দেশগুলোও এই অভিশাপের শিকার। যাহোক, আমাদের যুবকদের ধূমপান পরিহার করার চেষ্টা করা উচিত।

লটারী ধরা বৈধ নয়

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মুন্সী বরকত আলী খান সাহেব শিমলায় চাকুরী করতেন। আহমদী হওয়ার পূর্বে তিনি একটি লটারী ধরেছিলেন, আর সেই লটারীতে তার ভাগে সাড়ে সাত হাজার রুপী আসে (সে যুগে)। তিনি হুযূর (আ.)-এর কাছে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, হুযূর এটিকে জুয়া আখ্যা দেন এবং বলেন, এ থেকে নিজের প্রয়োজনে এক পয়সাও খরচ করবে না, হযরত মুন্সী সাহেব লটারীতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ গরীব মিসকিনদের মাঝে বিলিয়ে দেন। (আসহাবে আহমদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩)

আর সেই একই লটারীর প্রথা আজকাল এখানে ইউরোপে ও (বৃহত্তর) পাশ্চাত্যেও প্রচলিত। যারা লটারী ধরে আর এতে জিতে টাকা-কড়ি পেয়ে যায় তা অবশ্যই তাদের জন্য বৈধ নয় বরং নিষিদ্ধ, ঠিক সেভাবে যেমনটা জুয়া-খেলায় জেতা অর্থকড়ি হারাম। প্রথমত লটারীর টিকেট ক্রয় করা থেকেই বিরত থাকা উচিত, দৈবক্রমে কারো লটারী লেগে গেলেও নিজের জন্য তা ব্যবহৃত হতে পারে না।

এখানকার এক ঘটনা, আপনাদের দেশ ইংল্যান্ডের মোহতরম বশীর অর্চাড সাহেবের সাথে সম্পর্ক রাখে। আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর নিজের জীবনে তিনি পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করেন আর এরপরে নিজের জীবনও উৎসর্গ

করেন। ১৯৪৪ সনে আহমদী হন আর কাদিয়ানে কিছুকাল ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন। আমি যেমনটি বলেছি, তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। আর এই উৎসর্গের পর তার জীবনে এক অসাধারণ বিপ্লব সাধিত হয়েছে। খোদার ইবাদতে, দোয়ার প্রতি সীমাহীন আগ্রহ-উদ্দীপনা জন্মেছে। কাদিয়ানে অবস্থানকালে আধ্যাত্মিক-বিপ্লবের প্রথম যে ফল লাভ হয়েছে তাহলো, মদের নেশা পরিত্যাগ করা। অনেক বেশি পরিমাণে মদ পানের নেশা তার ছিল। তাৎক্ষণিকভাবে প্রথমে তিনি জরুরীভিত্তিতে মদপান করা পরিত্যাগ করেন। জুয়া খেলা আর মদ পান করা ছেড়ে দেন। ঐ উভয় অপকর্ম না করার পথ অবলম্বন করে চিরকালের জন্য তা বর্জন করেন। (আল ফযল, ১০ জানুয়ারি ১৯৭৮, আজীম জিন্দেগী, পৃষ্ঠা ৮-৯)

মদ্যপানে নিষেধাজ্ঞা

এ যুগে, সম্প্রতি মাত্র কয়েক বছর পূর্বে কয়েকজন আহমদী এখানেও, জার্মানি ইত্যাদি দেশে এবং অন্যান্য দেশেও এমন সব ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল, যেমন- রেষ্টুরেন্ট, হোটেল, পানশালা ইত্যাদিতে মদের বেচাকেনা করত। হাদীস অনুযায়ী মদ প্রস্তুত করা, মদ পরিবেশনকারী, মদ বিক্রেতা, মদ মজুদ করে রাখা, মদের সাথে সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকার ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, এরা সবাই জাহান্নামী। এজন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ঘোষণা দিয়েছিলেন, আহমদী যে-ই এই ব্যবসার সাথে কোন না কোনভাবে জড়িত আছে, তাদের অতিশীঘ্র এই ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্টতা পরিত্যাগ করা উচিত, নইলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ প্রসঙ্গে চতুর্থ খলীফা (রাহে.) নিজেই বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে বৃহৎ সংখ্যা এই ব্যবসা পরিত্যাগ করেছে। আর তাদের অনেককে খোদা তা'লাই অতি শীঘ্র খুবই ভাল ব্যবসা বা কর্মসংস্থান প্রদান করেছেন, আবার কাউকে কাউকে আল্লাহ্ তা'লা পরীক্ষাতেও ফেলেছেন আর তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত রয়েছে, তবুও তারা নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল রয়েছে, তাদের কেউই আর এই নোংরা ব্যবসায় হাত লাগানোর চেষ্টা করে নি।

পবিত্র কুরআনের প্রতি ভালোবাসা

অমৃতসরের অ-আহমদী এক ব্যক্তি মিয়াঁ মোহাম্মদ আসলাম সাহেব ১৯১৩ সনের মার্চ মাসে কাদিয়ান আসেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)

প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, “মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব মির্যা সাহেবের খলীফা হওয়ার কারণে এই সময় আহমদী জামা'তের সর্বজন গৃহীত নেতা। দু'দিন ধরে তাঁর তরবীয়তমূলক বৈঠকে, পবিত্র কুরআনের দরসে উপস্থিত থেকে তাঁর কাজ-কর্ম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছি, অত্যন্ত পবিত্রচেতা আর একনিষ্ঠভাবে তাকে ধর্মীয় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত পেয়েছি। কেননা, মৌলভী সাহেবের কর্মপন্থা লোক দেখানো আর কপটতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র এবং তাঁর হৃদয়-দর্পণে ইসলামের সত্যতার এক অসাধারণ উচ্ছাস-আবেগ বিরাজমান, পবিত্র কুরআনের আয়াত সমূহের তফসীর করার মাধ্যমে যা ইসলামী তত্ত্বজ্ঞানের স্বচ্ছ ঝর্ণাধারার আদলে সর্বদাই তাঁর অকপট-অকৃত্রিম হৃদয় থেকে ক্রমাগত ধারায় উৎসারিত হয়ে একত্ববাদের জন্য একাগ্রতা ও পিপাসা রাখে এমন লোকদের পরিতৃপ্ত করে চলছে।

প্রকৃত ইসলাম যদি পবিত্র কুরআনই হয়ে থাকে তাহলে কুরআন মজিদের প্রতি বিশ্বস্ততাপূর্ণ ভালোবাসা যেভাবে সম্মানিত মৌলভী সাহেবের মাঝে আমি দেখেছি আর কারো মাঝেই তা দেখি নাই। এমন নয় যে, অনুকরণ-প্রিয়তায় তিনি এমনটি করতে বাধ্য হয়েছেন বরং তিনি এক বিখ্যাত দার্শনিক ব্যক্তিত্ব আর একান্তই গভীর সমালোচনামূলক পর্যালোচনার ভিত্তিতে তিনি কুরআন-প্রেমে মত্ত। কেননা, পবিত্র কুরআনের যে অসাধারণ দর্শনভিত্তিক তফসীর আমি তার দরসে শুনেছি, সম্ভবত এ যুগে পৃথিবীর গুটি কয়েক মানুষ এমন তফসীর করার যোগ্যতা রাখেন। (বদর, ১৩ই মার্চ ১৯১৩, হায়াতে নূর, পৃষ্ঠা ৬১১-৬১২)

আরেকটি উপদেশ রয়েছে হযরত ডাক্তার আব্দুস সাত্তার শাহ্ সাহেব, তার নিজ সন্তানদেরকে দিয়েছেন। বলেছেন, “কুরআন শরীফকে নিজেদের জীবনের নীতি ও কর্মপন্থা হিসেবে গ্রহণ কর। আর রসূল (সা.)-এর সুন্নতের আনুগত্য কর এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের উন্নতি আর ইসলাম প্রচারে সর্বদা নিয়োজিত থাক। আর নিজেদের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরও এই শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য প্রস্তুত কর”। (সীরাত সৈয়দ আব্দুস সাত্তার শাহ্ সাহেব, পৃষ্ঠা ১৯৩)

এই উপদেশ প্রত্যেক আহমদীর সদা-সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত

হযরত মির্যা আব্দুল হক সাহেব, হযরত মালেক মওলা বক্স সাহেব (রা.) সম্পর্কে লিখেছেন, পবিত্র কুরআনের প্রতি তাঁর বিশেষ ভালোবাসা ছিল। অসুস্থতা ও দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও কুরআনের তত্ত্ব-জ্ঞান আর গুঢ় রহস্য সম্পর্কে জানা ও শোনার ব্যবস্থাদিতে তিনি রীতিমত অংশ নিতেন। এমনি একবার তিনি এক নাগাড়ে কয়েক মাস পর্যন্ত শীতকালে ফজরের নামায দারুল ফযল মহল্লা থেকে দারুল রহমতে এসে পড়তেন, যেন মোকাররম মওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব (রা.)-এর কুরআনের দরসে যোগ দিয়ে তাঁর তত্ত্বজ্ঞান ও তত্ত্বভান্ডার থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারেন। আবার রমযানে মসজিদ আকসায় কুরআন মজীদের যে দরস দেয়া হত তাতেও তিনি সাগ্রহে সযত্নে অংশগ্রহণ করতেন।... বেশি বেশি করে কুরআন পাঠ করতেন, গভীর অভিনিবেশ সহকারে পড়তেন, যা থেকে নিজে উপকৃত হতেন আর অন্যদেরকেও এতে শামিল করে নিতেন। বয়সের শেষ প্রান্তে তিনি (মির্যা আব্দুল হক সাহেব) বলতেন, দিনে বার বার যতবারই তাকে দেখি কুরআন শরীফ পাঠে রত আছেন আর নোট করার জন্য কাগজ কলম সাথেই রাখতেন। যখনই কোন আয়াতের সুন্দর ব্যাখ্যা বোধগম্য হতো সাথে সাথেই তা নোট করতেন আর পরে নিজের পরিবার-পরিজনকেও তা শোনাতেন।... (মির্যা সাহেব লিখেছেন, তিনি গৃহবাসীদের যখন শুনাতেন) সেই সময় তার চেহারা দেখে এমনই মনে হত যে, তার আন্তরিক আকাঙ্খা হলো তার সন্তানেরাও পবিত্র কুরআনের প্রেমিক হয়ে যাক। (আসহাবে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৪-১২৫)

গ্যাম্বিয়ার এক খ্রিস্টান যুবক আহমদীয়াত গ্রহণ করলে তার মা তার চরম বিরোধিতা শুরু করে দেয়। প্রথম দিকে সে সহ্য করতো, কিন্তু তার মা পবিত্র কুরআনের অবমাননা শুরু করলে সে বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যায় আর কখনও পুনরায় সে ঐ গৃহে ফেরত যায় নাই। (মাসিক আনসারুল্লাহ্, সেপ্টেম্বর ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৬)

এ যুগেও আফ্রিকার দূরদূরান্তের দেশগুলোতে এই নিদর্শন প্রকাশ পেয়ে চলেছে।

ইসলামে চারটি পর্যন্ত বিবাহের অনুমতি রয়েছে, কিছু লোক একে অবশ্য পালনীয়-নির্দেশ বানিয়ে নিয়েছে। আফ্রিকাতে প্রচলিত আছে, প্রভাব-প্রতিপত্তিসম্পন্ন, সম্পদশালী অথবা গোত্র-প্রধান যে ব্যক্তি হয়ে থাকে, সে কখনও কখনও কোন কোন গোত্রের রীতি অনুসারে চারের অধিক ৯ বা ১০টা পর্যন্ত বিয়ে করে থাকে। সিয়েরালিয়নের আলী রোজার্স সাহেব যখন আহমদীয়াত গ্রহণ করেন, সেই সময়ে তিনি যুবক ছিলেন, আর তার ১২ জন স্ত্রী ছিল। জামা'তের মুরব্বী মওলানা নযীর আহমদ আলী সাহেব তাকে জানিয়ে দেন যে, এখন আপনি আহমদী হয়ে গেছেন, এজন্য কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী চারজন স্ত্রী রাখতে পারেন, বাকীদেরকে তালাক দিয়ে ও ভরণ-পোষণ দিয়ে বিদায় করে দিন। তিনি এই নির্দেশের কেবলমাত্র আমলই করেন নাই বরং শরীয়তের নির্দেশমূলক তার এই আহ্বানে স্ত্রীদের মধ্যে প্রথম যে চারজন বয়োজ্যেষ্ঠ তাদেরকে নিজের কাছে রাখেন আর যুবতী স্ত্রীদেরকে বিদায় করে দেন। এই যে পরিবর্তন, এটাই হলো এক বিপ্লব।

আমাদের আরো একজন মুরব্বী ছিলেন, ইউনুস খালেদ সাহেব, তিনি লিখেছেন, ভিভি কাহলু সাহেব কাশফ দেখে, মওলানা মুহাম্মদ সিদ্দীক অমৃতসরী সাহেবের যুগে আহমদী হয়েছেন, পরবর্তীতে তিনি আহমদীয়া জামা'ত সিয়েরালিয়নের আমীরও ছিলেন। আহমদী হওয়ার পূর্বে সম্পূর্ণভাবেই স্বাধীন বাছ-বিচারহীন বেপরওয়া জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন, আর তার সহমতের লোকেরাও এমনই ছিল, পেশাও ছিল তার তেমনি, তিনি ড্যান্সার (নৃত্যশিল্পী) ছিলেন। কিন্তু বয়আতের অব্যবহিত পরেই নিজের ভেতর পরিবর্তন সৃষ্টি করেন, তাকওয়া ও পবিত্রতা, ইবাদত, খোদাভীতি আর বিশ্বস্ততায় এক মর্যাদাকর অবস্থান তৈরী করে নেন। আর আল্লাহ্ তাকে খুবই উন্নত মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। তিনি নিজ এলাকার প্যারামাউন্ট চীফও ছিলেন। তিনি যেই এলাকার প্যারামাউন্ট চীফ ছিলেন, সেখানে হীরার অনেক বড় একটি খনি ছিল, তিনি ক্ষমতাধিকারী ছিলেন। কেননা, ঐ অঞ্চলে চীফ যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে। তিনি চাইলে লক্ষ লক্ষ বরং কোটি কোটি রুপী উপার্জন করতে পারতেন কিন্তু আহমদীয়াতের অনিন্দ্য সুন্দর আর পবিত্র শিক্ষার কারণে এই ধরণের ধনসম্পদ নিজের জন্য হারাম জ্ঞান করেন আর এজন্য সাদাসিধে দরবেশী জীবন তিনি কাটিয়েছেন। ওপর মহলেও তার সুনাম ছিল। মিস্টার ভিভি কাহলু এক অসাধারণ বিশ্বস্ত প্যারামাউন্ট চীফ। তিনি নিজেও ঘুষ নিতেন না, আর সরকারী আমলাদেরকেও ঘুষ নিতে দিতেন না। তিনি আরো বলেন,

অসুস্থ থাকাকালে একদিন আমি তার সাথে সাক্ষাত করতে গেলে তিনি আমায় ডেকে নিয়ে বলেন, ইউনুস! আমার চোখের সামনে সব সময় কলেমা তৈয়বা **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'** সবুজ রঙে লেখা দেখতে পাই। এর কারণ কি? আমি তাকে বললাম, চীফ! আল্লাহ্ তা'লা আর তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি আপনার প্রেম ও ভালোবাসা রয়েছে, এটি তারই ফল। তিনি (মুবাল্লেগ সাহেব) বলেন, আমি দু'মাস পর্যন্ত তাকে দেখার জন্য যাতায়াত করতে থাকি আর তিনি ওই একই কথা বলতে থাকেন যে, উজ্জ্বল সবুজ রঙের লেখায় কলেমা তৈয়বা সব সময় আমার দৃষ্টিতে ভাসছে। এরপর তিনি হাসপাতালে ভর্তি হলে বেহুঁশ অবস্থায় মুহ্যমান হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় এক আহমদী বন্ধু মিস্টার কুজি তার হাত শক্ত করে ধরে বলে, চীফ পাঠ করুন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' তার সাথে চীফও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করেন, অতঃপর মিস্টার কুজি বলে, 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' সাথে চীফও পাঠ করেন 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' আর তা পাঠ করার সাথে সাথেই তার মাথা ঢলে পরে।

বিনয় ও নম্রতা

৭ম শর্তে এ-ও ছিল যে, বিনয়, সদ্ব্যবহার এবং দীনতা ইত্যাদির প্রতি যেন মনোযোগ থাকে। নবীদেরকে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সেসব লোকই মানে, যারা অর্থ সম্পদের দিক থেকে স্বল্পবিত্তের অধিকারী বিনয়ী, তবে কুরবানীতে বিত্তশালীদের চেয়েও এরা বেশী দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিয়ে থাকে। সেই সাথে অর্থ-কড়ি ব্যয়কারীও হয় বরং জীবনও যদি উৎসর্গ করতে হয় তবু এরা পিছ-পা হয় না। অধিকন্তু কখনও বড়াই করা, অহংকার বা আত্মম্ভরিতা দেখানোর অভ্যাস তাদের থাকে না। ছোটো-বড়ো সবার সামনে অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র হয়ে জীবন কাটান আর বিনয় ও নম্রতায় অতি উন্নত মান প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে থাকেন। ঐশী জামা'তের উন্নতী সাধনের রহস্য এরই মাঝে নিহিত যে, মানুষ যত বেশী বিনয়ী, দ্বীনতা অবলম্বনকারী, বিনয় ও নম্রতার মহান দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হবে উন্নতি ও অগ্রগতিও তত দ্রুত হবে। আর নবীর মান্যকারীরাও এমনই লোক হয়ে থাকে, যেমনটা আমি পূর্বেই বলেছি। অতএব, নবীগণের দৃষ্টি যখন এমন হৃদয়বানদের ওপর পতিত হয় তখন তাদের অন্তঃকরণ অধিকতর উজ্জ্বল করে তাদের আলোকিত করে তুলে। আর যারা বিনয়ী হয়ে থাকে, তাদেরকে যদি অন্যের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে জুতার ওপর গিয়ে বসতে হয় তবুও সেখানে বসে থাকাটাকেই তারা প্রাধান্য দেয় কারণ, যুগের

প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের দৃষ্টি মানুষ চিনতে এতটাই দক্ষতা রাখে যে, এমন লোকদের তারা শনাক্ত করে নেয় আবার সেই বিনয়ের প্রতিদান দেয়ার জন্য আর নিজের জামা'তকে বুঝানোর জন্য যে, আমার জামা'তে বিনয়ী ও কাঙ্গালদের মর্যাদাই সবার ওপরে, প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ বিনম্র লোকদেরকে সেখান থেকে উঠিয়ে নিজ সন্নিধানে বসান আর খাবার সময়ে ডেকে নিয়ে নিজের সাথে নিজেরই প্লেট থেকে খাবার খাইয়ে থাকেন। অতএব, নবীগণ এই সম্মান তাদেরকে এ জন্যই করেন যে, এই বিনয়ের কারণে এমন মানুষ দ্রুত ধর্ম গ্রহণ করে আর ধর্মীয় শিক্ষার ওপর পরিপূর্ণরূপে আমলকারী হয়ে যায়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "গরীব লোকেরা অহংকার করে না এবং পূর্ণ বিনয়ের সাথে সত্য গ্রহণ করে।" তিনি (আ.) আরো বলেন, "আমি সত্য সত্যই বলছি, বিত্তশালীদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই রয়েছে যারা এই পুণ্য বৈশিষ্ট্যের এক দশমাংশও অর্জনে সক্ষম, যা দরিদ্ররা পূর্ণরূপে অর্জন করে।" (ইযালায়ে আওহাম, রুহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩৭)

এজন্য তিনি (আ.) বলেছেন, জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য বিনয় আর বিনয়ই হচ্ছে শর্ত, যাতে ধর্মকে সঠিকভাবে বুঝতে পার আর এর ওপর আমল করতে পার। এখন এই পরিবর্তন কতটা কীভাবে ঘটেছে, এ সংক্রান্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি–

হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ সারওয়ার শাহ্ সাহেব (রা.) একজন বিদগ্ধ আলেম হওয়ার পাশাপাশি এক বিত্তশালী পরিবারের সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন। এ সত্ত্বেও তার পবিত্রতা, বিনয় ও সরলতা ছিল অনুকরণীয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পর্ক যুক্ত হয়ে আর হুযূর (আ.)-এর দাসত্বের জোয়াল ঘাড়ে তুলে নিয়ে তিনি জাগতিক ইচ্ছা ও আশা-আকাঙ্খা অন্তর থেকে বের করে দেন। আহমদীয়া মাদ্রাসায় চাকুরীকালীন পুরো মেয়াদকাল তিনি এক ছোট্ট আবাসগৃহে কাটিয়ে দিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে যা এক চাপরাসির জন্যও উপযোগী ছিল না। হুযূর (আ.)-এর দাসত্ব করার জন্য যেখানে তিনি সারা জগৎকে পরিত্যাগ করেছেন সেখানে জাগতিক সাজসরঞ্জাম সংক্রান্ত আরাম-আয়েশ সন্ধানের প্রশ্নই তো উঠে না। (আসহাবে আহমদ, ৫ম খণ্ডের তৃতীয় অংশ, পৃষ্ঠা ৯)

এখানে বিনয় প্রসঙ্গে মৌলবী বুরহানুদ্দীন সাহেবের আরেকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি- একবার হুযূর (আ.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে খোদা জানে তাঁর কী

চিন্তার উদয় হয়েছিল যে, তিনি কাঁদতে শুরু করেন। হুযূর (আ.) পরম স্নেহের সাথে জিজ্ঞাসা করেন, মৌলভী সাহেব! ভালোই তো আছেন! নিবেদন করলেন, হুযূর! প্রথমে আমি কোথ্ হয়েছি, পরে বাওলী বনেছি, এরপর গজনী আর এখন মির্যায়ী হয়েছি। কান্নার কারণ হল, বয়স তো পেরিয়ে গেছে। আমি অজ্ঞই রয়ে গেলাম অর্থাৎ প্রথমে আমি কোঠা ওয়ালা পীর সাহেবের কদমবুছি করতাম, এরপর বাউলি ওয়ালা বুযূর্গ-এর সেবারত ছিলাম, এরপর মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সাহেব গজনবির সকাশে গিয়েছি আর এখন আমি হুযূর (আ.)-এর কাছে আসলাম। কিন্তু আমি সেই অধমই রয়ে গেছি (এটি ছিল তাঁর বিনয়)। এই কথাতে হুযূর (আ.) মৌলভী সাহেবের প্রতি গভীর আদর ও স্নেহ প্রদর্শন করেন। প্রবোধ দিয়ে বলেন, মৌলভী সাহেব! উদ্বিগ্ন হবেন না, আপনার যেখানে পৌঁছবার সেখানে পৌঁছে গেছেন। এখন বিচলিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এই আশ্বস্ততার পর তিনি শান্ত ও সুস্থির হন। (মাসিক আনসারুল্লাহ, রাবওয়া, সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, পৃষ্ঠা ১৪)

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) লিখেছেন, **হিব্বি ফিল্লাহ্** (যাকে আমি খোদার জন্য ভালোবাসি)! সৈয়দ ফযল শাহ্ সাহেব লাহোরী, পৈত্রিক নিবাস জম্মু স্টেট। অত্যন্ত স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী, ভালোবাসা ও নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ বিশ্বাসের জ্যোতিতে জ্যোতির্মণ্ডিত আর ধনসম্পদ ও জীবন উৎসর্গ করার জন্য সোচ্চার এবং শিষ্টাচার ও সুধারণা যা পথের আবশ্যকীয় পাথেয়, তা এক অভাবনীয় বিনয়রূপে তার মাঝে বিদ্যমান। সত্য ও পবিত্র আর পরিপূর্ণ ভালোবাসা নিয়ে এই অধমের সাথে আল্লাহ্ তা'লারই খাতিরে সম্পর্ক ও বন্ধুত্বে উঁচু মানে তিনি অধিষ্ঠিত আছেন। অদ্বৈততা ও বিশ্বস্ততার গুণ তার মাঝে অতি স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। তার আপন ভাই নাসের শাহও এই অধমের সাথে বয়আতের সম্পর্ক রাখে এবং তার মামা মুন্সী করম ইলাহী সাহেবও এই অধমের সাথে অকপট বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখেন। (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩২)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেছেন, **হিব্বি ফিল্লাহ্** (যাকে আমি খোদার জন্য ভালোবাসি)!! মুন্সী রুস্তম আলী, রেলওয়ে ইন্সপেক্টর পুলিশ (আমাদের দেশে সাধারণত পুলিশের অনেক দুর্নাম রয়েছে, এই দৃষ্টিকোণ থেকে তার অতীত পর্যবেক্ষণ করা হলে বুঝা যাবে) ইনি একজন পুণ্যবান, নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ যুবক, যিনি আমার প্রথম সারির বন্ধুদের একজন। স্বার্থহীনতা

ও আন্তরিক নিষ্ঠা তার চেহারায় স্পষ্ট। কোন পরীক্ষায় কখনও আমি এই বন্ধুকে দোদুল্যমান দেখিনি। আর যেদিন থেকে তিনি ভালোবাসার সাথে আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন তার সেই ভালোবাসায় ঘাটতি বা শৈথিল্য আসে নি বরং প্রতিনিয়তই তা বৃদ্ধি পেয়েছে"। অর্থাৎ উন্নতির দিকেই ধাবিত হচ্ছেন। (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩৬)

অহংকার পরিহার কর

আবার (বয়আতের ঐ শর্তে) একথাও ছিল 'গর্ব ও অহংকার পরিহার করবে' এই প্রসঙ্গে সৈয়দ মুহাম্মদ সারওয়ার শাহ্ সাহেব (রা.)-এর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। "জ্ঞান-গরিমায় অনেক উঁচু মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সেই যুগের নামসর্বস্ব আলেমদের স্বভাবের ব্যতিক্রমে তাঁর (রা.) মাঝে সরলতা ও বিনয় এত বেশি ছিল যে, যে কোন সময়ে ছোট্ট শিশুরাও তার সাথে কথা বার্তা বলতে চাইলে নির্দ্বিধায় তাঁর (রা.) সাথে আলাপচারিতা করতে পারত। তিনি খুবই স্নেহের সাথে তার কথা শুনতেন আর তার প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত মৌলভী মোহাম্মদ হাফেয বাকাপুরী, তার নিজের শৈশবের ঘটনা শোনাতেন যে, এই অধমের কোন নিকটাত্মীয়ের ঘরে এক সন্তানের জন্ম হয়। পত্র যোগে সেই সংবাদ পেয়ে আমি হযরত মৌলভী সাহেব (রা.)-এর কাছে বাচ্চাটির নাম রাখার জন্য অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত নেই। সম্ভবতঃ সে সময় তিনি মসজিদে আকসায় দরস দেয়ার জন্য যাচ্ছিলেন অথবা দরস দিয়ে ফেরৎ আসছিলেন। আমি তার সামনে এগিয়ে যাই, এই অধমকে তার নিজের দিকে আসতে দেখে তিনি দাঁড়িয়ে যান। বড়ই স্নেহের সাথে আমার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেন এবং আমার আবেদনের প্রেক্ষিতে নবজাত শিশুর নাম প্রস্তাব করে তার জন্য দোয়া করেন"। (আসহাবে আহমদ, ৫ম খণ্ডের ৩য় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩৫)

এরপর এ প্রসঙ্গে হযরত মৌলভী বুরহানুদ্দিন সাহেব (রা.)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করছি, পূর্বেও উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, তাঁর (রা.) মাঝে নাম জাহির করা বা লোক দেখানো বা বাহ্যিকতা ইত্যাদির কোন বালাই ছিল না আবার জ্ঞান নিয়ে আত্মম্ভরিতা ও অহংকার জাতীয় কোন কিছুই তার মাঝে ছিল না, অথচ তিনি একজন উঁচু মাপের আলেম ছিলেন। কাদিয়ানে অবস্থানকালে যখনই কেউ তাঁকে 'মৌলভী সাহেব' বলে সম্বোধন করত

তৎক্ষণাৎ তিনি বাধা দিয়ে বলতেন, আমাকে মৌলভী ডেকো না, আমি তো মির্যা সাহেবের কাছ থেকে অক্ষর শেখা শুরু করেছি মাত্র। অর্থাৎ আলিফ, বে পড়া শুরু করেছি। (মাসিক আনসারুল্লাহ, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ১২)

নম্রতা ও বিনয়ের আরেকটি দৃষ্টান্ত যা সব দৃষ্টান্তকে ছাড়িয়ে গেছে। হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব শহীদ (রা.) সম্পর্কে বলেন, নিরহংকার এবং বিনয়ের ক্ষেত্রে তিনি এমন মানে উপনীত ছিলেন যে, ফানাফিল্লাহ (আল্লাহ্-তে বিলীন) না হলে কেউ এই পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না। প্রত্যেক মানুষ খ্যাতি এবং জ্ঞানের গরিমায় কিছুটা হলেও নিষ্প্রভ হয়ে যায় এবং নিজেকে কিছু একটা মনে করতে আরম্ভ করে আর এই জ্ঞান ও খ্যাতিই তার সত্যান্বেষণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই ব্যক্তি এরূপ আত্মগরিমামুক্ত ছিলেন যে, যদিও তিনি বহু শ্রেষ্ঠত্বের সমাহার ছিলেন কিন্তু তাঁর জ্ঞান, কর্ম এবং বংশগত মর্যাদা প্রকৃত সত্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনরূপ অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে নি। অবশেষে তিনি সত্যের জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জন দেন এবং আমার জামা'তের জন্য এরূপ একটি দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন– যার অনুসরণের মাঝে খোদার প্রকৃত সন্তুষ্টি নিহিত। (তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮)

ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য দেয়া ত্যাগের সুমহান মান

ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার কথা বয়আতের ৮ম শর্তে এভাবে রয়েছে যে, 'নিজ জীবন, ধন-সম্পদ, মান-সম্মান সবকিছুই উৎসর্গ করবে'।

আহমদীয়া জামা'তে আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহে ধর্মকে পার্থিবতার ওপরে প্রাধান্য দেয়ার দৃষ্টান্ত আমাদের দৃষ্টিতে অহরহ পড়তে থাকে। মায়েরা নিজ সন্তানদের সঁপে দেয়, বাবারা ইব্রাহিমী আদর্শের ওপর আমল করে নিজেদের সন্তানদেরকে আঙ্গুল ধরে নিয়ে এসে থাকে আর বলে, এই সন্তান জামা'তের আর জামা'ত যেভাবে যেখানে চায় এর কুরবানী নিক। সন্তানরাও নিজ সত্তাকে কুরবানীর জন্য উপস্থাপন করে বলে, আমরাও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর ন্যায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছি। এ দৃশ্য পূর্বেও বিদ্যমান ছিল আর আজও তা সচল ও সজীব আছে। এর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

১৯২৩ সনে হিন্দুরা শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করলে এটি প্রতিহত করার ক্ষেত্রে আহমদীয়া জামা'তের নেয়া উদ্যোগে ছোটরাও বড়দের চেয়ে পিছিয়ে ছিল না। পাঁচ বছরের শিশুও মালকানা এলাকায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। ১২ বছরের এক ছেলে তার পিতাকে লিখে, সত্যধর্মের সেবা করা কেবল বড়দেরই কাজ নয় আমাদের জন্যও এটি আবশ্যক। তাই আপনি যখন তবলীগের জন্য যাবেন আমাকেও সাথে নিয়ে যাবেন আর আপনি না গেলে আমাকে অবশ্যই পাঠিয়ে দিন। (তারিখে আহমদীয়াত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৬)

যেমনটা আমি পূর্বেও বলেছি এসব অতীতের কোন কল্প-কাহিনী নয়। এখনও এই দৃশ্য চোখে পরে। আর এখনও **'ওয়াকেফীনে নও'** শিশুরা আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য যখন আসে, তাদের নিজেদের মহলেও তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় যে, বড় হয়ে কি করবে, কি হওয়ার ইচ্ছা? এই উত্তরই তারা দিয়ে থাকে, আপনি আমাদেরকে যা-ই হতে বলবেন, আমরা তা হওয়ার চেষ্টা করবো। আমাদের করণীয় সম্পর্কে জামা'ত আমাদেরকে দিকনির্দেশনা দিক! এই হল আহমদী শিশুদের প্রেরণা-উদ্দীপনা। আর এই উদ্দীপনা যতদিন জীবিত থাকবে আর ইনশাআল্লাহ্ কিয়ামত পর্যন্ত এই চেতনা-উদ্দীপনা প্রতিষ্ঠিতই থাকবে, আর এ কারণে এই জামা'তের চুল পরিমাণ ক্ষতিও কেউ করতে পারবে না।

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) আরো বলেছেন, এখন আমার সাথে জামা'তের অনেক এমন ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, যারা স্বয়ং ধর্মকে পার্থিবতার ওপরে প্রাধান্য দিয়ে নিজেরা দরবেশের বেশ ধারণ করেছেন আর প্রিয় স্বদেশবাসীদের পরিত্যাগ করে এবং নিজেদের পুরোনো বন্ধুবান্ধব ও নিকট আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চিরদিনের জন্য আমার সাহচর্যে এসে বসতি স্থাপন করেছেন। (আসহাবে আহমদ, ৫ম খণ্ড, ৩য় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৩০)

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, ভেরা নিবাসী **হিব্বী ফিল্লাহ্!** (আল্লাহর খাতিরে যাকে ভালোবাসি) মৌলভী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব... তাঁর অর্থকড়ি দ্বারা আমার যত বেশি উপকার হয়েছে তেমনটা আমি অন্য কারো ক্ষেত্রে দেখি না, যা তার মোকাবিলায় বর্ণনা করতে পারি। আমি তাকে সহজাত প্রেরণায় সুগভীর আন্তরিক একাগ্রতা নিয়ে ধর্মসেবায় নিবেদিতপ্রাণ পেয়েছি। যদিও তাঁর দৈনন্দিন জীবন এ কাজেই নিবেদিত অর্থাৎ সকল

দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের সত্যিকার সেবক আর এ জামা'তের সাহায্যকারীদের মধ্যে তিনি তালিকার শীর্ষে রয়েছেন। (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২০)

তিনি (আ.) হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব প্রসঙ্গে বলেন, "এক নিষ্পাপ অবস্থার ভেতর তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাস থেকে তিনি কোন অংশই গ্রহণ করেন নি। চাকরীও তিনি এজন্যই ছেড়ে দিয়েছেন যে, এতে ধর্মের অবমাননা করতে হয়। সম্প্রতি মাসিক দু'শ রুপী বেতনের একটি চাকুরী তিনি পেয়েছিলেন কিন্তু সরাসরি না করে দিয়েছেন। বিনয়ের মাঝে তিনি নিজ জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। তার শখ হলো, কেবলমাত্র আরবী পুস্তকাদি পাঠ করা। ইসলামের প্রতি অভ্যন্তরীণভাবে আর বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করার মাঝে সারাটা জীবন তিনি কাটিয়ে দিয়েছেন। এত অসুস্থতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও সদা তার কলম সচল থাকত"। [সীরাত হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটি (রা.), পৃষ্ঠা ১০৮]

মালির কোটলার রঈস হযরত নওয়াব মোহাম্মদ আলী খান সাহেব, আপন সহোদরকে এক পত্রে লিখেন,

"আমি যেসব বিষয়ের জন্য কাদিয়ানে বসতি গেড়েছি, অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তা আমি প্রকাশ করছি যে, হযরত আকদাস মসীহ মওউদ ও মাহদীয়ে মাসহুদ-এর হাতে বয়আত গ্রহণের পর ১২ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত আমি ১১ বছর পৈত্রিক নিবাসেই ছিলাম আর কাদিয়ানের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল বিচ্ছিন্ন। কেবল কখনো-সখনো স্বল্প কিছু দিনের জন্য আসা-যাওয়া করেছি, বস্তুজগতের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে নিজ জীবনের অনেকটা সময় বিনষ্ট করেছি। শেষে যখন চিন্তাভাবনা করে বুঝতে পারলাম, জীবনটা তো হাওয়া হয়েই রইল, আমরা না ধর্মের কিছু করতে পারলাম আর না দুনিয়ার।

ছয় মাস অবস্থান করার ইচ্ছা নিয়ে আমি এখানে এসেছিলাম (অর্থাৎ কাদিয়ানে), তবে এখানে এসে আমি আমার সমস্ত কাজের ওপর চিন্তা-ভাবনা করলে শেষ পর্যন্ত আমার অন্তর এই ঘোষণাই দেয় যে, দুনিয়ার কাজ, ধর্মের কাজের সাথে যুক্ত হয়ে নিজ থেকেই সম্পন্ন হয়ে যায়, কিন্তু দুনিয়ার পিছনে যখন মানুষ ছুটতে থাকে তখন দুনিয়াও হস্তগত হয় না আর ধর্মও ধ্বংস হয়ে যায়। এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি আর আমি দেখেছি, এই এগার বছরে না

আমি কিছু করতে পেরেছি, না আমার সম্মানিত ভাইয়েরা কোন কিছু গড়তে পেরেছেন। বরং প্রতিনিয়ত এই অবস্থা নৈরাশ্যকর হতে থাকা সত্ত্বেও আমাদের ধর্মকেও ধ্বংস করছি। শেষ পর্যন্ত বুঝলাম, জাগতিক কাজের কোন শেষ নেই তাই কোটলাকে বিদায় জানাই আর আমি দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, আমি হিজরত করব।

অতএব, আলহামদুলিল্লাহ! আমি খুবই আনন্দের সাথে প্রকাশ করছি যে, আমি কোটলা থেকে হিজরত করেছি, এ কারণে আমি এখন শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে মুহাজির আর তাই নিজের ইচ্ছায় স্বদেশে ফেরত আসতে পারি না, অর্থাৎ সে স্থানকে (স্থায়ী) আবাসগৃহ বানাতে পারি না। অতিথির ন্যায় আসলে, আসা যেতে পারে। অতএব, স্বদেশে এই অবস্থায় আমার আসা অসম্ভব। আমি খুবই আনন্দে আছি আর খুবই ভাল আছি। আমরা যে প্রেমাস্পদের প্রেমিক, তাঁর থেকে পৃথক কীভাবে হতে পারি...।

সম্মানিত প্রিয় ভাই আমার! খোদার জন্যই এখানে এসেছি আর আমার বন্ধুত্ব, আমার ভালোবাসাও খোদারই জন্য। আমি কোটলা থেকে বিচ্ছিন্ন আছি বটে, কিন্তু কোটলার মন্দ অবস্থা আমাকে প্রচণ্ডভাবে পীড়া দেয়। খোদা তা'লা আপনাকে আমাদের সকল আত্মীয়-স্বজন ও সমগ্র কোটলাবাসীকে বুঝবার শক্তি দান করুন, যেন আপনারা সবাই ইসলামের পরিপূর্ণ সেবক হয়ে যেতে পারেন আর আমাদের সবার জীবন-মৃত্যু যেন কেবল আল্লাহ্‌রই জন্য হয়। আমরা সবাই যেন মহান খোদার পূর্ণ আনুগত্যকারী ও মুসলিম হয়ে যাই...। আমাদের বয়আতের শর্তে রয়েছে, আমরা যেন ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেই, নিজেদের শুভাকাঙ্ক্ষী সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকি, তাদের পূর্ণ আনুগত্য করি। এ বিষয়টি আমাকে, এখানে থেকে যেতে অনুপ্রাণিত করছে। আমার ঈমান যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই বস্তুজগত ক্রমশ তুচ্ছ মনে হচ্ছে আর ধর্ম ক্রমান্বয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে। মহান খোদা আর মানুষের অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতাবোধ বেড়ে চলছে, একইভাবে সরকারের প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা অন্তরে পরিপূর্ণরূপে ঘর করে চলছে।" (আসহাবে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৬-১২৯)

ইসলাম প্রচারে হাকীম ফযল দ্বীন সাহেবের প্রেমময় আবেগ

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **হিব্বী ফিল্লাহ্** (খোদার খাতিরে আমি যাকে ভালোবাসি)! ভেরা নিবাসী হাকীম ফযল দ্বীন সাহেব। হাকীম সাহেব ভাই মৌলভী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেবের একজন বন্ধু আর তার নৈতিকতার বৈশিষ্ট্য ও গুণে গুণান্বিত ছিলেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। আমি জানি, আল্লাহ্ ও রসূলের (সা.) সাথে তার সত্যিকারের ভালোবাসা রয়েছে। আর সে কারণেই তিনি এই অধমকে ধর্মের সেবক দেখতে পেয়ে আল্লাহ্‌র সাথে শর্ত পূর্ণ করছেন। মনে হয় যেন, ইসলাম ধর্মের সত্যতার বিস্তার ঘটানোর সেই প্রেমময় আবেগের অনেক বড় অংশ তিনি লাভ করেছেন যা শুরু থেকেই আমার প্রিয় ভাই মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবকে দেয়া হয়েছে। ধর্ম প্রচার-প্রসারে এই জামা'তের খরচাদির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করে তিনি সর্বদা এই চিন্তায় মগ্ন থাকেন যে, চাঁদার মাধ্যমে এসব ব্যয় নির্বাহের যদি কোন উত্তম ব্যবস্থা হতো। (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২২)

১৯২৩ সনে শুদ্ধি আন্দোলন যখন চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল, আহমদী মুবাল্লিগদের এই অবস্থা ছিল যে, তারা প্রচণ্ড দাবদাহে প্রতিদিন মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতেন। কখনও কখনও খাবার তো দূরের কথা পানিও পেতেন না। অধিকাংশ সময়ে সিদ্ধ অর্ধসিদ্ধ বাসি খাবার খেতেন অথবা ভাজা ছোলা এবং পানি পান করে দিনাতিপাত করতেন। কখনও কখনও ছাতুও সাথে রাখতেন এবং তা খেয়ে দিনাতিপাত করতেন। সূফী আব্দুল কাদির সাহেব নিয়াজ বি.এ. প্রতিদিন গড়ে **১৬** মাইল পদব্রজে অতিক্রম করে মিনপুরী ও মিথরা জেলার চল্লিশটি গ্রাম সফর করেন। (তারিখে আহমদীয়াত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৩)

আমেরিকার এক ভদ্রলোক আহমদীয়াত গ্রহণ করেন, যিনি একজন বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। সমসাময়িক যুগে এত দ্রুত তিনি সঙ্গীত জগতে উন্নতি করেছিলেন যে, খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সমগ্র আমেরিকার সঙ্গীতাঙ্গনে খ্যাতি লাভ করেন। তার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছিল, তিনি এত মহান একজন সঙ্গীত শিল্পী রূপে উত্থিত হতে যাচ্ছেন যে, সংগীত জগতে তাকে নিজ যুগের অনেক বড় একজন গায়ক হিসেবে স্মরণ করা হবে। আহমদী হওয়ার

পর, মিউজিকের ভ্রুক্ষেপই করেন নি আর না মিউজিকের মাধ্যমে সম্ভাব্য আয়ের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে গান-বাজনা ছেড়ে দেন। এখন তিনি এক দরবেশের মত জীবন-যাপন করছেন। আর নিয়ম-নিষ্ঠার সাথে নামায আদায় করেন, যথারীতি তাহাজ্জুদও পড়ছেন। মহানবী (সা.)-এর নাম নিতেই তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। (মাসিক খালেদ, জানুয়ারি ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ৪০)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, (তাঁর খিলাফতকালের পূর্বের একটি ঘটনা লিখেছেন) "আমি এখানে কি জন্য এসেছি? দেখ! 'ভেরা'তে আমার পাকা বাড়ী রয়েছে আর এখানে আমি কাঁচা ঘর বানিয়েছি আর সব রকমের সুযোগ-সুবিধা এখান থেকে বেশি সেখানে লাভ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু আমি দেখলাম, আমি রুগ্ন, আর খুবই রুগ্ন, অতিশয় সাহায্য-মুখাপেক্ষী, নিরূপায় আর একান্তই নিরূপায়। অতএব, আমি আমার এইসব দুঃখ লাঘবের জন্য এখানে এসেছি। যদি কোন ব্যক্তি কাদিয়ানে আসে আমার নমুনা দেখার জন্য, দেখে নেয় কিংবা এখানে এসে, কিছুদিন অবস্থানের পর এখানকার লোকদের সম্পর্কে অভিযোগ করে তাহলে এটি তার ভ্রান্তি আর তার চোখও প্রতারণার শিকার! কেননা, সে রোগাক্রান্তদের স্বাস্থ্যবান ভেবে তাদের পরীক্ষা নিচ্ছে। এখানকার বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক এখানে আসা আর এখান থেকে চলে যাওয়া অথবা এখানে বসবাস করা এসব কিছুই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র অধীনে হওয়া উচিৎ, নতুবা খাওয়া-দাওয়া আর আরামদায়ক বিছানাপত্রের জন্য যদি আস তবে শোন! তোমাদের অধিকাংশেরই নিজ নিজ গৃহে ভাল খাবার ইত্যাদির ব্যবস্থা রয়েছে, তাই এখানে আসার প্রয়োজনটা কী! তোমরা এই অঙ্গীকারে যথার্থভাবে তখন প্রতিষ্ঠিত গণ্য হবে যদি তোমাদের সব কাজ খোদার জন্য হয়।" (খুতবা জুমুআ, ২২ জানুয়ারি ১৯০৪, খুতবাতে নূর, পৃষ্ঠা ১৬০, নব সংস্করণ)

হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতিফ সাহেব (রা.) সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এই মরহুম বুযূর্গের মধ্যে অত্যন্ত ঈর্ষণীয় এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি সত্যিই ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের ওপর অগ্রগণ্য করে রেখেছিলেন। তিনি বস্তুতই ঐসব সরলপ্রাণ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা খোদাকে ভয় করে নিজেদের তাকওয়া ও খোদার আজ্ঞানুবর্তিতাকে চরম পর্যায়ে উন্নীত করে থাকেন এবং খোদাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ও তাঁর প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে

নিজেদের জীবন, অর্থসম্পদ ও সম্মানকে মূল্যহীন এক খড়কুটার ন্যায় নিজ হাতে বিসর্জন দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। তার ঈমানের শক্তি এতটা উন্নত ছিল যে, আমি যদি তাকে বৃহৎ হতে বৃহত্তর পর্বতের সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে আমার আশংকা হয়, আমার এই তুলনা না আবার দুর্বল প্রমাণিত হয়। অধিকাংশ মানুষ বয়আত করা সত্ত্বেও এবং আমার দাবির সত্যায়ণ করা সত্ত্বেও পার্থিবতাকে ধর্মের ওপর প্রাধান্য দেয়ার বিষাক্ত বীজ হতে সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ লাভ করে না বরং তাদের মধ্যে কিছু সংমিশ্রণ– অবশিষ্ট থেকেই যায়। তা জীবন সম্বন্ধেই হোক, সম্মান সংক্রান্তই হোক, সম্পদ সম্বন্ধেই হোক বা চারিত্রিক অবস্থা সম্পর্কে হোক না কেন, একটি প্রচ্ছন্ন কৃপণতা তাদের অসম্পূর্ণ সত্তায় বিদ্যমান থাকে। এই কারণে তাদের সম্বন্ধে সর্বদা আমার হৃদয়ে যে অবস্থা বিরাজ করে তা হলো, কোন ধর্মীয় দায়িত্ব ন্যস্ত করতে গিয়ে আমার আশংকা হয়, তারা আবার পরীক্ষায় না পড়ে যায় এবং এই সেবাকে নিজেদের ওপর একটি বোঝা মনে করে নিজেদের বয়আতকে বিদায় না জানিয়ে বসে। কিন্তু এই মরহুম পুণ্যবানের প্রশংসা আমি কোন ভাষায় করব, যিনি স্বীয় প্রাণ, সম্পদ ও সম্মানকে আমার আনুগত্যে এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলেছেন, যেভাবে অকেজো-অপ্রয়োজনীয় বস্তুকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়। অধিকাংশ লোককে আমি দেখি, যাদের সূচনা আর সমাপ্তি সমান হয় না এবং সামান্যতম হোঁচট বা শয়তানী কুপ্ররোচণা, বা কুসঙ্গের দরুন তারা পদস্খলিত হয়। কিন্তু এই মরহুম বীরপুরুষের অবিচল দৃঢ়তার কথা আমি কোন ভাষায় বর্ণনা করব, তিনি বিশ্বাসের জ্যোতিতে প্রতিটি মুহূর্তে উন্নতির রাজপথে এগিয়ে গেছেন।” (তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০)

অতঃপর, তিনি (আ.) আরও বলেন, শহীদ মরহুম প্রাণ বিসর্জন দিয়ে আমার জামা'তের জন্য এক আদর্শ রেখে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে আমার জামা'ত একটি বড় দৃষ্টান্তের মুখাপেক্ষী ছিল। এখনও তাদের মধ্যে এমন লোকও দেখা যায়, যে সামান্য একটু কাজ করে মনে করে, অনেক বড় কাজ সে করে ফেলেছে আর আমার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুগ্রহ করেছে বলে ভাবতে আরম্ভ করে। অথচ, এটা তার প্রতি একান্ত খোদার অনুগ্রহ যে তিনি তাকে এই সেবার তৌফিক দান করেছেন। কেউ-কেউ এমনও আছে, যারা সর্বান্তঃকরণে ও পুরো নিষ্ঠার সাথে এদিকে আসে নি এবং ঈমানের যে শক্তি পরম মার্গের নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতার দাবি করে শেষ পর্যন্ত তারা তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। জড় জগতের ভালোবাসায় তারা ধর্মকে খুঁইয়ে ফেলে এবং সামান্য

পরীক্ষায়ও পাশ করে না। খোদার জামা'তে প্রবেশ করেও তাদের দুনিয়াদারী হ্রাস পায় না।

কিন্তু, খোদা তা'লার চরণে হাজার-হাজার কৃতজ্ঞতার অর্ঘ, এরূপ লোকও আছে, যারা সত্যিকার অন্তঃকরণে ঈমান এনেছে এবং সত্যিকার অন্তঃকরণে এই পথ অবলম্বনও করেছে, এই পথে যেকোন কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত। কিন্তু এই বীরপুরুষ, যে আদর্শ স্থাপন করেছেন, সেসব শক্তি জামা'তের আজও প্রকাশ পাওয়া বাকী আছে। খোদা সবাইকে ঐ ঈমান এবং ঐ দৃঢ়চিত্ততা দান করুন, যার দৃষ্টান্ত এই শহীদ মরহুম প্রদর্শন করেছেন। এই পার্থিব জীবন– যার সাথে শয়তানী হামলার সংমিশ্রণ রয়েছে, তা মানুষের উৎকর্ষতা লাভের পথে অন্তরায়। এই জামা'তে অনেকেই প্রবেশ করবে কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, অতি অল্প লোকই এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করবে। (তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭-৫৮)

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, সাহেবযাদা আব্দুল লতীফের জন্য যে শাহাদত নির্ধারিত ছিল, তা ঘটে গেছে। এখন অত্যাচারির শাস্তি পাওয়ার পালা।

إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُۥ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٥﴾

(সূরা ত্বাহা, ২০:৭৫

অর্থাৎ, যে তার প্রভুর দরবারে অপরাধী হিসেবে আসবে তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত সে সেখানে মরবেও না আর বাঁচবেও না। –(অনুবাদক)

আক্ষেপ! এই আমীর, **"মান ইয়াকতুলু মু'মিনান মুতাআ'ম্মিদান"** (সূরা আন্ নিসা, ৪:৯৪) এর অধীনে এসে গেছে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি জেনেশুনে মু'মিনকে হত্যা করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে– অনুবাদক)। একবিন্দুও খোদা তা'লাকে ভয় করে নি। অন্যদিকে মু'মিনও এরূপ মহান, যদি সমস্ত কাবুলে অনুরূপ একটি দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করা হয় তবুও তা পাওয়া যাবে না। এরূপ ব্যক্তিরা হলেন, অমূল্য রত্ন, যারা নিষ্ঠার সাথে ঈমান ও সত্যের জন্য জীবনও বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না আর স্ত্রী ও সন্তানসন্ততির জন্য কোন ভ্রুক্ষেপই করেন না। হে আব্দুল লতিফ! তোমার প্রতি হাজার হাজার রহমত। তুমি আমার জীবদ্দশায়-ই স্বীয় নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছ। আমার মৃত্যুর পর আমার জামা'তে যারা থাকবে, আমি জানি না তারা কী করবে! (তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০)

তিনি (আ.) আরও বলেছেন, যখন আমি সাহেবযাদা মৌলভী আব্দুল লতিফ মরহুম কর্তৃক প্রদর্শিত দৃঢ়চিত্ততা ও আত্মোৎসর্গের প্রতি লক্ষ্য করি, তখন আমার জামা'ত সম্বন্ধে আশা ও প্রত্যাশা অনেক বেড়ে যায়! কেননা, যেই খোদা এই জামা'তের কোন কোন ব্যক্তিকে এমন শক্তি দান করেছেন যে, তাঁরা কেবল ধনসম্পদই উৎসর্গ করেন নি বরং এপথে নিজেদের প্রাণও বিসর্জন দিয়েছেন; সেই খোদার এই সুস্পষ্ট ইচ্ছা রয়েছে বলে মনে হয়, তিনি এমন বহু লোক জামা'তে সৃষ্টি করবেন যারা সাহেবযাদা মৌলভী আব্দুল লতিফের প্রেরণাসমৃদ্ধ হবেন আর তারা হবে তাঁর আধ্যাত্মিকতার এক নতুন চারা বিশেষ। (তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৫)

আজ থেকে ঠিক একশ' বছর পূর্বে হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেবকে শহীদ করা হয়েছিল।

হে শেষ যুগের মসীহ্! ধন্য আপনি, আপনার প্রিয় জামা'ত, জামা'তের প্রতি আপনার নিজ প্রত্যাশাকে পূর্ণ করেছে। আপনার যেসব প্রত্যাশা নিজস্ব জামা'তের প্রতি ছিল তা তারা পূর্ণ করেছে। তারা নিজেদের ধনসম্পদ, সময় আর জীবন উৎসর্গ করতে কখনো পিছপা হয় নি। এর দৃষ্টান্ত আমরা আজও অবলোকন করছি। তাঁর পরেও জামা'তে এমন লোক জন্মলাভ করেছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর চিন্তা ছিল, জানা নেই আমার পর কি হবে! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনার পরেও এমন ব্যক্তিবর্গ জন্ম লাভ করছেন আর করতে থাকবেনও, যারা পার্থিব লোভলিপ্সায় লালায়িত হয় নি আর নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধা করে নি। বাবা স্বচক্ষে ছেলেকে শহীদ হতে দেখেছে আবার ছেলেও পিতাকে নিজেরই চোখের সামনে শাহাদত বরণ করতে দেখেছে, তবুও দৃঢ় থেকেছেন, দোদুল্যমান হন নি বরং এরপর নিজেই জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

হে পবিত্র মসীহ্ (আ.)! কল্যাণ হোক আপনার, আপনার বংশধরদের মধ্য থেকে, আপনার নিজস্ব প্রজন্মও জীবন উৎসর্গ করে জামা'তকে অনেক বড় বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। আল্লাহ্ তা'লা এসব শহীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে থাকুন, আমাদেরকেও তৌফিক দিন যেন আমরা জাগতিকতার ওপর ধর্মকে প্রাধান্য দিতে পারি এবং সকল ত্যাগ স্বীকারে সদা প্রস্তুত থাকি আর নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে একই আবেগ-উদ্দীপনা সজীব রাখি। আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা আমাদেরকে এই তৌফিক দান করতে থাকুন। (আমীন!)

৩

[লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমুআর খুতবা, ১৭ অক্টোবর, ২০০৩]

মানবসেবা এবং নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার অতুলনীয় আদর্শের অনুপম দৃষ্টান্ত

সৃষ্টিসেবা আর মানব কল্যাণ সাধনের প্রতি আমাদের জামা'তে সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ধনী-দরিদ্র প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী সদা প্রচেষ্টারত আর অপেক্ষারত থাকে, কখন তাদের সুযোগ আসবে যাতে তারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সৃষ্টির সেবাকর্মে অংশ নিতেও সক্ষম হবে। প্রত্যেক আহমদীর হৃদয় সৃষ্টিসেবার ক্ষেত্রে কেন এত উদার-উন্মুখ? কারণটি হল, ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষা যা আমরা ভুলে বসেছিলাম, তা হলো, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির অন্বেষী হয়ে থাকলে তাঁর সৃষ্টিকুলের সাথে উত্তম আচরণ কর, তাদের চাহিদা পুরণে যত্নবান থাক। এটিও একটি মস্ত বড় মাধ্যম যা তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যে ধন্য করবে। সৌন্দর্যপূর্ণ এই অনুপম শিক্ষাকে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) (তাঁর কাছে) দীক্ষা গ্রহণের শর্তসমূহের মধ্যে অন্যতম মৌলিক শর্ত নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ, (বলেছেন) আমার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পর যাবতীয় নিজস্ব শক্তি-সামর্থ্য, অর্থ ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টিকুলের প্রতি কেবল সহমর্মিই হবে না বরং তাদের উপকারও সাধন করবে। এ কারণে ভূমিকম্পবিধ্বস্তদের সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দিলে আহমদীরা থাকে সর্বাগ্রে, বন্যাপ্লাবনে কবলিতদের সাহায্যে সেবা আবশ্যককালে আহমদীরা এগিয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতিও এসেছে যে প্রচণ্ড ঢলের মুখে আহমদী যুবকরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে নিমজ্জমান লোকদেরকে কূলে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। আবার যুগখলীফা যখন এ ঘোষণা দেন যে, আফ্রিকার দরিদ্র শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য, রোগবালাইয়ে জর্জরিত মানবগোষ্ঠি যাদের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই, স্কুল-হাসপাতাল খোলার জন্য এত পরিমাণ আর্থিক সংস্থান প্রয়োজন; জামা'তের সদস্যগণ মানবসেবা প্রদানের উদ্দীপনা, যা এক আহমদীর অন্তরে থাকা উচিত, তার কারণে এই পরিমাণ অঙ্কের অর্থসংস্থান

করুন বলতেই, প্রিয় এই জামা'তের সদস্যবৃন্দ যুগখলীফার এই নির্দেশনায় সাড়া দিয়ে চাহিত পরিমাণের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি পরিমান অর্থ যুগখলীফার সমীপে উপস্থাপন করে। এরপর যুগখলীফা যখন আবার বলেন, অর্থের সংস্থান তো হলো এখন ঐসব স্কুল ও হাসপাতাল নিয়মিত চালু রাখার জন্য আমার বিভিন্ন পেশার লোকবল দরকার, এতে জামা'তের চিকিৎসক ও শিক্ষকগণ পরম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে নিজেদেরকে সেবাদানে সঁপে দেন।

বর্তমানে আফ্রিকার অবস্থা পূর্বের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ভাল। ৭০-এর দশকে যখন নূসরত জাহাঁ স্কীমের সূত্রপাত হয় তখন অত্যন্ত প্রতিকুল পরিবেশ ছিল। তখনকার অবর্ণনীয় ওই পরিস্থিতিতে তারা সেখানে দিনাতিপাত করেছেন। কোন কোন চিকিৎসক ও শিক্ষক ভালো চাকুরীতে ছিলেন, উপার্জনও বেশি করতেন, তবুও আত্মোৎসর্গের পর নিরেট পল্লীগ্রামে গিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। অধিকাংশ হাসপাতাল ও স্কুলগুলো স্থাপন করা হয়েছিল গ্রামে, যেখানে কোন বিদ্যুৎ ও পানির সুব্যবস্থা ছিল না, তবে গরিবদুঃখী মানুষের সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি পূরণের অঙ্গীকার ছিল। এজন্য কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ও সুযোগসুবিধার প্রতি তারা কোন ভ্রুক্ষেপই করেন নি।

প্রথমদিকে হাসপাতালের অবস্থা এতটাই করুণ ছিল যে, কাঠের বেঞ্চির ওপর রোগীকে শোয়ানো হতো, আলোর স্বল্পতা মেটাতে ব্যবহার করা হতো হারিকেন বা গ্যাসল্যাম্প। অপারেশনের জন্য ছুড়ি, চাকু, কাঁচি হাতের কাছে যা-ই পাওয়া যেতো তা দিয়েই সারা হতো শল্য-চিকিৎসা আর নিবিড়ভাবে দোয়ারত থাকা হতো এই বলে, "হে আমার খোদা! আমার কাছে সম্ভাব্য যা কিছু ছিল তা দ্বারা আমি চিকিৎসার্থে ব্যবস্থা নিয়েছি। আমার খলীফা হুযূর আমাকে বলেছেন, 'দোয়ার দ্বারা রোগ নিরাময় কর, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের হাতে অনেক আরোগ্য ক্ষমতা দান করবেন'। অতএব, রোগীকে তুমিই আরোগ্য দান কর। আল্লাহ্ তা'লা ওই আত্মোৎসর্গকারী ডাক্তারদের মর্যাদা দিয়েছেন, মূল্যায়ন করেছেন আর দুরারোগ্য এমন সব রোগীকে আরোগ্য দান করেছেন যে, জগৎ হতবাক! আবার অর্থের সংস্থানও খোদা তা'লা এমনভাবে করেছেন যে, বিত্তবান লোকেরা পর্যন্ত নিজেদের সুচিকিৎসা গ্রহণের জন্য শহরের বড় বড় নামীদামী সব হাসপাতাল বাদ দিয়ে আমাদের গ্রামীণ ছোট হাসপাতালগুলোকেই চিকিৎসা গ্রহণে প্রাধান্য দিত। অনুরূপভাবে, শিক্ষকগণও

মানবের হিতসাধনের অনুপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে শিশুদেরকে শিক্ষার অলঙ্কারে সুসজ্জিত করে উন্নতির পথ দেখিয়েছেন। ডাক্তার ও শিক্ষকগণের সেবাদানের এই কর্মযজ্ঞ আজও সচল রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এই ধারাবাহিকতা সর্বদা সচল রাখুন আর এসব সেবাদানকারীর প্রতি মহান প্রতিদানের ধারা প্রবহমান রাখুন।

আহমদী চিকিৎসকদের জীবন উৎসর্গ করা উচিৎ

জলসায় (জলসা ২০০৩) আমি ডাক্তারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে, আমাদের আফ্রিকার হাসপাতালগুলোর জন্য ডাক্তারগণ স্থায়ী কিংবা সাময়িককালের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করুন। আজকাল তো আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অবস্থা অনেক ভালো। এখন সেসব সমস্যা বা প্রতিকূলতাও নেই যার সম্মুখীন হতে হয়েছে প্রাথমিক যুগের সেবাদানকারী উৎসর্গকারীদের। এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবস্থা অনেক ভাল আর সকল প্রকার সুযোগসুবিধা রয়েছে। সামান্য কোন অসুবিধা থাকলেও 'আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী মানবকল্যাণে নিয়োজিত থাকবো'– মর্মে বয়আতের প্রতিশ্রুতি দৃষ্টিতে রাখুন। এগিয়ে আসুন, আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করুন এবং তাঁর (আ.) দোয়ার উত্তরাধিকারী হোন। অনুরূপভাবে রাবওয়ার ফযলে ওমর হাসপাতালের জন্যও চিকিৎসকের প্রয়োজন রয়েছে। সেখানকার জন্যও জীবন উৎসর্গকারী ডাক্তার সাহেবদের আবশ্যকতা রয়েছে।

এছাড়া পাকিস্তানেও এবং অন্যান্য দেশেও শিশুদের পড়ালেখা ও রোগীদের চিকিৎসার জন্য জামাতী ব্যবস্থাপনার অধীনে সামর্থ্যবান ব্যক্তিবর্গ আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকেন। পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের ন্যায় দেশগুলো, যেখানে দারিদ্র অনেক বেশি তা নিরসন করার উদ্দেশ্যে আর্থিক সহায়তা দানকারীরা রোগীদের সেই সেবা দান করে আর্তপীড়িতদের দোয়া পাচ্ছে। জামা'তের বন্ধুদের সেই সৎকর্মগুলোও সচল রাখা উচিত বরং আগের চেয়ে বাড়িয়ে আরো বর্ধিত করা উচিত। কেননা, দারিদ্রতার দুঃখকষ্ট ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে।

এবারে আমি পুরোনো বুযূর্গদের কতিপয় ঘটনা তুলে ধরব, যারা ছিলেন সৃষ্টি সেবার প্রেরণায় সমৃদ্ধ।

হযরত মির্যা আইয়ুব বেগ সাহেব (রা.)-এর অনুকরণীয় আদর্শ প্রসঙ্গে বর্ণনাকারী লিখেন, মরহুম এমন ব্যক্তির অনুকরণীয় আদর্শের এক জীবন্ত প্রতীক ছিলেন, হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী নিজের ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করেন যা পছন্দ করেন নিজের জন্য, আর কখনও ভাইয়ের সাথে এমন আচরণ করেন না, যেমন আচরণ সে নিজের সাথে করা অপছন্দ করে। সে সব সময় সেবা করার যেকোন সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে এবং সদা সুযোগ খুঁজে বেড়ায় যাতে কোন ভাই বা বন্ধুর কোন কাজ সুন্দরভাবে সমাধা করতে পারে। (তার সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে) এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, যখন তিনি কলেজে অধ্যয়ন করতেন কিংবা জামা'তের অনুষ্ঠানাদিতে বক্তৃতা হলে সেখানে শুনার জন্য যেতেন, সেসময়ে সেই পথের সব আহমদীর সাথে দেখাসাক্ষাৎ করতেন। কেউ অসুস্থ বা পীড়িত হলে তার বাসগৃহে যেতেন, অসুখবিসুখের খোঁজ-খবর নিতেন। কখনও কখনও প্রায় প্রতিদিনই সেই রোগাক্রান্তদের দেখতে যেতেন। একবার মুফতী মোহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে মরহুম আইয়ুব বেগ সাহেব (রা.) কয়েকদিন ধরে মুফতি সাহেবের সেবার মানসে তার (রা.) গৃহে অবস্থান করে রাতদিন তার সেবা-শুশ্রূষা করেন। এমন কী মাঝে-মধ্যে অসুস্থতার সময় নোংরা আবর্জনা পরিস্কার করার প্রয়োজন দেখা দিলে তাও নিজহাতে করতেন। (আসহাবে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৯-২০০)

হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব (রা.) তার মাতা প্রসঙ্গে আরো লিখেন, তিনি বলতেন আল্লাহ্ তা'লা শত্রু না হলে অন্য কোন শত্রু কীইবা ক্ষতি করতে পারে! এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমিতো কাউকেই শত্রু মনে করি না, আর শত্রুদের সাথেও খুবই সদ্ব্যবহার করে থাকি। তিনি বলতেন, যার প্রতি হৃদয় সন্তুষ্ট তার প্রতি ভালো আচরণ করতে অন্তরতো আপনা থেকেই চায়, এতে পুণ্যের কি আছে। আল্লাহ তা'লাকে খুশি করতে চাইলে মানুষের উচিত, সেসব লোকের সাথে কৃপা ও সদ্ব্যবহার করা, যাদের প্রতি অন্তর সন্তুষ্ট নয়। [তিনি (রা.) আরো লিখেন, ডেস্কায় বসবাসকালে সেখানকার লোকদের সাথে খুবই উদারতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল তাঁর মায়ের এবং লোকেরাও তাকে খুবই শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে দেখতো।] যখন আহরারীদের নৈরাজ্য আরম্ভ হয় আর এর প্রভাব উক্ত এলাকাতেও পড়ে, এতে সেসব লোক যারা সাহায্য নিতো তারাই শত্রুতা আরম্ভ করল। কিন্তু তাদের ঐ শত্রুতাও তাঁর মায়ের ওপর কোন মন্দ

প্রভাব ফেলতে পারলো না, এমনকি তাঁর আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কেউ কেউ এ কথাও বলে, আপনি অমুক ব্যক্তিকে সাহায্য করছেন অথচ সে আমাদের বিরোধীতা করছে আর আহ্‌রারীদের দলভুক্ত। তিনি তাদের এমন কথা খুবই অপছন্দ করতেন এই বলে যে, তোমরা আমার এই মানবসেবায় কেন বাদ সাধছ?

বর্ণনাকারী লিখেন, একবারের কথা, তিনি কিছু গরমকাপড় বুনছিলেন। তখন তিনি (বর্ণনাকারী) তাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কার জন্য কাপড় বুনছেন, চৌধুরী সাহেবের মা বললেন, এটা অমুকের সন্তানের জন্য বানাচ্ছি। এতে সেই ব্যক্তি বললো, আপনি তো এক আজব মানুষ! সে তো আহ্‌রারী আর জামা'তের চরম বিরোধীতা করে, তার জন্য আপনি এই কাপড় তৈরী করছেন? জবাবে তিনি বললেন, যদি সে দুষ্কৃতি করে তবে আল্লাহ্ তা'লাই আমাদের সুরক্ষা করেন আর যতক্ষণ তিনি (আল্লাহ্) আমাদের সাথে থাকেন বিরুদ্ধবাদীদের শত্রুতা আমাদের কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। কিন্তু এই ব্যক্তি অভাবী। তার নিজের ছেলে-মেয়ে ও নাতি-নাতনীদের পড়নের কাপড়ের সংস্থান করার সাধ্য তার নেই। আর তাকে অভাবী মনে করে আমি তার জন্য এসব কাপড় বুনছি। তুমি যে আপত্তি করছো, তাই তোমার শাস্তি হলো এটাই যে, আমার এই কাপড় তৈরী করা হয়ে গেলে, এই কাপড় তোমাকেই তার বাড়িতে গিয়ে পোঁছে দিয়ে আসতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি সাবধান করে দিয়ে একথাও বলে দিলেন যে, সে তো আহ্‌রারী, অন্য আহ্‌রারীদেরও এর প্রতি দৃষ্টি থাকবে, এ জন্য রাতের বেলায় যাবে যাতে তাকে কেউ আহমদীদের কাছ থেকে কাপড় নেয়ার কারণে কষ্ট না দেয়। (আসহাবে আহমদ, ১১তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৫-১৭৬)

আবার বিধবা ও এতিমদের দেখাশোনা তাঁর পছন্দনীয় বিনোদন ছিল। লেখক বলছেন, এতিম কনেদের জেহেয (বরের বাড়ী পাঠানোর প্রস্তুতিমূলক সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি) অত্যন্ত যত্ন সহকারে স্বহস্তে তৈরী করতেন, কনের পোশাক-আশাকও বানিয়ে দিতেন। (আসহাবে আহমদ, ১১তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৬)

অনুরূপভাবে, হযরত মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব (রা.)-ও এতিমদের দেখাশোনার প্রতি গভীর মনোযোগী ছিলেন। 'দারুল ইয়াতামা' ছিল যা 'দারুল শুইয়ূখ' আখ্যায়িত হতো। তাঁর সম্পর্কে বর্ণনায় এসেছে যে, একবার তিনি প্রবল জ্বরের কারণে বিশ্রামরত ছিলেন, তাপমাত্রা খুব বেশি ছিল আর

দুর্বলতাও ছিল। কর্মচারী এসে বললো, খাবারের জন্য চাল-আটার ঘাটতি রয়েছে আর কোন ভাবেই ব্যবস্থা হচ্ছে না, সকাল থেকে ছেলেরা নাস্তাও করেনি। তিনি বললেন, অবিলম্বে টাঙ্গা (টমটম-গাড়ি) নিয়ে আস আর তিনি টাঙ্গায় উঠে স্বচ্ছল লোকদের বাড়ি বাড়ি যান আর শষ্য সংগ্রহ করে একত্র করেন আর এভাবে সেই ছেলেদের আহারের ব্যবস্থা হয়। এমনটা ছিল আমাদের জ্যেষ্ঠদের আদর্শ, জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায়ও নিজের বিশ্রাম পরিত্যাগ করে এতিম শিশুদের জন্য নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন আর এমনটা কেনই বা হবে না? তাঁদের (রা.) সামনে তো তাদের নিজেদের নেতা ও মনিব (সা.)-এর এই সুসংবাদ ছিল যে, **‘আমি ও এতিমদের দেখাশোনাকারীরা এমনভাবে জান্নাতে সহাবস্থান করব যেভাবে এই দুই অঙ্গুলির অবস্থান। এ বলে তিনি শাহাদত অঙ্গুলী ও মধ্যমাকে যুক্ত করে দেখিয়েছেন।’** অতএব এমনই ছিল আমাদের জ্যেষ্ঠদের দৃষ্টান্ত।

হাফেয মঈনুদ্দিন সাহেব (রা.)-এর প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি দেখতে পেতেন না, দৃষ্টি-শক্তি থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তিনি বলেন, শীতের এক অন্ধকার রাতে কাদিয়ানের কাচা গলি-পথ ছিল খুবই কর্দমাক্ত। অত্যন্ত কষ্টের সাথে পড়ি-মরি করতে করতে তিনি হেঁটে যাচ্ছিলেন। কোন এক বন্ধু জিজ্ঞেস করায় বললেন, ভাই! এখানে একটি মাদী কুকুর বাচ্চা দিয়েছিল, আমার কাছে একটি রুটি রয়ে গেছে, আমি ভাবলাম, বৃষ্টিবাদলের দিন অর্থাৎ, বর্ষণ হচ্ছিল, সেই রুটিটি তাকে দেই। পশুর প্রতিও দয়ার্দ্র হও, নির্দেশের অধীনে এটা ছিল একটি সুন্নতেরই অনুসরণ যা হাফেয সাহেব করেছেন। আর স্মরণ রেখো সেই ঘটনার কথা, যখন কেউ কুঁয়ায় নেমে নিজের জুতায় পানি ভরে কুকুরকে পানি পান করিয়েছিল আর মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা’লা তার এই পুণ্যকর্মের প্রতিদানে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এই কথায় সাহাবীগণ অত্যন্ত বিচলিত হন আর জানতে চান, পশুর প্রতি করা আচরণের জন্যও প্রতিদান পাওয়া যাবে? এতে তিনি (সা.) বলেছেন, হ্যাঁ, প্রত্যেক জীবের জীবন রক্ষায় পুণ্য রয়েছে আর এই দয়ার্দ্রতার জন্য প্রতিদান পাওয়া যায়।

আরও একটি ঘটনা, এক আহমদী হযরত নূর মোহাম্মদ সাহেবের সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রচণ্ড শীতের মৌসুম ছিল। পরিধান করার মত তার কোন কোট ছিল না আর কম্বলও ছিল না। ওপরে একটি আর নিচে একটি জামা পড়ে রেলগাড়িতে ভ্রমণ করছিলেন। তাঁর চোখে পড়ল যে, এক প্রতিবন্ধি বৃদ্ধ খালি

গায়ে কাঁপছে। তৎক্ষণাৎ তিনি নিজের গায়ের একটি জামা খুলে সেই বৃদ্ধকে পরিয়ে দেন। সঙ্গী হিসেবে একজন শিখও সফর করছিল, এই দৃশ্য দেখে সে বলতে লাগলো, "ভাইয়াজি, তুমি নাজাত পেয়ে গেলে, আমার কি ঘটবে জানা নেই"। (এই ছিল উত্তম আদর্শ)। আবার কয়েক দিন পর যা ঘটলো তাহলো, এই নূর মোহাম্মদ সাহেবই নতুন একটি কম্বল গায়ে দিয়ে মুঘলপুরার মসজিদ বায়তুয যিক্‌রে ফজরের নামাযের জন্য আসেন আর দেখতে পান, ফতেহ্ দ্বীন নামে এক ব্যক্তি, যে কোন কালে খুব বিত্তশালী ছিল, অসুখ-বিসুখ আর দারিদ্রের কারণে শীতে কাঁপছে, নূর মোহাম্মদ সাহেব এটি দেখামাত্রই নতুন কম্বলটি নিজের গা থেকে খুলে তার গায়ে জড়িয়ে দেন। (রূহ পরওয়ার ইয়াদে, পৃষ্ঠা ৬৮৭)

১৯৪৭ সনে পাকিস্তানের জন্মলগ্নে, লক্ষ লক্ষ শরণার্থী সর্বস্ব হারিয়ে দলে দলে কাদিয়ান অভিমুখে যাত্রা করতো। সে সময় অবস্থা ছিল খুবই দুর্বিষহ। মুসলমান নারীদের মান-সম্ভ্রম রক্ষা পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা ছিল না আর সব মুসলমানরা ভাবছিল যে, কাদিয়ানে পৌঁছাতে পারলেই আমরা নিরাপদ। তখন জামা'তের যেসব সদস্য সেখানে অবস্থান করছিলেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)-কে সেই সময় হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সেখানে ইনচার্জ নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। অতএব, আগমণকারী সবাই যারা অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় সেখানে পৌঁছুচ্ছিল, যাদের কারো কারো পরিধানের মত তেমন কোন কাপড়-চোপড়ও ছিল না, হুযূর সর্বপ্রথম নিজ গৃহের আর আত্মীয়-স্বজনদের বাক্সে তুলে রাখা কাপড়চোপড় বের করে তাদেরকে দেন। অতঃপর এক বিশেষ ব্যবস্থাধীনে শরণার্থীদের কাফেলা যাত্রা শুরু করে আর পর্যায়ক্রমে পাকিস্তানে পৌঁছতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে খুবই সুরক্ষাপূর্ণ ব্যবস্থায় তারা সেখানে পৌঁছতে থাকে আর এভাবে আহমদীরা নিজেদের জীবন বাজি রেখে সেসব লোকের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আতের শর্তাবলীর মধ্যে একটি হলো, আমরা এই অঙ্গীকারের সাথে জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি যে, বয়আত করার পর এখন আমাদের নিজের বলতে আর কিছুই রইল না। এখন সমস্ত আত্মীয়তা আর যাবতীয় সম্পর্ক শুধু ঐ সময় পর্যন্ত অটুট থাকবে যতক্ষণ তারা জামা'তের ব্যবস্থাপনা ও হুযূর আকদাস (আ.)-এর ব্যক্তি সত্তার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। কোন আত্মীয়তা, কোন সম্পর্ক আমাদেরকে হুযূর (আ.) থেকে দূরে

নিয়ে যেতে পারবে না। আমরা তো তারই দুয়ারের ভিক্ষুক আর এটিই আমাদের কাছে অগ্রগণ্য। অতএব, এই অঙ্গীকার রক্ষা করা হয়েছে আর খুব ভালোভাবেই করা হয়েছে। এরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছিঃ আর অধিকাংশই এমন, যেগুলো যুগ-ইমাম স্বয়ং নিজ ভাষায় অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "একইভাবে রয়েছেন আমাদের আন্তরিক বন্ধু মৌলভী মোহাম্মদ আহসান সাহেব আমরোহী, যিনি এই জামা'তের সমর্থনে ও সাহায্যার্থে উন্নত মানের সব প্রকাশনায় সোৎসাহে অংশ নিয়েছেন। এছাড়া সাহেবযাদা পীরজী সিরাজুল হক সাহেব তো হাজার হাজার মুরিদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এখানকার দরবেশী জীবনকেই অবলম্বন করে নিয়েছেন। তেমনি মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সাহেব সানৌরি ও মৌলভী বুরহানুদ্দীন সাহেব ঝিলমী, এবং মৌলভী মোবারক আলী সাহেব শিয়ালকোটি আর কাজী জিয়াউদ্দিন সাহেব কাজীকোটি ও মুন্সী চৌধুরী নবী বক্স সাহেব বাটালা, জেলা গুরুদাসপুর ও মুন্সী জালাল উদ্দিন সাহেব ইয়ালানী প্রমুখগণ নিজ নিজ সাধ্যসামর্থ্য অনুযায়ী ধর্ম সেবায় রত আছেন। আমি আমার জামা'তের ভালোবাসা ও নিষ্ঠা দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ি, তাদের মধ্যে অত্যন্ত স্বল্প উপার্জনশীল ব্যক্তিবর্গ যেমন মিয়াঁ জামাল উদ্দিন, খাইরুদ্দীন, ইমাম দ্বীন কাশ্মিরী, আমার গ্রামের নিকটেই বসবাস করেন, এরা নিতান্তই দরিদ্র ভাই, যারা সম্ভবত দৈনিক তিন আনা বা চার আনায় শ্রমিকের কাজ করা সত্ত্বেও উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে নিয়মিত মাসিক চাঁদা প্রদানে অংশ নেন। তাদেরই বন্ধু, মিয়াঁ আব্দুল আযীয পাটোয়ারীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাতেও আমি চমৎকৃত হই যে, জীবনজীবিকার সংকীর্ণতা সত্ত্বেও একদিন একশ' রুপি দিয়ে গেছেন আর বলেছেন, আমি চাই এই শত রূপি খোদার পথে ব্যয় হোক। এই গরিব ভাই সম্ভবত বেশ কয়েক বছরে এই অর্থ জমা করে থাকবেন। তবে ধর্মসেবার অনুপ্রেরণায় খোদার সন্তুষ্টি লাভ তাদেরকে উজ্জীবিত করেছে। (আনজামে আথম, রূহানী খাযায়েন, ১১তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৩-৩১৪)

তিনি (আ.) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) প্রসঙ্গে বলেন, অঢেল সম্পদ থেকে অনেককেই আমি খোদার রাস্তায় স্বল্পপরিমাণ ব্যয় করতে দেখেছি, তবে নিজে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থেকে নিজের প্রিয় সম্পদ খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে উজাড় করে দেওয়া আর নিজের জন্য এ জগতে কিছুই

না বানানোর এই বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণরূপে আমি দেখেছি, সম্মানিত মৌলভী সাহেবের মাঝে... তাঁর সম্পদে যেভাবে আমি উপকৃত হয়েছি আজ পর্যন্ত এর কোন দৃষ্টান্ত আমার কাছে নেই। (নিশানে আসমানী, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৮)

আবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল মৌলানা নুরুদ্দীন সাহেব (রা.) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সমীপে লিখেন 'আমি আপনার সমীপে আত্মোৎসর্গ করছি, যা কিছু আমার, তা আমার নয় বরং আপনার। হযরত পীর ও মুর্শিদ– আমি পরিপূর্ণ সততার সাথে নিবেদন করছি, আমার যাবতীয় অর্থকড়ি, ধনসম্পদ ধর্ম প্রচারের কাজে ব্যয়িত হলে আমি আমার অভিষ্ঠ পেয়ে গেছি।' (ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬)

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব প্রসঙ্গে বলেন, "**হিব্বী ফীল্লাহ্** (খোদার পথে আমার বন্ধু)! মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব, একজন ন্যায়পরায়ণ যুবক, স্বল্পভাষী, নিষ্ঠাবান, সূক্ষ্মচিন্তার অধিকারী ব্যক্তি (অর্থাৎ খুবই সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখেন)। তাঁর ভেতর অবিচলতার জ্যোতি বিদ্যমান। বিশ্বস্ততার নিদর্শন ও লক্ষণাবলী বিরাজমান। প্রমাণিত সত্যের উত্তম ব্যুৎপত্তি রাখেন আর এর স্বাদ তিনি আস্বাদন করে থাকেন। আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা তিনি পোষণ করেন এবং শিষ্টাচার যা যাবতীয় কল্যাণ লাভের ভিত্তি আর সুধারণা যা এই পথে সফলতার বাহন, এই উভয় জীবনাচার তার মাঝে পাওয়া যায় **জাযাহুমুল্লাহ খায়রুল জাযা**, (অর্থাৎ আল্লাহ্ তাকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন– অনুবাদক) (অর্থাৎ কল্যাণ মণ্ডিত হওয়া আর সুধারণা করা, উভয় গুণাবলীই তার মাঝে বিদ্যমান)।"

আবার হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সানৌরি (রা.) প্রসঙ্গে বলেন, "**হিব্বী ফীল্লাহ্** (খোদার পথে আমার বন্ধু)! মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সানৌরি (রা.) সৎ ও ন্যায়পরায়ণ যুবক ছিলেন। আমার সাথে তার নিজ স্বভাবগত সামঞ্জস্যের কারণে সে আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। আমি বিশ্বাস রাখি, তিনি সেসব বিশ্বস্ত বন্ধুর অন্তর্গত যাদের জন্য দোদুল্যমানতার পরীক্ষায় নিপতিত হওয়া অসম্ভব" অর্থাৎ, কোন পরীক্ষাই তাদের নিজ অবস্থান থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। "বিভিন্ন সময়ে সে দুই-দুই, তিন-তিন মাস পর্যন্ত বরং এরও চেয়ে বেশি সময় ধরে আমার সাহচর্যে অবস্থান করে এবং আমি গভীরভাবে তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছি" অর্থাৎ আমি গভীর

ভাবে লক্ষ্য করে আসছি। "অতএব আমার পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি এর গভীরে অবগাহন করে যা কিছু উদ্ধার করেছে, তা হলো এই যুবক প্রকৃতই আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার এক গভীর প্রেরণা রাখে আর আমার সাথে এতটা ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে যে, এটা ছাড়া আর অন্য কোন কারণ নাই যে, তার অন্তরে এই দৃঢ়বিশ্বাস ঘর বেঁধেছে যে, এই ব্যক্তি [অর্থাৎ মসীহ্ মওউদ (আ.)] খোদা ও রসূল (সা.)-এর প্রেমিকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।" (ইজালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন,৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩১)

অতঃপর, হযরত মুন্সী আরোড়া সাহেব (রা.) প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"**হিব্বী ফীল্লাহ্** (যাকে খোদার খাতিরে ভালোবাসি)! মুন্সী মোহাম্মদ আরোড়া সাহেব হলেন, ম্যাজিস্ট্রেটের নকশাকার (ড্রাফট্সম্যান)। মুন্সী সাহেব ভালোবাসা নিষ্ঠা ও আত্মনিবেদনে প্রাণ-প্রাচুর্যপূর্ণ এক ব্যক্তিত্ব। সত্য-প্রেমিক আর সত্য বুঝতে তাঁর সময় লাগে না। সেবা-কর্মকে একান্ত উদ্দীপনার সাথে পালন করেন আর খুবই আনন্দের সাথে সমাধা করেন। বরং তিনি তো দিনরাত খেদমতের সুযোগ সন্ধানে নিমগ্ন থাকেন। বিস্ময়কর এক উদার মনের মানুষ, অর্থাৎ খোলামনে সত্য গ্রহণকারী ও আত্মোৎসর্গকারী ছিলেন। আমি লক্ষ্য করেছি, এই অধম [মসীহ্ মওউদ (আ.)]-এর সাথে তার এক প্রেমময় সম্পর্ক রয়েছে। নিজস্ব শক্তিসামর্থ্য, অর্থকড়ি আর নিজ সত্তার প্রতিটি শক্তিবৃত্তি দিয়ে কোন না কোন সেবার সুযোগ লাভ করার চেয়ে সম্ভবত তার জন্য বড় আনন্দের বিষয় আর কোন কিছু হবে না। মনেপ্রাণে তিনি হলেন বিশ্বস্ত, অবিচল ও সাহসী এক ব্যক্তি। সর্বাবস্থায় বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখেন আর তিনি ঈমানে দৃঢ় ও এক নির্ভীক ব্যক্তি। খোদা তা'লা তাকে উত্তম প্রতিদান দিন"। (আমীন)

অতঃপর, তিনি (আ.) আরও বলেন, "**হিব্বী ফীল্লাহ্** (যাকে খোদার খাতিরে ভালোবাসি)! মিয়াঁ মোহাম্মদ খান সাহেব কপুরথলা ষ্টেটে চাকুরীরত আছেন। অত্যন্ত বিনয়ী, স্বচ্ছহৃদয়, সূক্ষ্ম চিন্তাশীল ও সত্যপ্রেমিক অর্থাৎ সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি সম্পন্ন, সত্যসচেতন ও সত্যপরায়ণ ও সত্যপ্রেমিক ব্যক্তি ছিলেন। আমার প্রতি তার যে কী পরিমান ভালোবাসা, আত্মনিবেদন ও সুধারণা রয়েছে তা কল্পনাতীত! তার ব্যাপারে আমার কোন আশঙ্কা ও ভয় নেই যে, আমার প্রতি তার এই ভালোবাসা কখনও কুধারণার শিকার হতে পারে বরং আমি চিন্তিত

যে, এটি সীমা না অতিক্রম করে বসে। প্রকৃতই তিনি একজন বিশ্বস্ত, উৎসর্গীকৃত ও দৃঢ়চিত্ত এক ব্যক্তি। আল্লাহ্ তার সাথী হোন, তার ছোট ভাই, সর্দার আলী খানও বয়আত করে আমাদের জামা'তভুক্ত হয়েছে। তার ভাইয়ের ন্যায় এই যুবকও অত্যন্ত পুণ্যবান ও সুস্থ চিন্তাধারা রাখে। অর্থাৎ অত্যন্ত নেক ও সঠিক পথের অনুসারী। আল্লাহ্ তা'লা তাদের উভয়কেই নিরাপদ রাখুন"। (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩২)

তিনি (আ.) আরও বলেন, "পটিয়ালার সামানা অঞ্চলের রঈস আমার অত্যন্ত প্রিয় ভাই, মরহুম মির্যা আজম বেগ সাহেব, তাঁর বিয়োগ-বেদনায় আমরা শোকে মুহ্যমান। তিনি হিজরী ১৩০৮ সনের রবিউস সানী মাসের ২ তারিখে ইহজগত ত্যাগ করে পরলোকবাসী হয়েছেন, *ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন* (অর্থাৎ, নিশ্চয় সবই আল্লাহ্‌র আর তাঁরই দিকে আমরা প্রত্যাবর্তন করব– অনুবাদক), খোদা তাকে মার্জনা করুন। *"আল আইনু তাদমাউ ওয়াল কালবু ইয়াহযুনু ওয়া ইন্না বিফিরাকিহি লা মাহযুনুন"* (অর্থাৎ চোখ হতে অশ্রুপ্রবহমান, অন্তর দুঃখভারাক্রান্ত আর আমরা তাকে হারিয়ে শোকাকুল)। মির্যা সাহেব মরহুম, আমার প্রতি আল্লাহ্‌র খাতিরে যে একান্ত ভালোবাসা পোষণ করতেন আর যেভাবে আমাতে নিবেদিত হচ্ছিলেন সেই প্রেমময় অবস্থা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। তার অকাল মৃত্যুতে আমি এতটাই মর্মাহত যে, অতীতে এমন অনুভূতি খুব বিরলই আমার লাভ হয়েছে। তিনি আমাদের আনন্দ ও আমাদের নেতা ছিলেন অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিতে তার মহান মর্যাদা রয়েছে, উন্নতির পথে তিনি ছিলেন খুবই অগ্রগামী। তাঁর ভেতর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য ছিল। যিনি দেখতে দেখতেই আমাদের মাঝখান থেকে চলে গেলেন। যতদিন আমরা জীবিত থাকবো তার বিরহবেদনা আমরা ভুলতে পারবো না। তার বিরহে মনে উদাসভাব, উৎকণ্ঠার আতিশয্যে বুকে এক শুণ্যতা বিরাজ করে আর চোখ বেয়ে নামে অশ্রু-ধারা। তার পুরো সত্ত্বা ছিল ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। মরহুম মির্যা সাহেব প্রেমাতিশয্য প্রকাশে খুবই সাহসী ছিলেন।" (ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯)

হযরত কাজি জিয়াউদ্দিন সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সামনেই এই বিবৃতি দিচ্ছিলেন– একান্ত নিবেদিত দোয়া হলো, হে আমার নেতা ও মনিব! আমি আমার অন্তরে পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারা তরঙ্গায়িত হতে দেখছি। এক দিকে তো আমি খুবই নিষ্ঠার সাথে আকাঙ্খা পোষণ করি, হুযূর (আ.)-এর

সত্যতা ও আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে বহির্জগৎ শীঘ্র আলোকজ্জ্বল হয়ে উঠুক, সকল জাতি ও সকল ধর্মবিশ্বাসের মানুষ এসে এই ঝর্ণাধারা থেকে পান করে পরিতৃপ্ত হোক, যা আল্লাহ্ তা'লা এখানে উৎসারিত করেছেন। অপরদিকে, এই সদিচ্ছার পাশাপাশি এই ধারণায় আমার অন্তর একান্তই দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে যে, অন্যান্য লোকেরাও যখন হুযূর (আ.)-এর সত্যতা জেনে যাবে, বুঝে যাবে তখন তারা অনেক সংখ্যায় এখানে আসতে থাকবে, তাহলে তো সেই সময়, হুযূর (আ.) অন্যান্য লোকদের বাড়ি ঘরেও যেতে থাকবেন আর এতে আপনার পবিত্র সাহচর্য এবং নৈকট্য যেভাবে লাভ হচ্ছে তার কল্যাণ ও স্বাদ থেকে আমি বঞ্চিত হয়ে যাব।

হে আমার পথপ্রদর্শনকারী হুযূর! আমার প্রিয় নেতা ও মনিবের সাহচর্যে বসা, কথাবার্তা বলার যে আনন্দদায়ক সৌভাগ্য লাভ হচ্ছে তা থেকে তো আমি বঞ্চিত হয়ে যাব। এমন বহুমুখী চিন্তাচেতনা আমার মানসপটে অহরহ উদিত হয়ে চলছে।

কাজী সাহেব বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার এসব কথা শুনে মুচকি হাসেন। (আসহাবে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০)

কাজী জিয়া উদ্দীন সাহেব (রা.)-এর আরও একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। কাজী আব্দুর রহীম সাহেব (রা.) লোকদের শোনাতেন, একবার পিতা মহোদয় আনন্দের সাথে বলেন, আমি ওযু করছিলাম, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে তাঁর (আ.) সেবক হযরত হাফেয হামেদ আলী সাহেব (রা.), আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে যে, এই ব্যক্তি কে? উত্তরে হুযূর (আ.) আমার নাম ঠিকানা জানানোকালে এই কথাও বলেন যে, এই ব্যক্তি আমার প্রেমিক। কাজী সাহেব (রা.) এ বিষয় নিয়ে গর্ব করতেন আর (বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে) বলতেন, 'হুযূর (আ.) আমার অন্তরের অবস্থা কি করে জানতে পারলেন?' এটা ছিল সেই প্রেমানুরাগেরই বহিঃপ্রকাশ যে, কাজী সাহেব তার নিজের মৃত্যুকালে নিজ সন্তানদেরকে ওসীয়্যত করেছিলেন, 'খুবই কষ্ট করে আমি তোমাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দ্বারে নিয়ে এসেছি, এখন আমার মৃত্যুর পর এই দ্বার কক্ষনও পরিত্যাগ করবে না'। ফলে, তাঁর (রা.) সন্তানরাও এ কথার ওপর পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। (আসহাবে আহমদ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৮-৯)

হযরত মৌলভী নিয়ামত উল্লাহ্ সাহেবকে ১৯২৪ সনে কাবুলে শহীদ করা

হয়। শাহাদত লাভের পূর্বে তিনি জেলখানা থেকে এক আহমদী বন্ধুকে পত্র লিখেন, আর সেই পত্রে উল্লেখ করেন, "আমি জেলখানায় প্রতিটি মুহূর্তে খোদার সমীপে এই দোয়ায় রত থাকি যে, হে আমার উপাস্য! এই অযোগ্য বান্দাকে ধর্মের কাজে সাফল্য দান কর। আমি কারাভোগের জীবন হতে মুক্তি লাভ বা মৃত্যুযন্ত্রণা এড়ানোর জন্য লালায়িত নই বরং আমি এটিই নিবেদন করছি যে, হে আমার পরম উপাস্য! এই অধমের অস্তিত্বের প্রতিটি কণা ইসলামের জন্য নিবেদিত হোক"। (তারিখে আহমদীয়াত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৫০)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি সুগভীর অনুরাগ

আবার বয়আতের এই দশম শর্তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে এমন এক নিবিড় সম্পর্ক বন্ধনের কথা বলা হয়েছে, যা হবে অতুলনীয়। এ সম্পর্কে সৈয়দ আব্দুস সাত্তার শাহ্ সাহেবের একটি ঘটনা রয়েছে। ১৯০৭ সনে যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কনিষ্ঠ পুত্র সাহেবযাদা মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারাত্মক টাইফয়েডে আক্রান্ত হন। ঐ দিনগুলোতে কোন একজন স্বপ্নে দেখেছিলেন, মোবারক আহমদের বিয়ে হচ্ছে। আর স্বপ্নবিশারদরা লিখেছেন, অপরিচিত নারীর সাথে বিয়ে হওয়া দেখলে এর অর্থ হয় মৃত্যু। তবে স্বপ্নবিশারদদের কারো কারো মতে এমন স্বপ্ন যদি বাস্তবে পূর্ণ করে দেয়া হয় তবে কখনো কখনো তা টলেও গিয়ে থাকে। অতএব, স্বপ্ন দর্শনকারী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে স্বপ্ন শোনালে তিনি (আ.) বলেন, "এর ব্যাখ্যা মৃত্যুই, তবে বাস্তবে পূর্ণ করে দেয়া হলে কখনো কখনো স্বপ্নের এই অর্থ টলে যায়। এ কারণে এসো মোবারক আহমদের বিয়ে দিয়ে দেই। অতএব, সেই শিশু, যার বিয়েশাদির কোন ধারণাই ছিল না, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার বিয়ের ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়েন। যে সময় হুযূর (আ.) এসব কথাবার্তা বলছিলেন, ঘটনাচক্রে সে সময়ে হযরত ডাক্তার সৈয়দ আব্দুস সাত্তার শাহ্ সাহেব (রা.)-এর স্ত্রী সৈয়দা সায়েদাতুন নেসা বেগম সাহেবাকে উঠানে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখা যায়, যিনি সেখানে অতিথি হিসেবে এসেছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে ডেকে বলেন, আমার মোবারক আহমদকে বিয়ে করাতে চাই। আপনার কন্যা মরিয়ম রয়েছে, আপনি যদি পছন্দ করেন তাহলে তার সাথে মোবারক আহমদের বিয়ে দেয়া যায়। তিনি বললেন, হুযূর এতে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে হুযূর! কিছু সময় দিলে ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে নিই। সেই

দিনগুলোতে ডাক্তার সাহেব মরহুম এবং তার পরিবার-পরিজন গোল কামরায় থাকতেন। তিনি (অর্থাৎ, ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী) নিচে যান। ডাক্তার সাহেব সম্ভবত সেখানে ছিলেন না, হয়তো বাহিরে কোথাও গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তিনি (অর্থাৎ, ডাক্তার সাহেব) ফিরে আসেন। ডাক্তার সাহেব এলে, তিনি (অর্থাৎ, তার স্ত্রী) তার সাথে এইভাবে কথা শুরু করেন যে, আল্লাহ্ তা'লার ধর্মে কেউ প্রবেশ করলে তার ঈমানেরও পরীক্ষা হয়। আল্লাহ্ তা'লা যদি আপনার ঈমানের পরীক্ষা নেন তাহলে কি আপনি এই বিশ্বাসে অবিচল থাকবেন? এই সময় তার (অর্থাৎ, ডাক্তার সাহেবের বেগমের) চিন্তার দু'টো ধারা প্রবহমান ছিল এ কারণে যে, ডাক্তার সাহেব হয়তো এই আত্মীয়তায় দ্বিধা প্রকাশ করবেন। প্রথমত ইতঃপূর্বে তাদের পরিবারের কোন মেয়ের সৈয়দ বংশের বাইরে বিয়ে হয় নি। আর দ্বিতীয়ত মাবারক আহমদ এক প্রাণহারী রোগে আক্রান্ত; ডাক্তার সাহেব মরহুম স্বয়ং তার চিকিৎসা করছিলেন। আর এই কারণে তিনি ভাবতে পারেন যে, এই বিয়ে ৯৯ শতাংশ ঝুঁকিপূর্ণ। আর এর ফলে মেয়ের কপালে অতি শীঘ্র বৈধব্যের তিলক লেগে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এইসব আশঙ্কা থেকে ডাক্তার সাহেবের গৃহিণীর এই ধারণা ছিল যে, ডাক্তার সাহেব কোথাও কখনও ঈমানে না আবার দুর্বলতা দেখিয়ে বসেন আর এতে তার ঈমান না ধ্বংস হয়ে যায়, এজন্য তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহ্ তা'লা ঈমানের পরীক্ষা নিতে চাইলে তিনি কি তাতে দৃঢ়চিত্ত থাকবেন? উত্তরে ডাক্তার সাহেব বলেন, আমি মনে করি, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ঈমানে দৃঢ়তা দান করবেন।

এ কথার পর মরিয়ম বেগমের মাতা (মরহুমা) এই প্রসঙ্গে তার নিজের কথা জানিয়ে বলেন, আমি ওপরে গেলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রস্তাব দেন যে, মোবারক আহমদের সাথে মরিয়মের বিয়ে দিন। এই কথা শুনে ডাক্তার সাহেব বললেন, ভাল কথা! হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যদি একে পছন্দ করেন তাহলে আমাদের কী আর আপত্তি থাকতে পারে? তার এই উত্তর শুনে মরিয়ম বেগমের মরহুমা মাতার (আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা সর্বদা বৃদ্ধি করতে থাকুন,) চোখ বেয়ে বাঁধভাঙ্গা কান্নায় অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। এতে মরহুম ডাক্তার সাহেব তাকে জিজ্ঞাসা করেন, হলোটা কী, তোমার বিয়ের এই সম্বন্ধ পছন্দ নয় কি? তিনি বলেন, এটা আমার পছন্দ। কথা হলো, যখন থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিয়ের এই প্রস্তাব দিয়েছেন আমার বুক (হৃদয়) ধড়ফড় করছিল, আর আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে,

আপনার ঈমান না আবার ধ্বংস হয়ে যায়। আর এখন আপনার উত্তর শুনে আমি আনন্দে অশ্রু আর ধরে রাখতে পারছি না। ফলে এই বিয়ে হয়ে গেল। আর কয়েকদিন পর (যেহেতু রোগটি ভয়ানক ছিল) ঐ মেয়েটি বিধবা হয়ে যায়। দেখুন! আল্লাহ্ তা'লাও ডাক্তার সাহেবের নিষ্ঠা বিফলে যেতে দেন নি, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সাথে তার এই কন্যার বিয়ে হয়, আর তিনি হযরত উম্মে তাহের মরিয়ম সিদ্দিকা (রা.) নামে পরিচিতি লাভ করেন। (দৈনিক আল্ ফযল, কাদিয়ান, ১ আগষ্ট ১৯৪৪, পৃষ্ঠা ১-২ এবং সীরাত সৈয়দ আব্দুস সাত্তার শাহ্, পৃষ্ঠা ১২২-১২৪)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতিফ শহীদ সাহেব (রা.) সম্পর্কে লিখেন, "এই দিনগুলোতেই যখন অবিরাম ধারায় খোদার ওহী আমার প্রতি অবতীর্ণ হয় এবং অত্যন্ত প্রতাপান্বিত ও শক্তিশালী নিদর্শন প্রকাশিত হয় এবং আমার মসীহ্ মওউদ হওয়ার দাবি দলিল-প্রমাণসহ পৃথিবীতে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়, তখন ঘটনাক্রমে কাবুলের খোস্ত অঞ্চলের আখুয়ান্দযাদা মৌলভী আব্দুল লতিফ নামে একজন বুযূর্গের কাছে আমার পুস্তকাদি পৌঁছায়। সেসব দলিল-প্রমাণ, যা আমি পূর্ববর্তী পুস্তকাবলীর বরাতে এবং ঐশী সাহায্যের মাধ্যমে যুক্তি-প্রমাণ নিজের পুস্তকাদিতে লিপিবদ্ধ করেছিলাম, (অর্থাৎ, খোদার সাহায্যের কারণে আমি আমার পুস্তকাবলীতে লিপিবদ্ধ করেছি) ঐসব দলিল-প্রমাণ তাঁর গোচরীভূত হয়। যেহেতু সেই পুণ্যাত্মা পরম পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী, অন্তর্দৃষ্টিস্পন্ন জ্ঞানী, খোদাভীরু ও মুত্তাকী ছিলেন, সেহেতু তার হৃদয়ে এসব দলিল-প্রমাণের গভীর প্রভাব পড়ে এবং এই দাবির সত্যায়নে তাঁকে কোন বেগ পেতে হয় নি। তার পবিত্র বিবেক স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকার করে নেয় যে, এই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে মনোনীত এবং এই দাবি সঠিক। তখন তিনি আমার বইপুস্তকগুলো গভীর অনুরাগের সাথে পড়তে শুরু করেন এবং তাঁর অতি স্বচ্ছ ও সত্য গ্রহণেচ্ছু আত্মা আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমনকি আমার সাথে সাক্ষাৎ না করে দূরে বসে থাকা তাঁর জন্য খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। অবশেষে এই শক্তিশালী আকর্ষণ ও অনুরাগ এবং আন্তরিকতার ফল এই দাঁড়াল যে, তিনি কাবুল সরকারের কাছ থেকে অনুমতি লাভের প্রত্যাশায় হজ্জ্ব করার জন্য দৃঢ়সংকল্প করেন এবং এই সফরের অনুমতির জন্য কাবুলের আমীরের কাছে আবেদন করেন। যেহেতু কাবুলের আমীরের দৃষ্টিতে তিনি একজন অতি সম্মানিত আলেম ছিলেন, তাই তাকে কেবলমাত্র অনুমতিই দেয়া হয় নি, বরং

উপহারস্বরূপ কিছু অর্থও প্রদান করা হয়। অতএব, তিনি অনুমতি লাভ করে কাদিয়ানে পৌঁছেন। সেই খোদার কসম করে বলছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার সাথে তার যখন সাক্ষাত হয় আমি তাঁকে আমার আনুগত্যে এবং আমার দাবির সত্যায়ণে এতটা বিলীন দেখতে পেলাম যে, এর চাইতে বেশি (আত্মাবিলীনকারী হওয়া) মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যেভাবে একটি শিশি সুগন্ধি-আতরে পরিপূর্ণ থাকে, অনুরূপভাবে আমি তাঁকে আমার ভালোবাসায় পরিপূর্ণ দেখলাম, তাঁর চেহারার মতই তার হৃদয় আমার কাছে জ্যোতির্ময় মনে হচ্ছিল।" (তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯-১০)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) প্রসঙ্গে বলেন, "আমি এখানে একথা প্রকাশ না করে এবং কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারছি না, খোদা তা'লার কৃপা ও করুণা আমাকে নিঃসঙ্গ পরিত্যাগ করে নি। আমার সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপনকারীগণ এবং খোদা তা'লার নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত এ জামা'তে যোগদানকারীগণ ভালোবাসা ও আন্তরিকতার রঙে বিস্ময়করভাবে রঙীন। আমার নিজের পরিশ্রমে নয়, বরং খোদা তা'লা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে সততায় ভরপুর এসব হৃদয় আমাকে দান করেছেন। সবার আগে আমি আমার এক আধ্যাত্মিক ভাইয়ের নাম উল্লেখ করতে হৃদয়ে প্রেরণা অনুভব করি। তাঁর নাম তাঁরই আন্তরিকতার জ্যোতির ন্যায় 'নূরে দ্বীন'।

তাঁর কোন কোন এমন ধর্মীয় সেবাকে আমি ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখে থাকি, যা তিনি ইসলামের নামকে সমুন্নত করার জন্য নিজের বৈধ ধনসম্পদ অকাতরে ব্যয় করে যাচ্ছেন! হায়! সেসব সেবা যদি আমার দ্বারাও সম্পাদিত হতো। তার হৃদয়ে সত্যধর্মের সমর্থনে কানায় কানায় পরিপূর্ণ যে অদম্য প্রেরণা-উচ্ছাস বিরাজমান, তা ভাবলে ঐশী আকর্ষণী-ক্ষমতার সৌন্দর্যময় চিত্র আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তিনি কিরূপে তাঁর বান্দাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে নেন! তিনি নিজের যাবতীয় ধনসম্পদ, সমস্ত শক্তি ও সম্ভাব্য সকল উপায়-উপকরণসহ (অর্থাৎ, তাঁর হাতে যে ধনসম্পদ রয়েছে তা নিয়ে) আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)এর আজ্ঞা পালনের জন্যে সদা সোচ্চার। কেবল সুধারণার বশবর্তী হয়ে নয়, বরং আমার অভিজ্ঞতামূলে এই সঠিক ও বাস্তব জ্ঞান আমি রাখি যে, আমার ডাকে কেবল ধনসম্পদ কেন বরং প্রাণ এবং সম্মানও উৎসর্গ করে দিতে তিনি কুণ্ঠিত নন। আমি যদি অনুমতি দিতাম তবে

তিনি এ পথে সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে তাঁর আধ্যাত্মিক সাহচর্যের ন্যায় দৈহিক সাহচর্যের তথা সবসময় আমার সংসর্গে থাকার কর্তব্যও পালন করতেন। তাঁর কোন কোন চিঠির কয়েকটি লাইন নমুনাস্বরূপ পাঠকগণের সামনে উপস্থাপন করছি, যেন তারা জানতে পারেন জম্মু রাজ্যের রাজচিকিৎসক আমার প্রিয় ভাই মৌলভী হাকীম নূরুদ্দীন ভেরবী, ভালোবাসা ও আন্তরিকতায় কত (উঁচু মানের) উন্নতি লাভ করেছেন। আর সেই লাইনগুলো হলো :

'মওলানা-মুরশিদানা-ইমামানা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

মহাত্মন! আমি সব সময় হুযূরের সমীপে উপস্থিত থাকার সামর্থ্য লাভের জন্য, আর যুগইমামকে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সংস্কারক করা হয়েছে, সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যাতে অর্জন হয় তার জন্য সর্বদা দোয়ারত থাকি। অনুমতি হলে, চাকুরী ইস্তফা দিয়ে দিন-রাত হুযূরের পবিত্র সাহচর্যে পড়ে থাকবো, বা যদি আদিষ্ট হই তবে হুযূরের দৈহিক সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে বিশ্বময় ঘুরব এবং লোকদেরকে সত্য-ধর্মের দিকে আহ্বান জানাবো আর এ পথেই প্রাণ বিসর্জন দিব। আমি আপনার পথে উৎসর্গীত। আমার যা কিছু আছে তা আমার নয়, বরং আপনার। হযরত পীর ও মুরশিদ! আমি পরম সত্যনিষ্ঠতার সাথে নিবেদন করছি, আমার সমস্ত ধনসম্পদ ধর্ম প্রচারে যদি ব্যয়ীত হয় তবে আমি আমার অভীষ্ট পেয়ে গেলাম।... আপনার সাথে আমার 'ফারুকী' সম্পর্ক রয়েছে। এ পথে সবকিছু উৎসর্গ করার জন্য আমি প্রস্তুত রয়েছি। দোয়া করুন, আমার মৃত্যু যেন সিদ্দীকদের মৃত্যু হয়।'

মৌলভী সাহেবের নিষ্ঠা, দৃঢ়চিত্ততা, তাঁর সহমর্মিতা ও আত্মত্যাগ তাঁর কথায় যেভাবে প্রকাশ পায়, এরও চেয়ে বেশি প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর বাস্তব জীবনাচারে এবং একনিষ্ঠ সেবার মাধ্যমে। তিনি তাঁর পরম ভালোবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ প্রেরণায় তাঁর সবকিছু, এমনকি তাঁর পরিবারের ভরণপোষণের প্রয়োজনীয় যা-কিছু তা সবই এই পথে বিলিয়ে দিতে চান। তার আত্মা, ভালোবাসার আবেগময় উচ্ছ্বাসে তার শক্তির চেয়েও বেশি অগ্রসর হতে তাকে অনুপ্রাণিত করছে। আর তিনি সদাসর্বদা, প্রতিটি মুহূর্ত সেবায় রত রয়েছেন। (ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫-৩৮)

এক আপত্তিকারীর উত্তরে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন,

"আপনি বলে থাকেন, কেবলমাত্র এক ব্যক্তি হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব এই জামা'তে ব্যবহারিক আচারআচরণে উন্নত, অন্যরা এমন বা তেমন। আমি জানি না, আপনি এই মিথ্যা অপবাদের কী উত্তর খোদার কাছে দেবেন। আমি শপথ করে বলতে পারি, অন্ততপক্ষে এক লাখ লোক আমার জামা'তে এমন রয়েছে যারা সর্বান্তকরণে আমার ওপর ঈমান এনেছে আর সময়োপযোগী সৎকর্মও করে চলছে। কথা শোনাকালে তারা এত কাঁদেন যে, কাঁদতে কাঁদতে তাদের বুক পর্যন্ত ভিজে যায়। আমি আমার হাতে বয়আতকারী হাজার হাজার মানুষের মাঝে এমন পবিত্র পরিবর্তন দেখে থাকি, যা মূসা নবীর অনুসারীদের চেয়ে হাজার গুণ ভালো মনে করি, যারা তাঁর (মূসা আ.) জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল। আমি তাদের (বয়আতকারীদের) চেহারায় সাহাবীদের অনুরূপ বিশ্বাস ও আত্মশুদ্ধির জ্যোতি দেখতে পাই। হ্যাঁ, প্রকৃতিগত অলসতা ও দুর্বলতার কারণে আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে, বিরল কেউ যদি কিছুটা পিছিয়ে থাকে তবে তা ব্যতিক্রমই বটে।"

তিনি (আ.) আরও বলেন, "আমি প্রত্যক্ষ করছি, আমার জামা'ত সৎকর্মে ও আত্মশুদ্ধিতে যে পরিমান উন্নতি সাধন করছে সেটাও এক নিদর্শন, হাজার হাজার মানুষ আন্তরিকতার সাথে নিজেদের উৎসর্গ করে রেখেছে। তাদেরকে যদি বলা হয় যে, আজ নিজেদের যাবতীয় ধনসম্পদ ও সহায়সম্বলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর, তবে তারা তা করতেও প্রস্তুত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদেরকে আরো অধিক উন্নতি করার বিষয়ে আমি অণুপ্রাণিত করে থাকি, তাদের সদগুণের কথা তাদের সচরাচর শুনাই না, কিন্তু মনেপ্রাণে আমি খুবই প্রীত"। (সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৫)

নিষ্ঠাবান মান্যকারীদের সন্তানসন্ততির দায়িত্ব

এ তো মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত, যা আমি তুলে ধরেছি। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রিয় এই জামা'তে এমন হাজার হাজার বরং লাখ লাখ দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর নিজ যুগে লাখ লাখ সংখ্যার কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এখনতো সে সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে, যারা নিজেদের নিষ্ঠা ও ত্যাগের বড় বড় উঁচু সব মান প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অনেকেই এমন আছেন যাদের বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা, সম্পর্কবন্ধন, প্রেমানুরাগ ও আনুগত্যের ঘটনা প্রকাশিত হয় না। এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী

লোকেরা নীরবে আসেন আর প্রেম, অনুরাগ, সুসম্পর্ক, বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অগোচরেই চলে যান। এমন নিষ্ঠাবান ধর্মপরায়ণদের সন্তানদের উচিৎ তাদের নিজেদের ধর্মপরায়ণ পূর্বপুরুষদের ঘটনাবলীসমূহ লিপিবদ্ধ করে রাখা, আর জামা'তের কাছেও তা সংরক্ষিত করানো। নিজেদের প্রজন্মকেও জানাতে থাকুন যে, আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ, প্রবীণ ধার্মিকগণ উঁচু মানের এসব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন আর তাদের সেই ঐতিহ্য আমাদেরও ধরে রাখতে হবে। আমরা যেখানে আমাদের প্রবীণদের ঈর্ষা করি, কীভাবে তারা কুরবানী করে যুগইমামের দোয়ার উত্তরাধিকারী হয়েছেন, সেখানে এই বিষয়টিও স্মরণ রাখুন, আজো ঐ দোয়ার ফললাভের সুযোগ বিদ্যমান। আসুন, ক্রমাগতভাবে আমরা সেসব বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা, আনুগত্য, সম্পর্কবন্ধন ও ভালোবাসার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও কল্যাণের উত্তরাধিকারী হই। স্মরণ রাখুন! যতদিন এমন দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হতে থাকবে, ততদিন জাগতিক এসব বিরোধীতা আমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই বাক্য সর্বদা স্মরণ রাখবেন **"জমিন তুমহারা কুছভি বিগার নেহি সাকতি আগার তুমহারা আসমানসে পুখ্তা তা'ল্লুক হো"** (অর্থাৎ, জগৎ তোমাদের কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না– আকাশের সাথে তোমাদের সম্পর্ক যদি সুদৃঢ় হয়– অনুবাদক।)

অ-আহমদী বিজ্ঞজনদের স্বীকারোক্তি

পবিত্র সেসব পরিবর্তন অন্যরাও প্রত্যক্ষ করে স্বীকারোক্তি দিয়েছে। সেসব পরিবর্তন এতই সুস্পষ্ট ছিল যে, তারাও তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। তারা স্বীকার করেছে যে, যুগইমামকে মান্য করে আহমদীদের ভেতর অনেক পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তবুও তাদের এই জপনা যে, 'আমি মানব না'। যাহোক, তাদেরই সেই সব স্বীকারোক্তিমুলক উদ্ধৃতি থেকে কতিপয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

আল্লামা ইকবাল লিখেছেন, "পাঞ্জাবে ইসলামী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের খাঁটি নমুনা, সেই জামা'তের আদলে প্রকাশিত হয়েছে যাদের কাদিয়ানী ফির্কা বলা হয়।" (কওমী যিন্দেগী অর মিল্লাতে ব্যয়যা পর এক ওমরানী নযার, পৃষ্ঠা ৭৪)

আল্লামা নিয়াজ ফতেহপুরী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে লিখেছে, "এটা অস্বীকার করা যায় না যে, সত্যই তিনি ইসলামী চারিত্রিক মূল্যবোধ পুনর্জীবিত করেছেন আর এমন এক জামা'ত সৃষ্টি করে দেখিয়েছেন যাদের আচরিত জীবনকে নিশ্চয় আমরা নবীর জীবনাদর্শের প্রতিফলন বলতে পারি।" (মুলাহেযাতে নিয়াজ ফতেহপুরী, পৃষ্ঠা ২৯)

দিল্লি থেকে প্রকাশিত স্টেট্সম্যান পত্রিকার সম্পাদক লিখেছেন, "কাদিয়ানের পবিত্র শহরে এক ভারতীয় নবী জন্ম লাভ করেছেন, যিনি তাঁর চতুষ্পার্শ্বের পরিবেশকে পুণ্য ও নৈতিকতায় সমৃদ্ধ করেছেন। এই উত্তম গুণাবলী তাঁর মান্যকারী লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনাচরণেও ছাপ ফেলেছে"। (স্টেটসম্যান দিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯)

আব্দুর রহিম আশরাফ আযাদ, আহমদীয়া জামা'তের অভ্যন্তরীণ উন্নতিতে উদ্ভুত বিপ্লব প্রসঙ্গে লিখেছেন, "হাজার হাজার এমন ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যারা এই নুতন বিশ্বাসের জন্য নিজেদের আত্মীয়স্বজনকে পরিত্যাগ করেছেন। জাগতিক ক্ষয়ক্ষতি সয়ে নিয়েছেন আর নিজেদের জীবন ও ধনসম্পদ উৎসর্গ করেছেন... আমরা অকপটে স্বীকার করছি, কাদিয়ানীদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা এমন, যারা একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে একে সত্য জ্ঞান করে, এর জন্য ধনসম্পদ ও প্রাণ এবং জাগতিক সহায়সম্বল এবং সকল সম্পর্ককে বিসর্জন দেয়। এরাই এমন যাদের কোন কোন ব্যক্তিত্ব কাবুলে মৃত্যুদণ্ডকে সানন্দে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছে আবার কেউ কেউ সুদূর বহির্বিশ্বে দারিদ্রক্লীষ্ট জীবন অবলম্বন করছে।" (সাপ্তাহিক আল মিম্বর, লায়ালপুর, ২রা মার্চ, ১৯৫২, পৃষ্ঠা ১০)

এতদসত্ত্বেও ঐসব লোকদের দুর্ভাগ্য যে, মেনে নেয়ার সৌভাগ্য তাদের হয় নি। আলহামদুলিল্লাহ, সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র, তাদের এই স্বীকারোক্তি আমাদের ঈমানকে সুদৃঢ় করেছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ঈমান ও বিশ্বাসে উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুন। আর আমরা যেন বয়আতের অঙ্গীকারের প্রতিটি শর্ত নিজেদের জন্য আবশ্যক মনে করে, এর প্রতিপালনকারী ও আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উত্তরাধিকারী হই– একান্তভাবে এ দোয়াই থাকবে। (আমীন!)

CONDITIONS OF BAI'AT

AND

RESPONSIBILITIES OF AN AHMADI

According to the Holy Qur'an, Ahadith and the Promised Messiah, Peace be upon him.

In 1889, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian claimed to be the same Promised Messiah and al-Mahdi about whom the Holy Prophet Muhammad[sa] had given glad tidings. The Holy Prophet[sa] had prophesied that the important role of the promised Messiah and al-Mahdi would be to revive faith and firmly establish the practice of Islamic law.

When the Promised Messiah made his claim and invited all righteous souls to respond to his call, he published 10 conditions of bai'at for all who wished to join him with a covenant of allegiance. It is important for all Ahmadis to familiarize themselves with these 10 Conditions.

Hadrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V (May Allah be his help) has explained these 10 Conditions in the light of the Holy Qur'an, Sayings of the Holy Prophet[sa] and the writings of the Promised Messiah[as] in various Friday Sermons and speeches. These are being presented in the format of a book for the guidance of all Ahmadis and all those who want to learn about Ahmadiyyat.

ISBN 978-984-991-276-7

9789849912767